ওপারের আলো

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন

২॥০ আনার টাকা

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীঅমৃতলাল সরকার,
"কাত্যায়নী প্রেস", ৩৯-১ শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

—:০:—

বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে

মুক্তহস্ত দানবীর

প্রথিত নামা

শ্রীযুক্ত রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ

লাল গোলাধীশ বাহাদুরের

শ্রীকর কমলে

ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার

নিদর্শন স্বরূপ

এই পুস্তক উৎসর্গ করা হইল।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

আঁকা বাঁকা ছোট নদী ও নির্ঝরের পথ বেয়ে কেউ যেমন মোহনায় গিয়ে পৌঁছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহ-মমতার পথ দিয়ে তেমন প্রীতির মহাসাগরে পৌঁছিতে পারা যায়। যে পর্যন্ত স্নেহ মনকে একটা ক্ষুদ্র জায়গায় আবদ্ধ রেখে জগতকে আড়াল ক'রে রাখে, সে পর্যন্ত তা আত্মার বন্ধন স্বরূপ, কিন্তু যখন উহা সার্বজনীন প্রীতিতে মনকে নিয়ে যায়—তখন উহা মুক্তির পথ—অমৃতের ইঙ্গিত। ঋষি শত শত বছর আগে যা' বলে গেছেন, তা চিরন্তন সত্য। আমাদের আনন্দ, আত্মা ছোট কিছু চায় না। আত্মা [illegible] বেড়ার মধ্যে হাঁপিয়ে ওঠে; বাৎসল্য, সখ্য ও দাম্পত্যের প্রেম সামলিয়ে রাখতে পারে না, কারণ সামাজিক ও পারিবারিক হ'তে আত্মার অধিকার বড়। কিরূপে সমাজ ও পরিবারের থেকে দুঃখ কষ্টের ঘা খেয়ে আত্মা তার মুক্তির পথ আবিষ্কার পারে, এই গল্পে তা' দেখাতে চেষ্টা করেছি।

রোগের শয্যায় তিনি সপ্তাহের মধ্যে এত বড় বইখানি লেখা, তিন সপ্তাহের কিছু ঊর্দ্ধকালের মধ্যে বইখানি ছাপা হ'য়েছে; তাড়াতাড়ি করার দরুন অনেক ভুল প্রমাদ র'য়ে গেল। এ জন্য ক্ষমার দাবী কর্'ব না। আমার একটা কৈফিয়ৎ আছে: শয্যায় মৃত্যুর বিভীষিকা কল্পনার সামনে ক'রে বইখানি লিখেছি, [illegible] হাতের কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়, এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি করে

লেখক লালগোলার স্বনামধন্য রাজাবাহাদুরের বদান্যতায় বহু উপকৃত। উৎসর্গপত্রে 'বেহুলা' ও 'গৃহশ্রী'র সঙ্গে এই পুস্তকখানিও তাঁ'র নামাঙ্কিত ক'রে কৃতার্থ হয়েছি।

৭, বিশ্বকোষ লেন,
বাগবাজার, কলিকাতা।
২৬শে মার্চ্চ, ১৯২৭।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

লে

উৎসর্গপ

ক’রে ক্ব

৭, l

বাগবা

২৬

আশ্রম থেকে এইজন্য বেতন ডাকে আসে। এবার সে সন্ন্যাসী নাকি পরলোক গত হয়েছেন,—সুতরাং দেবেশের আশা হয়েছিল, এইবার যদি এই এক বিঘা জমি হাত করতে সুযোগ পান তবে জাতি যুথি কুন্দ ফুলে তা' সাজিয়ে তাঁর "নব বৃন্দাবনে"র সামিল ক'রে নেবেন — তাঁর বাগানের নাম তিনি "নব বৃন্দাবন" রেখেছিলেন।

এই এক বিঘা জমিতে মধু নাপিতের বসত বাড়ী ছিল—সে প্রায় একশত বৎসর হতে চল্‌ল। গ্রামের খুব বৃদ্ধ দুই একজন মধু নাপিতকে দেখেছিলেন বলে এখনও গল্প ক'রে থাকেন। মধু নিঃসন্তান ছিল, সে বৃন্দাবনবাসী তার গুরুকে মরবার সময় এই জমিটুকু উইল করে দিয়ে যায়। তদবধি এই একবিঘা জমি বহুদূরবর্ত্তী তীর্থের কোন আশ্রমের অঙ্গীয় হইয়া আছে, এই গ্রামের সঙ্গে এই জমিটুকুর কোন সম্পর্ক নাই। এ যেন বঙ্গদেশে চন্দন-নগর।

যে সন্ন্যাসী-গুরুকে মধু তার বাসভবন লিখে পড়ে দিয়ে গেছিল, তিনি স্বর্গলাভ করার পর, দ্বিতীয় যে সন্ন্যাসী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, এবার তিনিও পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেছেন। এবার এ জমিটা দেবেশ পান কিনা চেষ্টা করবেন,—তাঁর নিজের গৃহ-স্থাপিত 'মদনমোহন' বিগ্রহের জন্য এই জমি দান-স্বরূপও পেতে পারেন, এই আশাও একবার তাঁর মনে হয়েছিল; সুতরাং এই নবাগত বৃদ্ধটি যখন এ ঘরে থাকবেন বলে মত প্রকাশ করলেন, তখন দেবেশ একটু চমকে উঠলেন।

দেবেশ যথাসাধ্য মনের ভাব গোপন ক'রে স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবাজি, এই গৃহে বরাবর বাস করবেন, না কয়েকদিন থেকে চলে যাবেন?"

"যে কয়দিন তিনি রাখ্‌বেন, থাকব, আপাততঃ অন্য কোথায়ও যাওয়ার মতলব নাই।"

দেবেশ বুঝ্‌লেন, এই এক বিঘা জমি বেহাত হয়ে গেল; কিন্তু তাঁর নিজের আট বিঘার বাগানটির উপর বাবাজির লুব্ধ চক্ষু না পড়ে, এই জন্য পশ্চিমদিকের বেড়াটা একটু শক্ত করে সংস্কার কর্‌বার কথা ভাব্‌তে লাগলেন।

(২)

পরদিন প্রাতে দেবেশ ভট্টাচার্য্য নিয়মিতরূপে কাস্তে, খুন্তী, শাবল প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসেছেন। তখন পূর্ব্বাকাশ হ'তে কয়েকটি সোণার তার ফুলগুলি দিয়ে মালা গেঁথে যেন গাছের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিল। গুণ্ গুণ্ ক'রে কি গান কর্‌তে কর্‌তে বাবাজি সেই পথের উপর পায়চারি কচ্ছিলেন।

দেবেশের রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই, বাবাজির চিন্তাই তাঁর একটু অশান্তির কারণ হয়েছিল; তিনি বাবাজিকে দেখে বাইরে ভদ্রতা দেখিয়ে বল্লেন,—"বাবাজি, চলুন আমার বাগানের ভেতর। আপনাকে আমার ফুল ও লতার চারাগুলি দেখাব।" বাবাজি আনন্দের সহিত এই আহ্বানে বাগানের গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুক্‌লেন।

মুহূর্ত্ত মধ্যে বাবাজির মনে হ'ল এ সত্য সত্যই "নব নন্দন"—বাগানের ঐ নাম সার্থক। দেবেশ বল্লেন "এই রক্তচন্দনের বণ ফলগুলি চেনেন?"

বাবাজি—"তাকি আর জানি না? এ গুঞ্জা ফল,—নবগুঞ্জার হার দিয়ে কৃষ্ণ রাইকে সাজাতেন," বল্‌তে বল্‌তে বাবাজির কণ্ঠ অশ্রুকম্পিত ও গদ্‌গদ্ হয়ে উঠ্‌ল।

একটা লতা বড় বড় শ্যাম বর্ণের পাতা দুলিয়ে লাল ফুলগুলিকে যেন বাতাস কচ্ছিল। দেবেশ বল্লেন, "এইটি মাধবী লতা"। তারপর বাবাজির হাত ধরে টেনে আরও ভেতরে নিয়ে গিয়ে একটা ছোট হীরাগাছ দেখালেন,—গাছটি সাদা সাদা ফুলে ভরা, প্রতিটি ফুলের

মধ্যে নীলবর্ণ কয়েকটি রেখা আছে। দেবেশ বল্লেন, "আপনারা এ ফুল বোধ হয় দেখেন নি, এটি আমি বঙ্গদেশ হ'তে এনেছি, ইহার নাম "কৃষ্ণপদ", এই ব'লে ভট্টাচার্য্য একটি ফুল তুল্লেন। বাস্তবিকই সাদা ফুলের ভেতর যে নীল রেখাগুলি, তা ঠিক ছোট ছোট পায়ের আঙ্গুলের মত। পাঁচটি নীল ছোট বড় রেখা ঠিক পায়ের আঙ্গুলের মত সাদা পাপড়ির উপর ফুটে বা'র হয়েছে, আর একটি বিন্দু পায়ের শেষ দিকটা এঁকে দেখাচ্ছে। সাদার উপর ঠিক যেন পদাঙ্কটি। 'কৃষ্ণপদ' দেখে বাবাজির চক্ষের প্রান্তে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল। তিনি দেবেশ-দত্ত ফুলটি বহু বিনয়সহকারে মাথার উপরে রাখ্লেন। দেবেশ একবার মাত্র তাঁর মুখের দিকে আড় চক্ষে চেয়ে দেখ্লেন, মুখখানি প্রেম শতদলের মত যেন পূর্ণ ভক্তিতে ভাস্ছে। বৃদ্ধের প্রতি তাঁর সমস্ত সন্দেহ যেন কেউ ধুয়ে নিয়ে গেল; তাঁর মনে হ'ল—বাবাজি প্রকৃতই একজন সাধু ব্যক্তি। দেবেশ তাঁর বাগানের চারদিকে চারটি একটু বড় রকমের গাছের উপর লাল রঙ্গের ফুল দেখিয়ে বল্লেন, "ঐ দেখুন "কৃষ্ণচুড়া" কেমন লাল, যেন গাছগুলির উপর সূর্য্য আগুন লাগিয়ে দিয়েছে!" তারপর একটা ছোট চারার নীলফুল দেখিয়ে বল্লেন, "বলুনত এগুলি কি ফুল?"

"এগুলি আর আমি চিনিনা—এগুলি 'কৃষ্ণকলি'!"

এইরূপ নানা কথা দেবেশ বাবাজিকে বল্তে লাগ্লেন। বাবাজির কর্ণে সেই কাকলী যেন অমৃত বর্ষণ করিতে লাগ্ল।

বাগানটি এমন অপূর্ব্ব কৌশলের সঙ্গে সাজান হয়েছিল এবং একদিকে কুন্দ পংক্তি, একদিকে মল্লিকার সা'র এমনই সাদা রঙ্গে শোভা পাচ্ছিল, ও তার আশে পাশে মাধবীর লালফুলের পাপড়িগুলি লাল ঠোঁটের মত দেখাচ্ছিল যে মনে হ'ল কোন শুভ্রবর্ণা দেবী

অবিরত হাস্‌ছেন। সর্ব্বত্র কৃষ্ণলীলার সংশ্রবে বাগানখানি যেন ভক্তি-ধারার তীরের উপবন বলে বোধ হ'ল। দেবেশ বাবু বল্লেন, "দেখুন বাবাজি, এই কুন্দ ফুলের সঙ্গে কৃষ্ণলীলার উদ্দীপক কিছুই নাই, মল্লিকার সঙ্গেও কিছুই নাই, যুথি জাতিরও নাই, তথাপি কৃষ্ণ পূজায় লাগে; রাধামাধবের আরতির সময় এই ফুলগুলি তুলে নিই,—কিন্তু মাধবী লতাটি আমার বড় ভাল লাগে, গানে শুনেছি মাধবীকুঞ্জে রাই কানুর মিলন হত।"

মাধবী তলা হইতে তখন বাবাজী গেয়ে উঠ্‌লেন—যেন কুঞ্জ হ'তে শারীশুক কলরব করে উঠ্‌ল, যেন সেই বাগানে মলয় হাওয়ায় ঘুম ভেঙ্গে কোকিল ডেকে উঠ্‌ল। বাবাজী গাইলেন, "অঙ্গনে রহিল এই আমার হিয়ার হেমহার। পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার"। কি মধুর করুণ সুর! রাই দশম দশায় মৃত্যু আসন্ন মনে করে বলছেন, "কতবার তিনি আমার এই হার নিজে গলায় পরতেন এবং তাঁর বনমালাটি আমায় পরিয়ে দিতেন; এই মালা ও হার বিনিময়ের উপলক্ষে কতইনা আনন্দ হোয়েছে! আর তো তাঁকে এই আমার "হিয়ার হেমহার" পর্‌তে দেখে চোখ্ জুড়োতে পার্‌ব না। অঙ্গনায় এই হার রেখে গেলাম, আমার মৃত্যুর পর তিনি এখানে এলে তাঁকে আমার এই অনুরোধটি জানাস, তিনি যেন একবার এই হার গলায় পরেন।" কি করুণ মিষ্ট সুরে বাবাজি গাইতে লাগ্‌লেন! সে সুর যেন দেবেশের বুকে গিয়ে বিঁধল ও তাঁর চোকে জল নিয়ে এল। তারপর বাবাজি গাইলেন,—"রোপিনু মল্লিকা নিজ করে, গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তাঁরে" মল্লিকার চারা এনেছি, এখনও ফুল হয়নি, যখন ফুল হবে—তখন আমি কোথায় থাক্‌ব—তা তো জানিনা! আমি তো মরতে বসেছি! কিন্তু তখন তিনি যদি আসেন, তবে আমার হয়ে তোরা

ফুলের মালা—আমার রোপিত চারাগাছের ফুলের মালা তাঁর গলায় পরিয়ে দিস্।" বাবাজি হঠাৎ গান বন্ধ করলেন, দেবেশ যেন স্বর্গভ্রষ্ট দেবতার ন্যায় মাটিতে পড়লেন। বাবাজি বল্লেন, "মল্লিকা ফুলের কথা কৃষ্ণলীলায় পাওয়া গেল।" তারপর গাইলেন, "ওগো কুন্দ যূথি জাতিকে —আমায় শ্যাম দেখিয়ে প্রাণ বাঁচাও গো।" কৃষ্ণ বিরহে রাধা প্রত্যেক ফুলের নিকট কৃষ্ণের সন্ধান জানতে চাচ্ছেন। বাবাজি বল্লেন, "পদটি কৃষ্ণ কমল গোস্বামীর 'রাই উন্মাদিনী' হতে নেওয়া। কৃষ্ণকমল এই পদটি চৈতন্য প্রভুর উক্ত একটি সংস্কৃত শ্লোক হইতে অনুবাদ করেছেন, সে শ্লোকটি চৈতন্যচরিতামৃতে আছে"। তারপর পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন কবি-ওয়ালা রামরূপ ঠাকুরের কুটজ, টগর ও নব মল্লিকা দ্বারা রাধা কিরূপ বাসর তৈরী করেছিলেন তার সম্বন্ধীয় গানটি ভক্তির সহিত গাইলেন।

এই মিষ্ট করুণ ভক্তির আবেগভরা গানের টুকরাগুলি গেয়ে বাবাজি বল্লেন, -"কোন্ ফুলে কৃষ্ণলীলার কথা নাই? এরা যে তাঁরই, তিনি মথুরার ঐশ্বর্য্য ভালবাসেন নাই, বৃন্দাবনেতো এই গুলি নিয়েই ছিলেন—এই জন্য এ সকল জিনিষের এমন রূপ, এমন গন্ধ,—এরা পরের জন্য হাসে—পরকে সুখী করতে জীবন ছেড়ে দেয়—এদের ত সকলই কৃষ্ণলীলা-ময়।"

দেবেশ স্তব্ধ হয়ে বাবাজির কথা শুনলেন, বাবাজির হৃদয়টি ফুল বনে গিয়ে যেন নিজের স্বগণ দেখতে পেলে। তাঁর এই ভক্তি দেখে দেবেশ তাঁকে ধ'রে বাগানের অপর এক জায়গায় নিয়ে গেলেন। এবার বাবাজি সত্যই দেবেশের কৃতিত্বে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দেখলেন, প্রায় দুই বিঘা জুড়ে সাদা রঙ্গের মকমল বিছান রয়েছে, সেই মক-মলের ধারে ধারে নীলপদ্ম, লালপদ্ম—লতায় বিজড়িত। মধ্যে রাধা-কৃষ্ণের যুগলরূপ, কানু রাইকে বাঁশী বাজাতে শিখাচ্ছেন। এগুলি

সকলি ফুলে আঁকা। ঋতু-পুষ্প (season flower) দিয়ে মকমলের শয্যা তৈরী হয়েছে, এবং নানাবর্ণের ঐ ফুল দ্বারা লতা, ফুল ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আঁকা হয়েছে। এগুলি দেবেশবাবু নিজে তখনই তৈরী করেন নাই। তিনি কতকগুলি বিচি এমনই কৌশলে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যে সেগুলির ছোট ছোট চারা হয়ে যখন তাদের ফুল ফুটে উঠল, তখন সেই ফুলগুলি ছবির আকার হয়ে দেখা দিল। বহু লোক এই "নব বৃন্দাবন" দেখে যেত। হঠাৎ কে এই বাগানের মধ্যে এমন সুন্দর একখানি মকমল্ বিছিয়ে রেখে এমন লতা পাতা ফুল ও দেবমূর্ত্তি এঁকে গেছে! যারা রূপগঞ্জের মেলা দেখতে যেত, তারা পথে 'নব বৃন্দাবন' দেখবার জন্য একবার এক ঘণ্টার জন্য নামত। এক পয়সা, দুই পয়সা দর্শনীও দেবেশের ভাগ্যে জুটত; কারণ অনেক যাত্রীই রিক্ত হস্তে ব্রাহ্মণের তৈরী এই"নববৃন্দাবন"দেখতেন না। প্রায় তিনটি মাসে দেবেশ বাবু এই উপলক্ষে 'রাধামাধব' সেবার জন্য প্রায় তিন চা'র শত টাকা উপার্জ্জন করতেন। কিন্তু তিনি নিজে কারু কাছে কিছু চাইতেন না। বাবাজি রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির দিকে খানিকটা চেয়ে রইলেন এবং বল্লেন" রাধার সাড়ী খানির পাড়টি "নেষ্টারসিয়ম" ফুল দিয়ে না ক'রে "সেলভিয়া"তে হ'লে বোধ হয় একটু ভাল হ'ত, পাড়টা একটু ফিকে লাল হয়েছে নয় কি?" দেবেশ আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন "বাবাজির বাগান করবার শিক্ষাটাও বেশ আছে দেখছি, এবার "সেলভিয়া"র বিচি সময় মত পাই নাই,—আস্‌ছেবার ঐ ফুল দিয়েই পাড় করব।"

বাবাজির সঙ্গে দেবেশের একদিনের মধ্যেই বেশ একটা পাকারকম সম্বন্ধ হয়ে দাঁড়াল। কারণ সম-ধর্ম্মীদের চোখের চাউনিতেই ভাবের যে বিনিময় হয়, বহু বাগাড়ম্বরে তা' হয় না।

বাবাজি দেবেশের আগ্রহ সত্বেও তাঁর বাড়ীতে খেতে সম্মত হলেন না। কোথায় কি খাবেন, দেবেশ বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। বাবাজি বল্লেন, "সে হবে—ওর চিন্তা আমাদের দরকার নাই—যিনি জীবন দিয়েছেন, এজীবন রক্ষার দরকার হোলে তার ব্যবস্থা তিনিই করাবেন—আমাকে দিয়েই করাবেন। আমি মুনি গোঁসাই নই যে তিনি আমার মুখের কাছে এনে ধর্‌বেন—আমাকে দিয়ে চেষ্টা করাবেন, কিন্তু তজ্জন্য আমি মোটেই ব্যস্ত নই।"

দেবেশ দেখ্‌লেন বাবাজী একবার যেটি করবেন না বলেন, তাকে দিয়ে সেটি করান শক্ত।

খানিকটা জপসেরে বাবাজি ঝুলিটা কাঁধে ক'রে ভিক্ষায় বা'র হলেন। প্রথম একবাড়ীর দুয়ারে দাঁড়ায়ে নাতিমৃদুস্বরে বল্লেন, 'মা'। এই 'মা' কথাটি চক্ষু মাটির দিকে নতক'রে তিনবার উচ্চারণ কর্‌লেন। একটী বালক বা'র হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল "কি চাও।" তিনি আর দাঁড়ালেন না, ঝুলি কাঁধে করে অন্য গৃহে গেলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে রাষ্ট্র হল—সন্ন্যাসী তিনবার 'মা' বলে ডাকেন—কিছু না পেলে চোখ নত করে চলে যান। গৃহস্থেরা একটু আশ্চর্য্য হয়ে ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে লাগলেন, কিন্তু একমুষ্টি ভিক্ষার বেশী তিনি কারু কাছে নিলেন না। এই ভাবে নয় দশ ঘর ঘুরে একপো চাউল ও দুই চারটা বেগুন আলু যা' পেলেন, বেলা দেড়টার সময় তা সিদ্ধ করে মুদিত চক্ষে ভগবানকে নিবেদন করে পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার কর্‌লেন। এই ভাবে তাঁর দিন যেতে লাগল।

---

(৩)

দেবেশ বাবুর একজন আত্মীয় একটা অভ্রের খনির মালিক ছিলেন, তিনি উত্তর পশ্চিমে সেই খনির কারবার করতেন। প্রথম প্রথম বিস্তর লাভ হইয়াছিল, কিন্তু একজন প্রতারক কর্ম্মচারীর দোষে কারবারটিতে শেষে বিস্তর লোকসান হয় এবং অবশেষে তিনি উহা উঠিয়ে দিয়ে এক ভিন্ন কাববার আরম্ভ করেন। এখন তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। কতকগুলি অভ্র তাঁর কারবার গৃহের একটা জায়গায় 'জাম' হয়ে পড়েছিল, ইচ্ছা করলে তিনি তাহা বিক্রয় করে ফেলতে পারতেন কিন্তু অভ্রখনির কর্ম্মচারীদের মধ্যে তখন একজনও ছিল না, সুতরাং যাচাই ক'রে দরে বিক্রয় করা তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক হবেনা, এই ভেবে দেবেশের সেই ধনবান আত্মীয়টি তা' বিক্রয় করিবার চেষ্টা করেন নাই।

সম্প্রতি তিনি বাড়ী এসেছিলেন। তিনি দেবেশের বাগানটি দেখে ভারী খুসী হয়ে তাঁকে বল্লেন, "দেবেশ, আমার কতকগুলি অভ্র পড়ে আছে, তা চেষ্টা করলে বেশ বিক্রয় করা যেতে পারত, সেগুলির দর হাজার টাকা হতে পারত, কিন্তু আমি আভ্রের খনির কর্ম্মচারীগুলিকে বিদায় ক'রে দিয়েছি; হয়ত পাইকার সেগুলি দুই একশ টাকা দাম ব'লবে। ভাল করে পরিষ্কার ক'রে ফেলে শেষে বিক্রয় করলে এখনও বেশ দর পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু আমি এই ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে আর চেষ্টা করতে চাইনা। তুই এই আভগুলি নিবি? কি করে পরিষ্কার করতে হয় আমি শিখিয়ে দেব। খুব যত্ন করে পরিষ্কার করার পর যেরূপ দাঁড়াবে, বাজারে তা' দুটি হাজার টাকার নীচে কিনতে পারবি না। তোর বাগানের সাজসজ্জার যদি লাগে, তবে সন্তুষ্টচিত্তে আমি তোকে আভগুলি মালগাড়ীতে ক'রে পাঠিয়ে দেব।"

দেবেশ বাবু ওস্তাদ লোক, অমনি সে গুলি দিয়ে কি কর্‌বেন, তার মাথায় খেল্‌লো। তিনি মতলব ঠিক ক'রে বল্লেন,—"আমার খুব কাজে লাগ্‌বে, কাকাবাবু, আভগুলি পাঠিয়ে দেবেন।"

তার পরদিন দেবেশ বাবু বাবাজিকে গিয়ে বল্লেন,—"আমি একা। পয়সা কড়ি এমন কিছু নাই যে বরাবর মজুর রেখে সখ্‌ চালাতে পারি। আমার এত সাধের বাগানটি পশু পক্ষী এমন কি মনুষ্যের হাত হতে রক্ষা কর্‌তে পারি, এরূপ সাধ্যও আমার নেই। সেদিন ঋতু-পুষ্পের কৃষ্ণের পীত ধড়াটা রসা গয়লার গরুটা ছুটে এসে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মকমল্‌ও খুরের ঘায়ে জখম হয়ে গেছে। তা ছাড়া দুষ্ট লোকে ইচ্ছে করে এসে বাগানের অনিষ্ট ক'রে যায়। সে দিন কে এসে ঝুমকা লাতাটা ছুরি দিয়ে কেটে চলে গেছে। আমার রাধারাণীর কানের ঝুম্‌কা ফুল—আমার বুকের একখানি হাড় তুলে নিলে আমার এমন কষ্ট হ'ত না।

বাবাজি—"আপনি আমায় কি আদেশ করেন? বাগানের কাজে আমি আপনার সহায়তা করব? তা,' বেশ আজ হতে সকল কাজেই আমায় পাবেন।'

"আপনি বৃদ্ধ, আপনাকে কি আমি শ্রমসাধ্য কাজে টেনে আন্‌তে পারি? আপনার এর উপর একটু দৃষ্টি থাক্‌লেই যথেষ্ট। আপনার ঘরখানি বাগানের কাছে, আপনি সেখান থেকে চোখ্‌ চেয়ে এই জমি টুকুর উপর একটু নজর দিলেই দুষ্ট লোকে ভয় পাবে।

"আচ্ছা তাই হবে"

এত সংক্ষেপে, এত মৃদুভাবে বাবাজি এ কথাটি বল্লেন, দেবেশ বাবু ভাব্‌লেন, এটা একটা কথার কথা হয়ে রইল মাত্র। কিন্তু বাবাজির ভক্তি-

শাস্ত্রে জ্ঞান ও সৌহার্দ্দ্যে দেবেশ বাবু প্রীত ছিলেন, তিনি ভাবলেন, 'আর কিছু না হ'লেও একটি সঙ্গী পেয়েছি, এই যথেষ্ট।'

পরদিন হ'তে দেখা গেল, সামান্য ভাবে জপ সেরে বাবাজি গাছ-বোনার কাজে লেগে গেছেন। এখন বাবাজির ঘরেই তাঁর মালীর কাজের সাজ সরঞ্জাম থাকে। দেবেশ এসে দেখলেন, পূর্ব্ব দিককার ঝিলটা থেকে জল তুলে বাবাজি সব ফুলগাছের গোড়ায় দিয়েছেন, খুন্তী দিয়ে গোড়ার মাটি উস্কে দিয়েছেন, শুকনো পাতা, বাসি ফুল বাগানময় একটিও নাই। এতবড় বাগানটার সব জায়গা ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার। প্রাতঃ-সমীরে ফুল-গুলি এ ওর গায় ঢ'লে পড়ে কেবলই পাতায় মুখ আড়াল করে হাস্‌ছে, কারণ সূর্য্যের কিরণ এসে তাদের জোর করে চুম খাচ্ছে; তারা ঘাড় নেড়ে নেড়ে পাতার আড়ালে যাচ্ছে ও কেবলই হাস্‌ছে। সুগন্ধে বায়ু ভরপুর, বাবাজির মুখ চোখ আনন্দে ভরপুর। দেবেশের যা' করতে ৭টা হতে ১০টা লাগ্‌ত, আজ ৭টা মধ্যেই সে কাজ সাবাড়। বাবাজি এমন নিপুণভাবে বাগানের কাজ করেছেন, যে দেবেশ নিজেও তা পারতেন কিনা সন্দেহ। দেবেশ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, একটা কথার কথা বলে তিনি যা উড়িয়ে দিচ্ছিলেন—তার ভিতর এতটা চেষ্টা ও কর্ম্মের উদ্যোগ নিহিত ছিল তা তিনি ভাবেন নি। বৃদ্ধকে তিনি কষ্ট দিয়েছেন এই অনুতাপে তাঁর চোখ ছলছল হ'ল, তিনি বল্লেন, "বাবাজি, আমি এখানে মাথা খুঁড়ে মরব, আপনি যদি মজুরের মত হাড় ভাঙ্গা শ্রম আর করবেন! আমার মনে হচ্ছে শেষ রাত থেকে আপনি আর ঘুমোন নি। আপনাকে একটা চোখের ইঙ্গিত দিয়ে বাগানের তত্ত্বাবধান করতে বলে-ছিলাম,—আপনি একি কাণ্ড করেছেন বলুন দেখি?"

"এ কাজটি কি আমি মজুরের মত করেছি না যিনি হাত দিয়েছেন এই উপলক্ষে তাঁর সেবা করে নিয়েছি? যদি এই শ্রম আমার আরাধনার

অঙ্গীয় হয়ে থাকে, তবে আপনার অনুতাপ বা আমাকে সতর্ক করবার কোনই কারণ নেই, বরঞ্চ আপনি আপনার বাগানে আমাকে তাঁর প্রিয় জিনিষগুলির সেবা কর্‌বার সুবিধা দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে বেঁধেছেন। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আর, আমি এ পর্য্যন্ত অলসজীবন কাটিয়ে নিজে মনের ভেতর লজ্জা বোধ কচ্ছিলাম। এই বিশ্বসংসারের এতবড় কার্য্যক্ষেত্রটায়ত আমার কোন ডাক পড়েনি। কাল যখন আপনার কথা শুনলেম, তখন স্পষ্ট বুঝতে পার্‌লেম, তিনি আপনার মুখ দিয়ে কাজে আমায় ডেকেছেন—এর চাইতে সৌভাগ্য মানুষের আর কি হ'তে পারে? তাই অতি প্রত্যুষে স্নান করে শুদ্ধ হ'য়ে আমি তাঁরই কাজে লেগে গেছি।"

এর উপর কোন কথা চলেনা। দেবেশ বুঝ্‌লেন যে স্থানে দাঁড়িয়ে বাবাজি কথা বলেছেন, তা' কারু দয়ার এলাকার ভেতর নহে, তা' কৃপার বহু উর্দ্ধে। সেস্থানের কাজ অতি ছোট হ'লেও তাতে ভগবৎ ভক্তির ছাপ আছে। যাঁকে তিনি মজুর মনে করে ছিলেন—এখন বুঝলেন তিনি দেবতা।

এই ভাবে রাতদিন ক'রে খেটে বাবাজির সাহায্যে দেবেশ বাবু বাগানটি আরও চমৎকার করলেন, এর মধ্যে আভ এসে পৌছিল, তখন নূতন করে কাজ সুরু হ'ল।

একদিন তুলসী মঞ্জরী স্বামীকে বল্লেন, "কানাই বাবাজি শুনছি যে তোমার বাগানের জন্য হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটেন, দিনরাত এমন শ্রম মজুরেও করতে পারে না। জপতপ গেছে, তোমার জন্য সাধু সংসারী সেজেছেন। আর ওঁকে ভিক্ষা করতে দিওনা, এইখানে রান্না হবে, তাই খাবেন। সে দিন আরতির পর আমি হাত যোড় করে অনেক অনুনয় বিনয় করেছিলাম, তাই তিনি 'রাধা মাধবের'

ভোগের পরমান্ন প্রসাদ খেয়েছিলেন—বোধ হয় ভাল লেগেছিল, মাধবের একবার কিছু চেয়ে নিয়েছিলেন ; খাওয়ার পর আমার কাছে এসে প্রণাম ক'রে বল্লেন, 'জন্মে জন্মে যেন মা আমি তোমার ছেলে হয়ে এই রান্নাখাই, শ্যামলেশ কি ভাগ্যি ক'রে যেন এমন মা পেয়েছে !' ওঁকে আর রাঁধতে দিওনা, ভিক্ষে করতে দিওনা। আমাকে উনি বড় শ্রদ্ধা করেন, তুমি নিয়ে এস, আমি বল্লেই উনি এখানে খাবেন। সারাদিন উনি কতটা পরিশ্রম তোমার জন্য করেন বল দেখি।"

দেবেশ—"শুধু কি সারাদিন ? শ্যামলেশ বলেছে, উনি দিনে আগে কখনই ঘুমুতেন না, সম্প্রতি ২ ঘণ্টাকাল ঘুমোন। তার কারণ কি জান ? আমার বরাবরই রাত্রে বাগানটা মাঝে মাঝে দেখার অভ্যাস আছে, তা জান। এর মধ্যে একদিন রাত্রি ৩ টার সময় উঠে বাগানে গিয়েছিলেম, পূর্ব্ব দিকের দাদার ঝিলটার দিকে যেমনই এগিয়ে এসেছি, অমনি হঠাৎ কে এসে আমার ডান হাতখানি বজ্র মুষ্টিতে ধরে বল্লে "কে তুমি ?"

পরস্পরে চেনা হ'লে আমি বল্লুম, "বাবাজি, রাতে তুমি আমার জন্য ঘুমোওনা, এ বড় বাড়াবাড়ি হচ্চে, এমন হলে চলবে না।"

বাবাজি বল্লেন 'আমি নব বৃন্দাবনের প্রহরী, ভগবান এই কাজে আমাকে আপততঃ রেখেছেন, আমি তো এখন দিনে ঘুমোই। যদি তুমি এই কার্য্য হ'তে জোর করে আমায় ছাড়িয়ে দাও, তবে তোমার সেবা-অপরাধ হবে। আমার এই শ্রমে সুখ হয়।'

"খাওয়ার কথা শতবার বলেছি, কিন্তু কি হবে ? তিনি বলেন, আমি মাধুকরী ছাড়বনা, যদি এ নিয়ে আমায় উত্যক্ত কর, তবে কল ভাল হবে না। আমি মাঝে মাঝে রাধামাধবের প্রসাদ—তোমার মায়ের হাতের প্রসাদ খাব। তা' খেয়েছি, তিনি কি তুমি এর অতিরিক্ত যদি কিছু অনুরোধ কর, তবে আমায় কিন্তু আর এখানে দেখতে পাবে না।"

আভগুলি দেবেশ তাঁর আত্মীয়ের উপদেশমত পরিষ্কার করেছেন। তিনিও তাঁহার ১১ বৎসরের পুত্র শ্যামলেশ রাতদিন পরিশ্রম করে সেগুলি ঝকঝকে করেছেন। সেগুলি বাগানে নেওয়া হয় নাই, পাছে বাবাজি আবার তার জন্য অতিরিক্ত খাটেন। আভগুলি ২০ ইঞ্চি চওড়া ১৫ ইঞ্চি লম্বা ক'রে এক একখানি টুকরা প্রস্তুত হয়েছে, জোড়া দিয়ে সেগুলি খুব শক্ত করা হয়েছে। বেশ পুরু আয়নার মত সেগুলি টেকসই হয়েছে।

তারপর দেবেশ সেই আভের ভিতর কাগজের ছবি লাগিয়ে তার উপর ফের আভ দিয়ে ছবিগুলিকে ঠিক আয়নার ভেতরকার ছবির মত দেখ্‌তে ক'রে ফেলেছে। এই ছবির একটা ইতিহাস আছে।

দেবেশের বড় ভাই হৃদয়েশকে তাঁদের নিঃসন্তান ধনবান খুল্লতাত পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিলেন। দেবেশ পৈত্রিক একখানি তিন কামরা একতল গৃহ, রাধামাধবের সেবা ও একটি ছোট দেব মন্দির এবং আটবিঘা জমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। তা ছাড়া একটা জাম ছিল তা তাঁর পিতাই গ্রামবাসী মথুরামণ্ডলকে পত্তনি দিয়েছিলেন। মথুরমণ্ডল প্রতি বৎসর সপ্তমী পূজার দিন ঘড়ির কাঁটার মত নিয়মিতরূপে দেবেশ-বাবুকে তার দরুণ ৩০০৲ টাকা খাজনা দিয়ে যেত।

সুতরাং এই পঁচিশ টাকা আয়ের উপর নির্ভর ক'রেই প্রথম প্রথম তাঁদের সংসার বড় কষ্টে চল্‌ছিল, কারণ রাধামাধবের সেবায় দেবেশ অনেকটা বেশী খরচ করে ফেল্‌তেন। তুলসীদেবীর গিন্নীপণায় সংসারটি কোনরূপে লজ্জা সংবরণ ক'রে এতকাল টিকে ছিল। সম্প্রতি "নব-বৃন্দাবনের" দর্শনী বাৎসরিক প্রায় চারশত টাকা বেড়ে গেছিল। কিন্তু এই

টাকার সমস্তই দেবেশ রাধামাধবের সেবায় ব্যয় করতেন। মাধবের বাঁশীর মকর মুখটী শীঘ্রই সোনার হয়ে গেল, অতি সূক্ষ্ম সোণার তার দিয়ে রাধাজীর নীলাম্বরীর পাড় তৈয়ারী হ'ল; তাঁর কাণে দুটি মুক্তার দুল হ'ল। কিন্তু ভক্ত যেরূপ ক'রে ভগবানকে সাজালেন, ভগবান ভক্তের প্রতি তদনুযায়ী কৃপা করলেন না; শ্যামলেশের পায়ের একজোড়া জুতা কখনই হ'লনা; আর তুলসীদেবীর শাঁখাযোড়া সোনা দিয়ে কোনকালেই মোড়া হ'ল না। এদিকে 'শীতল-ভোগ' বেশ বড় রকমের হ'ল ও সন্ধ্যার আরতিতে বালকদের কোলাহল বেড়ে গেল। অনেক ভেকধারী, ও ছাপমণ্ডিত বৈষ্ণব সন্ধ্যায় সেই 'শীতলের' প্রত্যাশী হ'য়ে উপস্থিত হ'তে লাগল। এই লোক সমাগমে দেবেশও তাঁর স্ত্রী প্রকৃতই আনন্দিত হ'তেন। "আমাদের রাধামাধবের এই প্রতিপত্তি বেড়েছে, এ না হয়েই যায়না। এঁরা হচ্ছেন "জাগ্রত দেবতা" এই গর্ব্ব সর্ব্বদাই দেবেশকে উৎসাহিত ক'রত। কিন্তু এ ছাড়াও দেবেশের আর একটা আয় হয়েছিল, তাহা বলছি।

শিশুকালে দেবেশ বরাহনগরে তাঁর এক পিসির বাড়ীতে ছিলেন, সেইখান থেকে ষ্টীমারে গিয়ে তিনি কলিকাতার একটা চিত্র-বিদ্যালয়ে পড়তেন। ৩।৪ বৎসর আর্টস্কুলে পড়ে তিনি ছবি আঁকা শিখেছিলেন। অবশ্য তিনি যে খুব ওস্তাদ চিত্রকর হয়েছিলেন তা নয়, কিন্তু তিনি ছবিগুলিতে একটা ভাব দিতে পারতেন যাতে ছবিগুলি আর ছবির মত থাকত না, সেগুলি যেন কথা কইত। তুলির কোন্ টানে সেভাব ফুট্‌ত, তা তাঁর অনুকরণকারীরা চেষ্টা করেও বুঝতে পারত না। দেবেশ তাদেরে প্রাণপণে বুঝোতে চেষ্টা করেও বুঝোতে পারতেন না। তারা ভাবত, দেবেশবাবু নিজে এই বিদ্যাটি অর্জ্জন করে গোপন করছেন, এ কারুকে শিখাবেন না। কিন্তু এ সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক।

দেবেশ একখানি ছবি আঁক্‌ছিলেন। রাধা রান্নাঘরে ধোঁয়ার মধ্যে বসে আছেন। ধোঁয়ার মধ্যে আগুনের ফিন্‌কির মত রাধার রূপ দেখা যাচ্ছে। সম্মুখে এক রাখাল; সে অতি কাতর ভাবে এক হাত বুকের উপর রেখে আর এক হাতের দ্বারা একটা অতি দুঃখ ও ভয়ের ভঙ্গী করে রাধাকে কি বুঝোচ্ছে, রাধা যেন পাগলের মত হ'য়ে সে কথা শুন্‌ছেন। সে কথায় যেন তাঁর প্রাণ উড়ে গেছে, কোমল ঠোঁট দুখানি যেন অব্যক্ত বেদনায় কেঁপে উঠ্‌ছে। বস্ত্র অসংবৃত, চুল এলান,—এই দু'খানি ছবিতে যেন ভয় ও দুঃখ মূর্ত্তিমান হয়ে উঠেছে। এই ছবির নাম "সুবল সংবাদ"। যখন এই ছবি প্রায় শেষ হয়েছে, তখন সেই গ্রামের জমিদার কিশোর রায় সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি দেবেশকে পথের পাশে বাইরের ঘর খানিতে বসে ছবি আঁক্‌তে দেখে পাল্কীহোতে নেমে ছবিখানি দেখ্‌তে লাগলেন। রাধার চোখ দুটিতে ভয় ও প্রেম যেন ফুটে বেরুচ্ছে,চোখের পাতা যেন অশ্রু সিক্ত। ধোঁয়ার মধ্যে কি করুণ, কি সুন্দর রূপ! কিশোর রায় বল্লেন "দেবেশ, তোমার ছবি আঁকার কথা শুনে ছিলাম, কিন্তু তুমি যে এত সুন্দর ছবি আঁক্‌তে পার তাত জানি নাই। যা হো'ক,তুমি এইছবি শেষ ক'রে আমায় পাঠিয়ে দেবে। প্রতিমাসে এক একখানি ছবি চাই,তোমাকে আমাদের সরকার হোতে প্রতি বৎসর ৬০০৲ টাকা দেওয়া হ'বে।"

কৃতজ্ঞ চক্ষে দেবেশ বাবু জমিদার মহাশয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাবেন তা বুঝ্‌তে পার্‌লেন না। কিশোর বাবু বল্লেন, "বুঝেছি,তুমি কতকগুলি বাজে বক্‌বে তার চেষ্টা করছ, দরকার নেই। তোমার নিজের গুণে যৎসামান্য পারিশ্রমিক আর্জন ক'রে, তার জন্য পরের কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কোন কারণই নেই। আমি তোমার আঁক্‌বারকৌশল দেখে মুগ্ধ হয়েছি,এখন আসি।" এই বলে তিনি চলে গেলেন। দেবেশ বাবু জমিদার মহাশয়কে অনেকগুলি ছবি এঁকে দিয়েছিলেন, তার প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন বিশেষত্ব ছিল।

এই জমিদার উচ্চ-শিক্ষিত ছিলেন, এবং এঁর রাজার মত আয় ছিল, বাৎসরিক ৬ লক্ষ টাকা। কিশোর রায়কে প্রজারা যতটা ভালবাস্ত, তদপেক্ষা বেশী ভয় করত। একটু কড়া মেজাজের লোক, কারু সঙ্গে মিশ্‌তেন্ না। সাহেব বাঙ্গালী কেউ বড় আমল পেতেন না। মাসে মাসে তীর্থ-দর্শনের একটা নেশা হ'ত, তখন কাশী কাঞ্চী দ্রাবিড় বেড়িয়ে আস্‌তেন, কিন্তু দার্জ্জিলিং বা শিমলাশৈলে কেউ তাঁকে বড় দেখেন নাই।

(৫)

একদিন একটি অন্ধ স্ত্রীলোকের হাত ধ'রে একটী নেংটী পরা ৬ বছরের ছেলে "নববৃন্দাবনে"র পথ দিয়ে যাচ্ছিল। দেবেশ বাবু হঠাৎ এসে বাঘের মত গর্জ্জন করতে করতে খপ্ করে ছেলেটার হাত বজ্রমুষ্টিতে ধ'রে তাকে হিড়্ হিড়্ করে টেনে নিয়ে চল্লেন। অন্ধ রমণী সকাতরে বল্লে, "ওকে মেরনা, বাবা, ও চুরি করেনি, বাবাজি ওকে ওটা নিজে দিয়াছেন।"

দেবেশ—"সে হ'তেই পারেনা, বাবাজির মা বাবা ঐ ঘটিতে জল খেতেন, বাবাজি আমায় কতবার বলেছেন—তিনি সব ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু ঘটিটার মায়া কাটিয়ে উঠ্‌তে পারেন নি—সেই ঘটি তিনি ভিখারী ছেলেকে দেবেন, এ হতেই পারেনা।"

সেই ছেলেটির হাতে একটা অতি পুরনো ঘটি ছিল, সেটি পুরীর নির্ম্মিত। পুরীর নিপুণ শিল্পী সেই ঘটিটার উপর কত সুন্দর ফুল-লতা এঁকেছিল, তার কানায় কেমন সুন্দর ফুলওয়ালা পাড় খুদেছিল, তা' কালে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তথাপি যৌবন গত রূপসীর রূপের ন্যায় ঘটিটার একটা শ্রী ছিল; বিশেষ বাবাজির হাতে রোজ পরিষ্কার হওয়াতে পিতলের বর্ণে সোনা ফলিয়ে উঠেছিল—বাবাজি প্রতিটি লতা প্রতিটি পল্লব ও ফুল অতি নিপুণ ভাবে রোজ সাফ্ ক'রতেন—যেন ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে ক্ষয় না পায়, অথচ ঝক্ ঝকে পরিষ্কার হয়। "এটা নিশ্চয়ই হতভাগা ছেলাটা চুরি করেছে" এই মনে করে দেবেশ বাবু তাকে বাবাজির কাছে নিয়ে এলেন। দূর হ'তে ছেলেটি সহ দেবেশকে আসতে দেখে বাবাজি বল্লেন, "ওটি আমি ওকে দিয়েছি, দেবেশ বাবু। ওর মায়ের কাছে আব্‌দার করে বল্‌ছিল'

তোর ভিক্ষের পয়সা থে'কে আমায় ঐরকম একটা ঘটি কিনে দে"। মায়ের ধমক খেয়ে কাঁদ্‌ছিল ও বল্‌ছিল, "মা আমি ঐ রকম ঘটি নেব"—দেবেশ বাবু তুমি হ'লে তুমিও ঐ কথা শুনে ঘটিটা ওকে দিতে"।

বাবাজি—"আমার মা বাপের স্মৃতি কি ঐ ঘটিটার উপরই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, দেবেশ বাবু? ঘটিটা যদি চুরি যেত বা খোওয়া যেত তবে কি মা ও বাবার ঋণ সেইখানেই শেষ হ'য়ে যেত? বরং একটি অনাথা রমণীর ছেলের সাধ এটি দিয়ে মিটিয়ে আমি পুত্রের কাজ করেছি। মাতা পিতার আত্মা এতে তুষ্ট হবেন। ছি! দেবেশ বাবু ওকে ছেড়ে দিন্—কখনও দানের পথে দাঁড়াবেন না, ও জড় জিনিষগুলি এমন করে আঁক্‌ড়ে ধরে আত্মার অসীমশক্তির অপমান করবেন না। আমার দেবার মতন তো কিছুই নাই—সকলের কাছে নিয়ে উদর পূর্ত্তিকরি। এই ঘটিটা যদি হীরে বাঁধান হ'ত তবু তাঁকে দিতেম, তার একটা উপকার হ'ত। এই তুচ্ছ ব্যাপারটাকে বড় করে দেখ্‌বেন না"।

সেই আভগুলির ছবির কথা লিখ্‌ছি। খুব মোটা তুলিতে দেবেশবাবু পুরু কাগজের উপর সমস্ত কৃষ্ণ লীলাটি এঁকে ফেলেছেন। কোনটিতে কারাগারে কংস ভ্রূকুটি ক'রে কোন নবজাত কন্যাকে এক আছাড় মার্‌ছেন; কোনটিতে নন্দ শিশু-কৃষ্ণকে ক্রোড়ে নিয়ে কারাগারের দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে। প্রহরীগুলি ঘুমে ঢ'লে পড়ছে। তাদের কোষ-সংলগ্ন খড়্গ গুলিকেও যেন ঘুমের নেশায় পেয়েছে, তারাও যেন প্রাচীরের গায়ে ঢ'লে পড়্‌ছে; নন্দ এক হাতে দ্বার স্পর্শ কর্‌ছেন লৌহের এক পাটি দ্বার শ্লথ হয়ে খুলে পড়েছে। তারপর পুতনা স্বীয় স্তনের মধ্যে শিশু কৃষ্ণের মুখ জোর করে লাগিয়ে দিচ্ছে। আকাশে ঘূর্ণবায়ুর উপর এক বিকট রাক্ষসের টিকি ধরে কৃষ্ণ তাঁকে লাটিমের মত ঘুরোচ্ছেন। কত বৃক্ষলতা সে ঘূর্ণিতে উলট পালট হয়ে উড়ে যাচ্ছে। তৃণাবর্ত্ত ও তারই কৃত ঝড় তুফানের মধ্যে কৃষ্ণের ধাকা খেয়ে সেই সকল গাছের মতই ঘুরপাক খাচ্ছে। নীচে ব্রজ-বাসীরা কেহ বুকে হাত দিয়ে, কেহ বিস্ফারিত চক্ষে, কেহ গ্রীবা বাড়িয়ে, ঊর্দ্ধে সেই দৃশ্য দেখে কৃষ্ণের জন্য ভয়-ব্যাকুল হয়ে আছে। কোনটিতে একটি ক্ষুদ্রকায় বকের চঞ্চু সুদীর্ঘ হয়ে বৃন্দাবনের প্রায় অর্দ্ধেক জুড়ে কৃষ্ণকে গ্রাস্‌ কর্‌তে বিস্তারিত হয়েছে, ধনুকের ভিতর শর যে ভাবে থাকে, সেই দুই সুদীর্ঘ চঞ্চুর একটিরও উপর পা দিয়ে আর একটিকে ডান হাত দিয়ে ধ'রে কৃষ্ণ সেই ভাবে বকাসুরকে বধ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন। কোথাও কৃষ্ণ কালিয় হ্রদে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছেন; তাঁর নীল কালো অঙ্গ জ্যোতিও কালীয় হ্রদের নীল কালো জল—যেন দুই-ই এক হয়ে মিশে যাচ্ছে। কৃষ্ণের জলে

ঝাঁপ দেওয়ার সঙ্গে চারদিকে সেই নীল কালো জলের পর্ব্বত উঠেছে। দূরে রাখাল-বালকেরা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে আছে। তারপর কৃষ্ণকে সাজিয়ে গোষ্ঠে পাঠাচ্ছেন, বলরাম এক হাতে শিঙ্গা ধ'রে, আর হা কাঁকালে রেখে প্রতীক্ষার ভাবে দাঁড়িয়েছেন। দূরে রাখাল বালকদের কাহারও পাঁচন বাড়ী সমেত হাতখানি, কারও বা মাথার রঙ্গিন পাগড়ী, কারও বা পীতধড়া, কারো প্রেমার্দ্র চক্ষু দুটি—এই সমস্ত মিশে একটা অপূর্ব্ব কমনীয় বর্ণ বৈচিত্র্য প্রস্তুত করেছে। কেবল যশোদা ও কৃষ্ণের প্রমাণ মূর্ত্তি দর্শকের নিকট অতি সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। কৃষ্ণের অলকা-তিলকা শোভিত মুখখানি যেন বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য ছেনে তৈরী হয়েছে, তা'র দিকে মাতৃ হৃদয়ের সমস্ত ব্যাকুলতা নিয়ে যশোদার দুটী চক্ষু সুধা লোভী চকোরের মত পড়ে আছে। তারপর গোষ্ঠের ছবি, কোন রাখাল একটা গরুর লেজ মুচ্‌ড়িয়ে ধরে ছুট্‌ছে। গরুটা ছুট্‌ছে; রাখাল তার সঙ্গে যেতে পাচ্ছে না, দুটো পা ফাঁক হয়ে পড়েছে, অপর অপর রাখালেরা তাই দেখে হাত তালি দিয়ে টিটকারী দিচ্ছে। একটা ছবিতে কৃষ্ণকে কাঁধে করে কোন রাখাল দৌড়িতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছে, ময়ূরের পাখার চূড়ো শুদ্ধ কৃষ্ণ পড়তে চলেছেন, তাঁর একটা পা রাখালের গলাটা আঁক্‌ড়ে ধ'রে আছে। কোনটিতে রাখালগুলি মিলে সবে একপায় দৌড়িয়ে যাচ্ছে, কৃষ্ণ বলরাম সববায়ের আগে আগে।

এর পর রাধা কৃষ্ণের লীলার শত শত ছবি। দেবেশবাবু রাত দিন ক'রে সেগুলি এঁকেছেন। সুন্দর-গঞ্জের হাট হোতে বাবাজি রং তুলি প্রভৃতি সরঞ্জাম কিনে এনে দিচ্ছেন, বাগানের অপরাপর সমস্ত কাজ তিনি কচ্ছেন—এই ব্যাপারে তিনিও যথোচিত শ্রমের ত্রুটি করেন নাই। বড় বড় বাখারি চেঁছে, তা তেলে ডুবিয়ে রেখে, সেই বাখারিতে নানা উপকরণ লাগিয়ে বাবাজি সেগুলি এমন শক্ত ও পাকা করেছেন, যে তাতে কোন

গ্বার সম্ভাবনা নাই, এবং সেগুলি দীর্ঘ কালেও নষ্ট হবার মত সেই বাখারিগুলিতে নানা রকম ফুল লতা এঁকে দেবেশ বাবু তা'দিয়ে লাভের ছবির ফ্রেম তৈরী কল্লেন। তারপর বাবাজি, শ্যামলেশ ও দেবেশ একত্র হয়ে সেই ছবি দিয়ে আট বিঘা জমির প্রাচীর দিলেন। তারপর তার উপর আভের ছাউনী হ'ল। সূর্য্যোদয়ে, সূর্য্যাস্তে, চন্দ্রালোকে এই বিচিত্র বর্ণ সম্পদ নিয়ে "নব বৃন্দাবনের" প্রাচীব এমন অপূর্ব্ব হয়ে উঠ্ল, যে সমস্ত গ্রামবাসী সেই শোভা দেখ্বার জন্য তথায় যেন ভেঙ্গে পড়্লো। একদিকে বিকশিত, বিকাশোন্মুখ, পাতা ঢাকা, সম্পূর্ণ মুক্ত নানা ভঙ্গীতে শাখায় দোদুল্যমান, নীল, কালো, শাদা, লাল ও পীতবর্ণের ফুলগুলি— অপর দিকে কৃষ্ণ লীলার এই নিত্যোজ্জ্বল ছবি-সম্পদ, তারপর সেই ঋতু-পুষ্পের মকমলের শয্যা "নববৃন্দাবন"কে রাজার মত লোকেরও লোভনীয় ক'রে তুল্লে।

একদিন দেবেশ বাবাজিকে বল্লেন, "পূর্ব্বের দিকের ঝিলটা যদি দাদা আমায় দিতেন, তবে আমি "নববৃন্দাবনে" নব যমুনা বহিয়ে দিতেম। ঝিলটার জল কেমন পরিষ্কার নীলাভ, ঐ রংটি আমার বড় প্রিয়। কিন্তু দাদা এক কপর্দ্দক মূল্যের জমিও আমায় দেবেন না তাত জানি, সে বৃথা আশা।" বাবাজি বল্লেন, "আমাদের যা, আছে তাই যথেষ্ট, বেশী লোভ করতে নাই।"

(৭)

এদিকে হৃদয়েশের ভাবটা দেবেশের প্রতি ইদানীং বড়ই কোমলভাব ধারণ করেছে। এ পর্য্যন্ত তো ছোট ভাইটির সঙ্গে তার কোন পরিচয় আছে ইহাই বোঝা যায় নাই। বড় লোকের পোষ্য পুত্র হ'য়ে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করে এসেছেন। বুটাদার শিল্কের জামা পরে, দিব্বি মকমলী উপানহ পায়ে, টেরী বাগিয়ে, ফ্রেন্স ধরণে গোঁপ ছেঁটে, ঘাড়ের চুল ছোট ক'রে কেটে, ল্যাণ্ডো দৌড়িয়ে তিনি যাতায়াত করতেন। কখনও দেখ্‌তেন বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে গামছায় বাঁধা তরিতরকারী, এক পয়সার, লাউয়ের ডাঁটা, দুপয়সার আলু হাতে দেবেশ খড়ম পায়ে বাজার ক'রে আস্‌ছেন। হৃদয়েশ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাতেন না। বাড়ীতে প্রায়ই থিয়েটার, বায়স্কোপ, কীর্ত্তন এ সকল ব্যাপারের ঘটা হোত, কিন্তু এক মায়ের পেটের ভাই বলে পাছে লোকে জান্‌তে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি দেবেশকে আহ্বান কর্‌তেন না। বাপের আমলের তিন টাকা মূল্যের ভোট কম্বল গায়ে দিয়ে যখন দেবেশ তাঁর বাড়ীর কাছ দিয়ে যেতেন, তখন তাঁর নিজের গায়ের বারশ টাকার কাশ্মীর শালখানির লাল পাড়টি পর্য্যন্ত যেন লজ্জায় ম্লান হ'য়ে যেত। তিনি জান্‌লা বন্ধ ক'রে দিতেন।

কিন্তু কয়েক দিন হ'ল দেবেশকে ডেকে তাঁর দাদা বল্লেন, "দেবেশ তোর শীতের কাপড় কিছু নেই—এবার হাড়ভাঙ্গা শীত পড়েছে, তুই আমার এই পুরণো শালখানা নে, এর জমি ঠিক আছে কোন জায়গা ছিঁড়ে যায়নি বা পোকায় কাটেনি, রংটা একটু ময়লা হয়েছে,

তা আলিজান মিস্ত্রিকে দিয়ে পুনরায় রং করে নিলে ঠিক নতুনের মত হবে।” দেবেশ বল্লেন “দিতে চাও, দাও দাদা, আমার গায়ে যে কম্বল, এটি বাবা গায়ে দিতেন, এটা পরতে আমার বড় ভাল লাগে, তাঁর কথা মনে পড়ে, এতে শীতও বেশ নিবারণ হয়। তবে তুমি দেবে, তাকি আমি ফেল্‌তে পারি? তুমি ছাড়া পুরণো জিনিষ আদর ক’রে দিতে আমার আর কে আছে?”

হৃদয়েশ বল্লেন “তোর যদি কোন অভাব থাকে, তবে আমায় বলিস্, তোর দুরবস্থা দেখে আমি প্রকৃতই বড় ব্যথা বোধ করি।”

দেবেশ। “দাদা, কোন অভাবই নেই, বাগান দেখে যাত্রীরা এখন যে টাকা দেয়, তাহাতে বছরে প্রায় ১০০০৲ টাকা হয়, রাধামাধবের দৌলতে আমাদের কোন অভাব নেই, সত্য বল্‌ছি।”

হৃদয়েশ—“কিন্তু তুই যেভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিস্ ত দেখলে যে আমার চোখে জল আসে। তোর অভাব-বোধ পর্য্যন্ত নাই! কুকুর বেড়াল যে নেংটা থাকে তাতে কি তাদের কোন কষ্ট হয়? কিছুই না। এই অবস্থা যে কতটা শোচনীয় তা আর কি বল্‌ব। একটি মাত্র ছেলে, সে শুধু পায়, ছেঁড়া তালি দেওয়া কাপড় পরে রাস্তা ঘাটে বেড়ায়, না তার কোন লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিস্, না তার আত্মসম্মান বোধ জন্মিতে পারে, এমন কিছু করেছিস্, চাষাদের ছেলের সাথে হরিলুট ও হরিসংকীর্ত্তনে ধেই ধেই ক’রে নৃত্য করে বেড়ায়। না,—আমার আর উদাসীন থাক্‌লে চল্‌বে না, দেখ্‌ছি, এদের জন্য একটু মাথা ঘামাতে হবে।”

দেবেশ বল্লে, ‘তা, ভাই যা’ ভাল বোধ কর—তাই ক’রো। আমি তো ছোট, তুমি যদি ভার নেও, তার উপর কথা কি?”

এই ব'লে শাল জোড়া হাতে ক'রে দাদাকে প্রণাম করে দেবেশ বাড়ীতে এলেন। কিন্তু দাদার এ সহানুভূতি সত্বেও যেন তিনি তাঁরা কথায় প্রত্যেকটি স্মরণ করে বেদনা বোধ করতে লাগ্‌লেন। সেই সকল কথায় তাঁর প্রাণ জুড়ায় নি বরং মনে একটা জ্বালার ভাব জাগিয়ে তুলেছে। দেবেশ ভাব্‌লেন "আমারই মনটা কুটিল—দাদার মনটি সাদা, তাই আমার কুটিল মনে তাঁর সাদা কথাগুলির অর্থ কুটিল বোধ হচ্ছে।"

তুলসী দেবী বল্লেন, "এ যে ভাসুর ঠাকুরের শাল, এটা এনেছ কেন?" দেবেশ সকল কথা বল্লেন। তুলসী দেবী একটু চিন্তান্বিত ভাবে বল্লেন, "আজ দিদি এখানে এসেছিলেন। পীপঁড়ার গর্ত্তে হাতীর পা, কোন দিন তো তার এত দয়া দেখিনি। এই দেখ" বলে একখানি উৎকৃষ্ট শান্তিপুরে ধূতি, একখানি ঢাকাই চাদর, একটি রেশমী আলোয়ান ও একজোড়া সাহেবের দোকানে পম্পসু দেরাজ থেকে বার ক'রে বল্লেন, "এই সকল দিদি শ্যামলেশের জন্য দিয়ে গেলেন, তার জন্য কত দুঃখ করলেন; বল্লেন "এত বড় হয়েছে, স্কুলে দেওনি। মূর্খ হয়ে থাক্‌বে, চাষাদের সঙ্গে মিশ্‌ছে, আমাদের মাথা হেট্‌ হয়।" আমি বল্লাম, "শ্যাম তার কানাইদার কাছে পড়ে।" শুনে ঠোঁট বেঁকিয়ে হেসেই অস্থির, বল্লেন, "এক বেটা ভিখারী বিদ্যাপতি নিতাই দাস, ক'রে রাস্তাঘাটে বেড়ায়, ইনি হচ্ছেন শ্যামের স্কুল মাষ্টার। তোরা যে হাসালি!" খুব বড় বড় হীরার একজোড়া অনন্ত নূতন করেছেন তাই আমায় দেখালেন। শ্যামকে আদর ক'রে বল্লেন, "আমাদের বাড়ী যাস্‌, কিন্তু তোর নেংটি পরে যেতে পার্‌বি না, আমি যে পোষাক দিলাম এই পরে যাস্‌। আর ব'ল্লেন, "তোদের জন্য, বোন, আমরা কি করতে পারি, কর্ত্তা আর আমি তাই ব'সে ব'সে ভাব্‌ছি। শীঘ্র ফলাফল জান্‌তে পার্‌বি।"

এই সকল আদর ও আপ্যায়ন ক'রে তিনি চলে গেলেন, কিন্তু"—এই পর্য্যন্ত বলে তুলসী দেবী থেমে গেলেন। দেবেশ বল্লেন, "কিন্তু" কি? কিন্তু বলে থামলে যে?" চোখ মাটির দিকে রেখে তুলসী দেবী ধীরে ধীরে বল্লেন,—"দিদির এত আদর, এই যত্ন ক'রে তত্ত্ব নেওয়া অবশ্য খুবই ভাল, কিন্তু তাঁর কথাগুলি শুনে আমার কান্না পাচ্ছিল, কেন যেন মনে আনন্দ হচ্ছিল না, হয়ত শ্যামের বাগান থেকে আসতে একটু দেরী হয়েছিল—সেই জন্যই বা মন উতলা হয়ে থাকবে।"

এই কথা শুনে দেবেশ একটু ভাবিত হ'লেন, তারপর আবার জিজ্ঞাসা কল্লেন—"বাবাজি কি সত্যই শ্যামকে পড়ান?"

"তা কি? তুমি জান না? বেলা ১১টা থেকে ৩টা পর্য্যন্ত রোজই পড়ান, এর মধ্যে রান্না খাওয়া দাওয়া সব আছে, কিন্তু শ্যামকে শিখোচ্ছেন, তাতে বাদ হবার যো নাই।

"কি পড়ান?"

"তার আমি কি বুঝি? তবে শ্যাম একলব্যের গল্প, ধ্রুব ও প্রহ্লাদের গল্প, শিবিরাজার কথা—এ সমস্ত এমন শিখেছে, তুমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ, যেরূপ ভঙ্গী করে গল্প বলে, তা' শুনে চোখে জল আসে। সে দিন আমি বল্লাম, "দ্রোণ গুরু একলব্যের আঙ্গুলটা কেটে নিলেন, অথচ তিনি তো আর তাকে শিখান নি। সে তপস্যা ক'রে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিল—তিনি হঠাৎ এসে আঙ্গুলটা কেটে তার বিদ্যা নিষ্ফলা ক'রে দিলেন, দ্রোণ কি খুব ভাল লোক?" আমার কথা শুনে শ্যাম বল্লে, "আচ্ছা কানাই দা'কে জিজ্ঞাসা করে উত্তর দেব।" তার পরদিন বল্লে,—"হয়েছে, এই গল্প হচ্ছে গুরুভক্তি দেখাতে,—দ্রোণের কথা ভাবতে নাই। মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পৎ ও মানুষ ভক্তির নিকট কিরূপ ক'রে ছেড়ে দিতে পারে, এইটে হচ্ছে এ'গল্পের শিক্ষা। কারু নিষ্ঠুরতা বেশী ক'রে না দেখালে

এই ত্যাগ উজ্জ্বল ক'রে দেখান শক্ত, কিন্তু দ্রোণ এ গল্পের মুখ্য চরিত্র নয়,—একলব্যের ভক্তিই হচ্ছে মুখ্য বিষয়।"

"তার পর বাল্মীকির রামায়ণ থেকে মূল সংস্কৃত শ্লোক কত মুখস্থ করেছে, যখন রামায়ণের গল্প বলে, তখন সেই শ্লোকগুলি মাঝে মাঝে আবৃত্তি করে, কি সুন্দর আবৃত্তি! নিজে শ্লেট পেন্সিল দিয়ে একটী ক'রে পুরাণের গল্প লেখে ও আমায় প'ড়ে শুনায়। ভাষা এমনই সরল যে পাঁচ বছরের ছেলেও বুঝতে পারে, আর হাতের হরপ কি সুন্দর। দেখবে?""

এই বলে তুলসী দেবী তার খাতার পুঁটুলী হতে একটা লেখা বার করে দেখালেন। দেবেশ আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন, যেন কাগজের উপর সারি সারি মুক্তা বসান। এক পাতায় খানিকটা ইংরেজী লেখা দেখে বল্লেন, "এ লেখা কার?'

কেন, বাবাজি নাকি খুব ভাল ইংরেজী জানেন, তিনিই শ্যামকে শিখিয়েছেন। এই ছয়মাসের মধ্যে শ্যাম কত শিখেছে, তুমি তার কোন খোঁজ রাখ না। শ্যামতো বাবাজি বলতে পাগল, সে বলে, "বাবাজি যখন গল্প বলেন, তখন তার খাওয়া দাওয়ার কথা মনে থাকে না।"

"সে দিন বীর হাম্বীর নামে এক রাজার গল্প শিখে এসে আমায় বল্লে— ইনি বীরভূম অঞ্চলের বিষ্ণুপুরের রাজা, আগে দস্যু ছিলেন, তার পর গোসাইদের পুঁথি লুট করে অনুতপ্ত হন। শ্রীনিবাস আচার্য্য এঁকে দীক্ষা দেন। এই গল্প এমনই ভাবে শ্যাম বলতে লাগল যে আমি চোখের জল সংবরণ করতে পারিনি। তুমি ওর কাছে মহাপ্রভুর জীবনীটি শুন,— গয়ায় গিয়ে যে তাঁর ভক্তি হয়েছিল, সে কথা বলতে গিয়ে শ্যাম নিজেই চোখের জল রাখতে পারে না—সে বলে তোমরা বাবাজির মুখে শুনলে না,

তিনি মহাপ্রভুর কথা বলেন, গান করেন ও কাঁদেন, তোমরা দেখ্‌লে বুঝতে, কানাই দা মানুষ নন, তিনি দেবতা।"

এই সকল শুনে দেবেশ স্তব্ধ হয়ে ভাব্‌লেন, "দাদা স্কুলে দেওয়ার কথা বল্‌ছিলেন—স্কুলে কি আর এ রকমের শিক্ষা হোত?"

(৮)

পরদিন গ্রামখানিতে একটা হুলস্থূল পড়ে গেল। জমিদার কিশোর রায় ইতিপূর্ব্বে দেবেশের "নব বৃন্দাবন" দুই একদিন দেখে গেছেন। আজ তিনি সে পথে যেতে দেবেশকে দেখে পাল্কী থামালেন। বড় বড় রূপার আশা শোঁটা হাতে চোপেদার গুলি স'রে দাঁড়াল। কিশোর রায় নেমে বাগানের দিকে গেলেন। একটা মালতির চারা নিয়ে বাবাজি তখন ব্যস্ত ছিলেন, তিনি মাটীটা খুব ভাল করে গুঁড়ো কচ্ছিলেন এবং মাঝে মাঝে ফুলের চারাটার শেকড়ে একটু জল দিচ্ছিলেন। তখনও সেটা পোতা হয় নাই, বাবাজির ডানদিকে ভূঁয়ের উপর পড়ে ছিল। এমন সময় কিশোর রায় তাঁরই কাছ দিয়ে ঘুরে ঘুরে বাগানের চমৎকার শোভা ও ছবির বহর দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। এর মধ্যে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি বাবাজির দিকে পড়্‌ল। তিনি প্রথম তাকে মজুর ভেবে তার দিকে তাকান নি, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখখানি দেখে বিমূঢ় ও বিহ্বলভাবে খানিকটা দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর এত বড় জমিদার শিশুর মতন আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে "আপনি এখানে?" ব'লে তার চরণতলে লুটিয়ে পড়্‌লেন। বাবাজি তাকে আদর ক'রে ধ'রে উঠালেন—এবং বল্লেন "কর কি কিশোর? লোকে দেখ্‌লে বল্‌বে কি? তুমি রাজা, আমি ফকির; চল ঘরে চল" এই বলে দুজনে বাবাজির ঘরখানিতে গেলেন এবং দরজা বন্ধ ক'রে দিলেন।

দেবেশ স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারপরে কৌতূহল রাখতে না পেরে সরু বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখ্‌তে লাগলেন। তিনি যা দেখ্‌লেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের সীমা রইল না। জমিদারের দুই চক্ষু

জলে ভরা, গা বেয়ে বিন্দু বিন্দু জল পড়ছে। অতি কাতর দৃষ্টিতে তিনি বাবাজির কণ্ঠলগ্ন হয়ে মৃদুস্বরে কি বলছেন; বাবাজি প্রশান্ত করুণ দৃষ্টিতে ডান হাতখানি দিয়ে কিশোর রায়ের চিবুক স্পর্শ করে অতিশয় স্নেহের সহিত কি উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন, তিনি অশ্রু প্লাবিত চক্ষে তা' শুনে একবার নিজের বুক হাত দিয়ে চেপেধরে যেন হৃদয়ের ব্যথা হ্রাস করতে চেষ্টা পাচ্ছেন, এইভাবে এক ঘণ্টাকাল একটা মিনিটের মত চলে গেল। কোন্ গূঢ় দুঃখও মনোবেদনার অভিনয় সেই ঘরে হচ্ছিল, তা দেবেশ বুঝ্‌তে পার্‌লেননা। তিনি আর বেশীক্ষণ চোরের মত সেখানে উঁকি মেরে দেখা নিরাপদ মনে কল্লেন না। কারণ ইতি মধ্যে সেই চোপেদার গুলি ও বরকন্দাজগণ সেই ঘরের কাছে এসে পড়েছিল, এবং বাবাজির ঘরে জমিদার ঢুকেছেন শুনে সেই গ্রামের বহুলোক সেখানে জনতা করেছিল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে দরজার খিল খুলে গেল। ধীর পাদক্ষেপে জমিবাহির হলেন; মনে হ'ল যেন তিনি দুঃখের একটু অবসান পেয়েছেন, মুখ বিষাদপূর্ণ হলেও একটা শান্তির ভাব তার মধ্যে এসেছে।

আর বিলম্ব না ক'রে তিনি পুনরায় বাবাজির পায়ের ধূলো নিয়ে, দেবেশের দিকে স্মিত মুখে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে পাল্কীতে চলে গেলেন।

গ্রামের মধ্যে তড়িৎবেগে এই কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল। কিশোর রায় বাবাজির সঙ্গে সারাটা বিকেলবেলা তাঁর খড়ো ঘরে দরজা বন্ধ করে কি পরামর্শ করেছেন। বাবাজির নাম একদিনে জাহির হয়ে গেল। তার পরদিন থেকে বাবাজির ঘরের কাছে নানাবিধ খাদ্য, ফল ও ফলের উপঢৌকন আস্‌তে লাগ্‌ল। লোকের ভিড় ক্রমশ বেড়ে চল্ল, কিন্তু বাবাজি কোন উপহার গ্রহণ কর্‌লেন না। তাঁদের অনেকেই দেবেশকে বাবাজির বিশেষ প্রিয়পাত্র মনে ক'রে তাকে ধরে যদি কোনদিন বাবাজির অনুগ্রহ পান, এই প্রত্যাশায় তাঁদের উপহার রাধামাধবের মন্দিরে পৌঁছিয়ে দিলেন।

কেউ বা বাবাজিকে মস্ত বড় সাধু মনে ক'রে তার পুত্রের পীড়ার উপশমের জন্য তাঁর পায়ে গিয়ে পড়্‌ল। কেউ বা কিশোর রায়ের ষ্টেটে চাকুরীর জন্য নানা কথার ফন্দীতে একান্ত আনুগত্য জানিয়ে বাবাজিকে ধর্‌ল। বাবাজি এঁদের উৎপাতে অস্থির হয়ে উঠ্‌লেন। প্রথম প্রথম তিনি তাদের অনেক বিনয় ক'রে বুঝোতে চেষ্টা করেছিলেন যে তিনি সাধু কি পীর নহেন, তিনি অন্ধকে চক্ষু দিতে পারেন না, রাজ-যক্ষ্মা আরাম ক'রতে পারেন না, কুষ্ঠ রোগীর গলিত দেহে নবশ্রী আন্‌তে পারেন না। কিন্তু তার কথা কেউ শুন্‌ল না! বরঞ্চ সাধুরা আত্মগোপন কর্‌বার জন্য এইরূপ প্রতারণা করে থাকেন, এই ভেবে তাঁর উপর তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হল। যারা তাঁকে দিয়ে কিশোর রায়ের দরবারে কোন কাজ আদায় কর্‌বার সন্ধানে ছিল, তারা নাছোড়বন্দা হ'য়ে জোঁকের মত লেগেই রইল। বাবাজি অনেক ব'লে কয়েও যখন তা-দিকে ফিরুতে পারিলেন না, তখন অগত্যা কয়েকদিনের জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করে কথাবার্তা একরূপ বন্ধ ক'রে দিলেন।

এদিকে দেবেশের রাধামাধবের আরতির বেশ শ্রীবৃদ্ধি হ'ল, উপহারে তার উঠান ভর্ত্তি হ'তে লাগ্‌ল, ও আর নববৃন্দাবন দেখ্‌বার জন্য যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চল্ল।

বিকেলবেলার ভোগটা আর এখন তুলসী দেবী একা রেঁধে উঠ্‌তে পারেন না, একজন রসুয়ে বামুন মাইনে ক'রে রাখা হ'ল।

কি সুন্দর আরতি! স্বয়ং দেবেশ পুরোহিত। মাধবের কণ্ঠে কোনদিন শুভ্র কুন্দ ফুলের মালা, কোনদিন রক্তবর্ণ রঙ্গন ফুলের মালা, কোনদিন লাল সন্ধ্যা-মালতির পংক্তির ভেতর ছোট একটী নীল ফুল; কখনও বা দুধারে সাদা মল্লিকার রাশি মধ্যে মধ্যে লাল ফুলের আভা। যখন সেই মালা মাধব ও রাধার বুকের কাছে দুলতে

থাকে, শ্বেত চন্দনের ফোঁটায় মাধবের কপাল উজ্জ্বল হয়, এবং সেই দুইখানি আনন্দময় অনিন্দ্য মুখের কাছে দেবেশের করধৃত পঞ্চপ্রদীপ ঘুর্‌তে থাকে, কিংবা চামর দুল্‌তে থাকে, ধোঁয়ার মাঝে অসীমের সত্বা অর্দ্ধলুপ্ত হয়ে সীমাবদ্ধ হয়, সেইরূপ কেমন সুন্দর দেখায়! বাবাজি মৌনব্রত ত্যাগ করে গান কর্‌তেন ও শ্যামলেশ নাচ্‌ত। পাড়ার গয়লাদের ছেলেরা হাততালি দিত। আরতি কর্‌তে কর্‌তে দেবেশ মাতালের মত টল্‌তেন, তাঁর পা দুখানিও যেন আনন্দভরে নাচ্‌তে থাকত, পঞ্চপ্রদীপের আলো দেবতাদের মুখ হ'তে প্রতিবিম্বিত হয়ে আরতি কারীর মুখ চোখের উপর পড়ত, তুল্‌সীদেবী তখন দরজার ফাঁক দিয়ে নির্নিমেষে সেই আরতির শোভা দেখ্‌তেন—আরতি দেখ্‌তেন কি দেবেশের মুখ দেখতেন? তাঁর দুটি চোখ্‌ ব্যাকুল হয়ে সেই মুখখানির উপর পড়ে থাকৃতো, যেন বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হ'ত। রাধামাধব-বিগ্রহের-কথা তাঁর মনে থাকৃত না,—কেবল স্বামীর রূপ দেখে চক্ষু ভ'রে যেত, চোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিত। একদিন বাবাজি তদবস্থায় তুলসী-দেবীর মুখখানি কপাটের আড়াল থেকে দেখে কেঁদে বলেছিলেন, "ভগবান! তোমার দেখে আমার এমনই আনন্দ হোক, আমি আর কিছু চাইনা।"

দেবেশ অবশ্যই বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কিশোর রায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কবে হয়েছে! বাবাজি বল্লেন "সে অনেকদিন, কিন্তু এ সকল কথা আমি তোমায় কিছু বলব না।" দেবেশ তদবধি বাবাজিকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই।

---

(৯)

এর মধ্যে হৃদয়েশের স্নেহ ক্রমশই বেড়ে উঠেছে। একদিন রাজনারায়ণ বাবু (তাঁর এক কর্ম্মচারী) দেবেশকে নির্জ্জনে বল্লেন "শুনেছি, আপনি যে ঘর খানায় শয়ন করেন, তার ছাদ দিয়ে নাকি জল পড়ে। ছেলে নিয়ে বড় কষ্ট পান, আমাদের বাবু সর্ব্বদাই দুঃখ করেন।"

দেবেশ একটু হেসে বল্লেন, "পুরানা বাড়ী, ছাদের একটা জায়গা দিয়ে জলপড়ত বই কি? কিন্তু আমি তা' বন্ধ করে দিয়েছি। গেল বর্ষায় আর জল পড়ে নি।"

রাজনারায়ণ......"কি করে বন্ধ কল্লেন?"

দেবেশ......"খানিকটা সুরকী, চুন ও বিলাতী মাটী একত্র ক'রে, সুরকীগুলি খুব ভাল করে গুঁড়ো করে, সবটা মিশিয়ে একটা চূর্ণ তৈরী করা গেল। তারপর ঘুঁটে গুঁড়ো করে তার সঙ্গে মেশান হ'ল। এই মসলাটা চিরের মুখে খাইয়া দিলেম, ও ঘ'ষে ঘ'ষে এমনি ভাবে ছাদের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেম যে চিরটা আর টের পাওয়া গেল না। তারপর ৩।৪ দিন রো'দ লেগে সেগুলি এঁটে গেল। গেল বর্ষায় এক ফোটাও জল পড়ে নি।"

রাজনারায়ণ..."ঐ ভাবে কি আর ছাদ মেরামত হয়? পুরানা ছাদটা ফেলে দিয়ে নূতন একটা গড়্তে হবে। এ তালির কর্ম্ম নয়, তালিতে দুই একবৎসর চল্‌তে পারে, তার পর যেমন ফাঁক তেমনই ফাঁকে!"

দেবেশ......"তা আর কি করব বল ভাই? ছাদ ফেলে দিয়ে ছাদ গড়্‌তে গেলে যেমন তেমন করে ৩০০।৪০০ টাকা খরচ পড়ে।"

রাজ……“কিন্তু রাধা মাধবের সেবায় ও ‘নব বৃন্দাবন’ দিয়ে এখন আপনার বেশ দু পয়সা আয় দাঁড়িয়েছে।”

দেবেশ…“সেবার পয়সা নিজের সুখের জন্য খরচ করব? তা কি করে হয় রাজনারায়ণ বাবু? তারপর ছাদ দিয়ে এখন ত আর সত্যি সত্যি জল পড়্ছে না। রাধামাধব সেবার এক পয়সাও আমি রাখি না, নিত্যকার আয় প্রায় নিত্যই খরচ করে থাকি।”

রাজা…“আপনারা তো মেজের উপরই বিছানা ক'রে শুয়ে থাকেন। একতালার ঘর, খাট না হলে কি তার উপর শুতে আছে! শ্যামলেশ কচি ছেলে, তার অসুখ করার কথাও কি আপনি একবার ভাবেন নি? তার পায়ে কখনও জুতো দেখি নি।”

দেবেশ……“বলুন দেখি, আমার অভাবগুলি নিয়ে আপনি এরূপ নাড়াচাড়া কচ্ছেন কেন? অভাব ভাব্লেই অভাব, মনের তৃপ্তি থাক্‌লে অনেক অভাবের কথা মনেই হয় না।”

রাজ……“আপনি বড়বাবুর সহোদর ভাই, তিনি থাকেন ত্রিতল ঘরের হাতীর দাঁতের খাটে মকমলের বিছানায়, আর আপনি শুধু মেজের উপর স্ত্রী পুত্র নিয়ে পড়ে থাকেন—তার উপর ছাদ দিয়ে জল পড়ে। এটি ভাব্‌তেও আমাদের কষ্ট হয়, এজন্য বলা। নইলে কত লোক ত গাছতলায় থাকে, একখানি কুঁড়ে ঘরও জোটে না, তাদের জন্য ত মাথা ঘামাই না।

দেবেশ…“কি করব রাজনারায়ণবাবু, সকলের অবস্থা তো আর সমান নয়।”

রাজ…“সেদিন শ্যামলেশকে দেখ্‌লুম একখানি ছেঁড়া কাপড় পরে পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের বাবুর চাকর-বাকরেরা যদি ওরূপ কাপড় পরে, তবে কর্ত্তাবাবু তাদের বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেন না।”

দেবেশ…"শ্যাম কি দুঃখ ক'রে কিছু বলেছে ?"

রাজ…"ঠিক তা নয়, কিন্তু সে যে ভাবে আমাদের গেটের পাহারা-ওয়ালাদের তক্‌মারি পোষাকের দিকে চেয়েছিল, তাতে মনে হ'ল যেন সে নিজের ময়লা কাপড় দেখে লজ্জায় দুঃখে ম'রে যাচ্ছে। এরূপ ভাব হওয়াই স্বাভাবিক। সেদিন কর্ত্তাঠাকরুণ আপনাদের ওখানে গেছ্‌লেন, তাঁর বড় হীরার তাগাটা হাতে ছিল। তিনি এসে বল্লেন, তাঁর তাগা দেখে ছোটবউ (দেবেশের স্ত্রী) নিজের শুধু হাতদুখানি আঁচলের ভিতর ঢেকে রইল, একি সোজা দুঃখ দেবেশবাবু? এ সব দেখে শুনে আমাদের বড় কষ্ট হয়, অন্ততঃ বাড়ীখানা দ্বিতল ক'রে আস্‌বাব্‌ পত্র ভাল রকম করা আপনার একান্ত দরকার হয়েছে।"

দেবেশ…"আপনি কি বলেন, আমি রাধামাধবের সেবা সংক্ষেপ করে, তাঁর আয়টা নিজের সুবিধায় লাগাব ?"

রাজ…"তাতেই বা দোষ কি ? পাণ্ডারা ত সব তীর্থে লাখ লাখ টাকা রোজগার কচ্ছে—তা কি তারা সবই মন্দিরে দান করে ?"

দেবেশ…"না, রাজনারায়ণবাবু্‌ আমি প্রাণ থাক্‌তে নিজের সুখের জন্য রাধামাধবের সেবার টাকা ভাঙ্গতে পার্‌ব না।"

রাজনারায়ণ বাবু্‌ যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়্‌লেন। তারপর চট্‌ করে মাথায় যেন একটা মতলব এল। তিনি বল্লেন, "আচ্ছা, নব বৃন্দাবনের জন্য যে আপনি খেটে খেটে হয়রাণ হলেন, এতে আর এমন কি আয় হয়! এটা বিক্রী ক'রে ফেল্লে দোষ কি ? যদি কেউ ১৫।২০ হাজার টাকা দেয়—তা হ'লে আপনার সকল অভাব মোচন হয়। আপনি যদি বলেন, তবে আমি কর্ত্তাবাবুর নিকট প্রস্তাব করতে পারি। তিনি আপনার সম্বন্ধে' যেরূপ দয়ার্দ্র-চিত্তে

ভাব্‌ছেন···তাতে হয়ত সম্মতও হ'তে পারেন।"

দেবেশ···"আপনি কি বল্‌ছেন, রাধা মাধবের নামে উৎসর্গ করা "নব বৃন্দাবন" বিক্রী ক'রে আমি নিজের শোবার ঘর ত্রিতল করব, খাট কিন্‌ব এবং শ্যামলেশের পায়ের জুতো কিনে দেব! এমন পাপ কথা যেন আমার শুন্‌তে না হয়।"

রাজ···"মহাশয়, আমি আপনার সুখ-স্বচ্ছন্দের জন্যই একটা কথা বলে ফেলেছি। আপনি বুঝ্‌তে পাচ্ছেন কেউ আমাকে এজন্য কিছু বলে দেয় নাই। আমি নিজে যতটা ভেবেছি, তাতে ঐরূপ একটা কিছু কল্লে আপনি সুখী হবেন এই আমার বিশ্বাস! এই কথা বলে যদি কোন অপরাধ ক'রে থাকি, তবে, দেবেশবাবু, দোহাই আপনার, আমাকে মাপ করবেন, এবং একথা আর কারু কাণে তুল্‌বেন না।"

দেবেশ···"দেখুন এই বাগান, রাধামাধব বিগ্রহ এবং শ্যামলেশ, এঁদের সম্বন্ধে খুব ছোট কথায়ও আমার বুকের তারগুলি যেন অস্থির হ'য়ে বেজে উঠে। আপনি নিশ্চয়ই আমার কিসে ভাল হবে, তাই ভেবে কথাটি বলেছেন, কিন্তু আমারই হৃদয়ের দুর্ব্বলতার দরুন হয়ত'আমার উত্তরটা একটু রূঢ় রকমের হ'য়ে গেছে। আপনিই আমাকে মাপ করবেন।"

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা হৃদয়েশবাবু একটা মক্‌মলের তাকিয়ায় ঠেশ্‌ দিয়ে সোণার আল্‌বোলাটা এক হাতে ধ'রে কি ভাবছেন! চাকর রূপোর কল্কের সঙ্গে রূপোর শেকলে আঁটা একটা কাঁটা দিয়ে তামাকের আগুণ উস্কে দিচ্ছে ও আস্তে আস্তে ফুঁ দিচ্ছে, এমন সময় তাঁর কর্ম্মচারী রাজনারায়ণ এসে উপস্থিত।

হৃদয়েশ তাকিয়ায় হেলান দিয়ে ছিলেন, কিন্তু সোজা হয়ে বস্‌লেন,

আল্‌বোলার সোণার নলটা হাত হ'তে খসে পড়্‌ল। অত্যন্ত উৎসুক-ভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁহে, দেখা পেলে ?"

রাজ…"আজ্ঞে হাঁ দেখা করেছি ! খবর বড় সুবিধার নয়।"

হৃদয়েশ…"কি খুব চটে উঠেছিল নাকি !"

রাজ…"প্রথমটা একটু রূঢ় ভাষায় কথা কইছিল বই কি ?"

হৃদয়েশ…"তারপর ?"

রাজ…"তারপর একটু নরম সুরে ক্ষমা চাইল বল্লে, আপনি আমার ভাল ভেবেই প্রস্তাবটি করেছেন,—কিন্তু আমার এই সখের জিনিষটা সম্বন্ধে মনের একটা দুর্ব্বলতা আছে, তাই প্রথম কথাটা শুনে মনের আবেগ সংবরণ করতে পারি নাই, হয়ত বা আপনাকে দুটো রূঢ় কথা বলে ফেলেছি—আমায় মাপ করবেন।"

হৃদয়েশ…"কিন্তু এ কথায় তো আমি হাল ছেড়ে দেবার মতন কিছু পাচ্ছি না। প্রথম মনের একটা ভাব থাকে,—তারপর লোভ ক্রমে মন অধিকার করলে সে ভাবটা আর থাকে না। কিন্তু লোভটার মূলে একটু চেষ্টার জল সেচন কর্‌তে হয়, ধীরে ধীরে লোভটা বড় হয়ে পড়ে এবং অপর সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হয়। একটু সবুরে ফল ফল্‌বে, রাজনারায়ণ,—চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়—যেরূপে হয় বাগানটি আমার চাই, আমার এমন একশ বিঘার বাগানটি, এমন নীলাভ বড় ঝিল্‌টা ঐ ছোঁড়াটার বাগানটায় মাটী করে ফেলেছে। "নব বৃন্দাবন" আট বিঘা মাত্র, ঐটে মুখপাত হয়ে পড়েছে, দেশ-দেশান্তরে যাই, আমার পরিচয় হয় 'ইনি হচ্ছেন "নব বৃন্দাবনের" দেবেশ বাবুর ভ্রাতা' বল' দেখি এরূপ পরিচয়ে আমার মানটা কেমন ছোট হ'য়ে যায়। ওটি হাত করতেই হবে। রাজনারায়ণ, চেষ্টা চালাও।"

রাজ…"যেরূপ ভাবে বুঝ্‌লেম—সহজে দেবেশবাবু যে "নব বৃন্দাবন" ছাড়্‌বেন, এমন তো বোধ হয় না।"

হৃদয়েশ…"সহজে না হয়, বিপরীত পথে চল্‌তে হবে—এত আদর স্নেহ এ সকল কি বিফল হবে?"

রাজ…"একটা উপায় আছে মনে কচ্ছি, কানাই বাবাজি যা বলেন, দেবেশবাবু বেদবাক্যের মত তা মানেন,—তাকে দিয়ে যদি বলান যায়!"

হৃদয়েশ…"তিনি কেন আমাদের হ'য়ে দেবাকে বল্‌তে যাবেন? তাঁর ত অর্থ কড়ির লোভ কিছু মাত্র নাই, তাঁকে কি ক'রে বশ করা যেতে পারে!"

রাজ…"আচ্ছা আমি সে চেষ্টায় নাম্‌ব। চট্‌ করে বেশী আগ্রহ দেখালে সব মাটী হবে। ধীরে ধীরে চেষ্টা করা যাক্‌।"

হৃদয়েশ…"আমিও তাই বলেছি, এদিকে গিন্নিও আমারই মত ক্ষেপে গেছেন, তিনি বল্‌ছেন "নব বৃন্দাবনটা" নিতেই হবে, তা একটু দেরী হয় তাতে দোষ কি'?"

অদ্বৈতবংশ রামকৃষ্ণ গোঁসাইর বাড়ী ঢাকা জেলার বেতিলা গ্রামে। ইনি গোঁড়া বৈষ্ণব, সিন্দূরতলা ও তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটী জায়গায় ইহাঁর অনেক শিষ্য আছে। ইনি ভাল মানুষ লোক, প্রৌঢ় বয়স্ক গোঁপ দাড়ী কামান, রংটাকে ফর্‌সা বলা যেতে পারে। শিষ্যবর্গের পরম ভক্তির সহিত দেওয়া ক্ষীর, সর, নবনী খেয়ে শরীরে বেশ একটা চিক্‌নাই হয়েছে। একসহস্র তন্তুবায়, পঞ্চশতাধিক তেলী এবং আটশত দ্বিষষ্টি কর্ম্মকার এবং অপরাপর জাতীয় প্রায় তিনশত শিষ্যের সঙ্গে কথোপকথনের ফলে সর্ব্বদা নিজের প্রভুপাদত্ব অবিসংবাদিত-রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তিনি একবারেই প্রতিবাদ সহ্য কর্‌তে পার্‌তেন না। শাস্ত্রবিচারে তিনি ব্যাঘ্র, কিন্তু যারা তাঁর কথা ঘাড় পেতে গ্রহণ করে এবং গরুড়পক্ষী হয়ে সর্ব্বদা সহচর ভাবে থাকে তাদের প্রতি গোঁসাইজীর অত্যন্ত দয়া। শিষ্যদিগকে পীড়ন ক'রে কিছু আদায় করেন না, বরং একান্ত অনুগত শিষ্য দুঃসময়ে পড়্‌লে তাকে সাহায্য ক'রে থাকেন। এজন্য শিষ্য সেবকেরা ইহাঁকে ভালবেসে থাকে। শাস্ত্রের কথা তুল্‌লে তন্তুবায়, কর্ম্মকার, তেলী প্রভৃতি জাতীয় শিষ্যেরা তাঁর কথা বেদবাক্য বলেই মনে করে। সুতরাং বেদীর উপর ব'সে তিনি যা' কিছু বলেন, গ্রামের স্ত্রী পুরুষেরা মাথা হেট্‌ করে শোনে এবং বাসুকী ফণা নাড়া দিলে ভূমিকম্প হয়, একটা সোণার ডিম ভেঙ্গে তারমধ্য হ'তে চোদ্দভুবন ফেটে বার হয়েছিল, দিগ্‌ হস্তীরা পৃথিবীটা কাঁধে ক'রে আছে, এ সকল তত্ত্ব তিনি বুঝিয়ে গেলে অমনই

শিষ্য সেবকগণদের কণ্ঠস্থ হয়ে যায়, এবং সেই জ্ঞান পিতৃ পিতামহ কর্ত্তৃক অর্জ্জিত হয়ে পুরুষানুক্রমে সকলের মাথায় চ'ড়ে চৌদ্দপুরুষ পর্য্যন্ত অবাধ-গতিতে নীচে নাম্‌তে থাকে।

রাজুপোদ্দার একদিন বল্লে, "প্রভু, সিন্দুরতলায় এক বৈষ্ণব সাধু এসেছেন, এতবড় সাধু নাকি দেশে আর নাই। গ্রামের রাজাবাবু সাধুর কুঁড়েঘরে এসে সকল বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিয়ে কাজ করেন, কত লোক কত উপহার দিতে যায়, কারু কাছে কপর্দ্দকও নেন না। লোকের দৌরাত্মির গতিকে কতদিন মৌনী হয়ে ছিলেন এখন আবার সকলের সঙ্গে কথা কইছেন, খুব ভাল কীর্ত্তন গাইতে পারেন, যে শোনে সে আর তাঁর কাছ থেকে উঠে যেতে চায় না।"

গোসাই···"কোন জমিদারের কথা বল্লে? কিশোর রায়? যাঁর আর ৫।৬ লাখ টাকা?"

পোদ্দার...."আজ্ঞে হাঁ।"

গোসাই···"সেই সাধুর পরামর্শ নিতে কুঁড়ে ঘরে আসেন?"

পোদ্দার···"আজ্ঞে প্রভু ঠিকই।"

গোসাই···সে সাধুকে একবার আমার নিকট নিয়ে আস্‌তে পার?"

পোদ্দার···"আপনি প্রভুপাদ, আপনি ডাক্‌লে না এসে থাক্‌বে, সে তা হ'লে বৈষ্ণবই নয়। তবে কিনা---"

গোসাই···"বুঝেছি—যদি না আসেন! তাঁর বয়স কত, আমাদের অপেক্ষা বেশী বয়স নাকি?"

পোদ্দার···"আজ্ঞা হাঁ, প্রভুর বয়স জোর ৪০ হবে—কিন্তু তাঁর বয়স ঢের বেশী, অনেকগুলি চুলই পাকা।"

গোসাই···"আচ্ছা তবে তাঁকে কষ্ট দিয়ে কাজ নেই, কাল সকালে আমি নিজেই যাব, এখান থেকে তো আর বেশী দূর নয়?"

পোদ্দার…"আড়াই মাইল হবে।"

গোঁসাই…"সে স্বচ্ছন্দে যাওয়া যাবে ভোরের বেলায়।"

মোট কথা যে সাধু কিশোর রায়কে বশ করে ফেলেছে, তাঁকে শাস্ত্রের কথায় হার মানিয়ে বশ করতে পারলে সেতো আমার হবেই, সঙ্গে সঙ্গে কিশোর রায়কে পাওয়া যাবে।" গোঁসাই মনে মনে এই চিন্তা কচ্ছিলেন। কিশোর রায়ের অনেক বৈভব আছে, গোঁসাই সে জিনিষটার উপর ততটা লোভ করেন নাই, কিন্তু এতবড় একটা লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি পেলে যে তাঁর প্রতিপত্তি, বিদ্যার যশঃ ভয়ঙ্কর বেড়ে যাবে, এই ভরসায় তিনি লুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

পরদিন কানাই বাবাজি নববৃন্দাবন হ'তে দুটী "কৃষ্ণপদ," ফুল তুলে সাদা পাপড়ির উপর কৃষ্ণের নীল পায়ের ছাপ দেখ্‌ছেন, তাঁর চোখে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিয়েছে। এই তাঁর 'পাদপদ্ম'! কি সুন্দর! ফুলের উপর পা দিয়ে ফুলটিকে আরও সুন্দর করেছেন, গয়ায় কত পর্য্যটন ক'রে লোক যায় পদাঙ্ক দেখ্‌তে, আমি সেই পদাঙ্ক এখানে হাতে হাতে পেয়েছি। ফুলটি একবার মাথায়, একবার বুকে, রাখ্‌ছেন, আর চোখ গড়িয়ে জল পড়্‌ছে। এমন সময় দেখ্‌তে পেলেন, পা দুটি বড় রকমের ফাঁক ক'রে, একটি টিকিওয়ালা ফুলদার জুতো পায় দিয়ে, গরদের "হরে কৃষ্ণ" ছাপ মারা নামাবলি গায়ে, মাথার পেছনে তুলসী পত্রযুক্ত বড় টিকি ঝুল্‌ছে—পুরু ঠোঁট দু'খানি ফাঁক হয়ে আছে—কারণ গোঁসাইজি হেঁটে এসে হাঁপাচ্ছেন—এই অবস্থায় অদ্বৈত হ'তে ১৩ পুরুষ ব্যবধান নেত্তিলাবাসী রেমো গোঁসাই বাগানের দিকে আস্‌ছেন, ও তার পেছনে এক গোষ্ঠী গরুড় পক্ষীর দল—কেউ ময়লা চাদর গায়ে মাথায় তিলক, কেউ বুড়, খক্ খক্ করে কাস্‌ছে, লাঠিতে ভর করে আস্‌ছে, কেউ গোঁসাইজির গায়ের মাছি চামর দিয়ে তাড়াতে তাড়াতে আস্‌ছে, কেউ

একটা বড় ছাতা ধ'রে গোঁসাইজির ঘাড় নাড়ার সঙ্গে রোদটা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে গলদঘর্ম্ম হ'য়ে যাচ্ছে। একজন শিষ্য এগিয়ে এসে বল্লে "এই যে সাধুবাবা বাগানে বেড়াচ্ছেন।"

দুটি পা ফাঁক ক'রে রেমো গোঁসাই সেখানে দাঁড়িয়ে পড়্‌লেন। দাঁড়িয়ে কানাই বাবাজিকে আপাদমস্তক লক্ষ্য কর্‌তে লাগ্‌লেন। ভারতের মানচিত্রের কাছে দাঁড়িয়ে শিক্ষার্থী যেরূপ হিমালয় হ'তে কুমা-রিকা পর্য্যন্ত সকল রাজ্যের উপর একবার চোখ বুলিয়ে যায়—এ পরিদর্শন তদ্রূপ। রেমো গোঁসাই কিছুকাল ধ'রে বাবাজিকে দেখ্‌ছেন; বাবাজি 'কৃষ্ণপদ' ফুল দুটি বুকে রেখে তাঁর কৃষ্ণের কথা ভাব্‌ছেন। দুইজনই স্থির চিত্রপটের ন্যায়। খানিকক্ষণ পরে বাবাজির মনোযোগ গোঁসাইয়ের প্রতি পড়্‌ল; তিনি দেখ্‌লেন গোঁসাইজি, হাঁ করে তাঁকে দেখছেন। মৃদুভাবে একটু হেসে তিনি বল্লেন, "গোঁসাইজি আমায় দেখে যে অবাক্ হ'য়ে পড়েছেন, বাস্তবিক আমার মধ্যে যে এত বড় একটা দর্শনীয় জিনিষ থাক্‌তে পারে যে আপনার মত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এতক্ষণ ধ'রে তা' দেখতে পারেন, এটা আমার ধারনাই হত না।" গোঁসাইজি থতমত খেয়ে বল্লেন, "শুনেছি আপনি একজন বড় সাধু, আমি সাধু দর্শন করতে এসেছি, আপনার মুখে চোখে কোন অলৌকিক শক্তির প্রভাব আছে কি না, দু মিনিটকাল তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিলাম।"

"অবশ্যই কিছু পেলেন না, যদি কিছু সে রকমের থাক্‌তো তবে অবশ্য ধরা পড়ে যেত।" এই বলে বাবাজি পুনরায় একটু মৃদু হাস্‌লেন। তারপর অতিশয় আদরের সহিত গোঁসাইজি ও তাঁর পরিকরবৃন্দকে নিজ ঘরে নিয়ে এলেন। সেই গ্রামবাসী হরিচরণ দাস তন্তুবায় গোঁসাই-য়ের শিষ্য। সে টিকিটি দুলিয়ে, ডানহাত বার করে, সম্ভ্রমের আধিক্যে পিঠটা অনেকটা নুইয়ে, অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক বল্লে, "বাবাজিঠাকুর, ইনি

হচ্ছেন অদ্বৈতবংশ মহাপ্রভু,—শাস্ত্রজ্ঞানে অদ্বিতীয়, এই বাঙ্গালাদেশে রেমো গোঁসাইয়ের নাম কেনা জানে? এই নরাধমের গুরু, বহুভাগ্যে এই কীটের প্রতি সদয় হ'য়ে মন্ত্র দিয়েছেন।" বাবাজি এই কথা শুনে গোঁসাইজির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কল্লেন, এবং বল্লেন, "আপনি অদ্বৈতবংশীয়, যাঁরা বৈষ্ণবের কণ্ঠী ধরেছেন—তাঁদের সকলের নমস্য।" সাধু যথন গোঁসাইয়ের পায়ে হাত দিলেন, তথন তাঁর মুখ চোখের ভাব ও মুর্ত্তিটী যেমন হ'ল তা বর্ণনা করে যাচ্ছি। অহঙ্কারে তাঁর স্থূলদেহ যেন আরও একটু ফেঁপে উঠ্‌ল, পুরু দুইটি ঠোট একটু ফাঁক হ'য়ে বড় বড় কয়েকটি দাঁতের শোভা প্রকাশ করে দেখাল—সেটি মৃদু হাস্য কি চূড়ান্ত গর্ব্ব, কি 'আহ্লাদে আটখানা' অথবা এই সমস্ত ভাবেরই কিছু কিছু নিয়ে অধরান্তরালে দাঁতকটি প্রকট করে দেখাল, তাহা ভাবিবার বিষয় বটে। ডান চোখে একটা তারা প্রায় এককোণে সরে যেয়ে শিষ্যবর্গের প্রতি যেন অপাঙ্গদৃষ্টি করে বল্‌তে লাগল—"ভাখ, আমি কত বড় লোক!" বাম হাতে একটা নস্যের বাক্স আনন্দের চোটে যেন হাত ছাড়া হয়ে মাটীতে পড়ে আর কি? এবং গরদের ধুতির কাছাটা যেন প্রকৃতই খুলে গেল। তাঁর তুলসীর মালাটা বুকের কাছে দুলতে লাগ্‌ল ও টিকিটা সজারুর কাঁটার মত সোজা হয়ে দাঁড়াল।

গোঁসাইজি মনে ভাবছেন—"এত বড় সাধু,—কিশোর রায় পরামর্শ নেবার জন্য যার খড়ো ঘরে এসে নিজে উপস্থিত হন, তিনি নিজে তাঁর পায়ের ধূলো নিয়েছেন—সব শিষ্যগুলিতো দেখ্‌তে পেয়েছে! আজই কথাটা গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে পড়্‌বে। এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে তাঁর মনে এত আনন্দ হ'ল যে গোঁসাইজি ৩।৪ মিনিট কথা বল্‌তে পার্‌লেন না।

এর মধ্যে গোঁসাইজি প্রভৃতি অতিথি এসেছেন দেখে, পাড়াপড়শী

বহু লোক নানারূপ খাবার নিয়ে সাধুবাবার বাড়ীতে এলেন। চাল, ডাল, শর্করা, দধি দুগ্ধ, ঘৃত ও নানারূপ ফলে উঠান ভর্তি হয়ে গেল। কিন্তু হরিচরণ দাস দুই হাঁটু মাটীতে রেখে, ঠিক হামাগুড়ির ভাবে বাবাজির পায়ের কাছে বসে প'ড়ে কাঁদ কাঁদ সুরে বল্লে—"আমার বাড়ীতে গোঁসাইজির সেবা হবে। এই কুনিকিট বহু চেষ্টা করে বাড়ীতে উদ্যোগ করেছে। একজন ভাল বৈষ্ণব বামুন রান্না কচ্ছেন, এখানে আহারের জোগাড় কল্লে আমি হত্যা দিয়ে মর্‌ব," বাবাজি হেসে বল্লেন, "আপনারা এগুলি নিয়ে যান, আমাব আজ মাধুকরী হবে, আর একদিন না হয়" গোঁসাইজির শিষ্যের তিন চার জনে সমস্বরে বলে উঠলো—"তা হবার উপায় নাই, গোঁসাইজি চার পাঁচ বছর পরে বহু সাধ্য সাধনার ফলে এসেছেন—আর মাসখানেক থাকবেন, তা শিষ্যদের বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র খাবার জোগাড় হ'তেই পারে না। সকলেই প্রত্যাশা ক'রে আছে।"

যাঁরা জিনিষপত্র নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরা সেগুলি ফেরত নিয়ে চল্লেন; কারণ বাবাজি একবার যা' বলেন, তার অন্যথা কিছুতেই করেন না। পথে তাঁরা সমস্ত জিনিষ রাধামাধবের মন্দিরে দিয়ে গেলেন, বাবাজি মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলা সেখানে শীতলভোগের কিছু খান, এটি তাঁরা জানতেন।

প্রথমকার আনন্দ ও গর্ব্বের চোট সামলে নিয়ে গোঁসাইজি মুখ খুল্লেন। একখানি পীড়ের উপর শ্রীপাদ পদ্মাসন ক'রে বস্‌লেন, তারপর মুখ থেকে যেন খৈ ফুটতে লাগল। তাঁর পায়ের কাছে বিনীতভাবে বাবাজি ব'সে শুনতে লাগলেন। দূরে পরিকরেরা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে প্রভুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রভু দ্বাদশ-গোপালের কথা তুল্লেন,—আঙ্গুল গুণে গুণে প্রত্যেকটি গোপালের বিষয় ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। "খানাকুলের অভিরাম গোস্বামী

হচ্ছেন আদি গোপাল, ইনি বৃন্দাবন লীলার শ্রীদাম সখার অবতার, মহেশপুরের সুন্দরানন্দ ঠাকুর হচ্ছেন দ্বিতীয় গোপাল, ইনি হচ্ছেন ব্রজলীলার সুদাম," অনিমিকার দ্বিতীয় রেখায় খুব জোরের সহিত বৃদ্ধাঙ্গুলী ঠেকিয়ে বল্লেন "আকনা মহেশের কমালকর পিপলাই হচ্ছেন কৃষ্ণসখা কোকিলের অবতার, ইনিই তৃতীয় গোপাল" ক্রমশঃ উৎসাহ বৃদ্ধির সঙ্গে চোখের তারা দুটি রাধাচক্রের ন্যায় মাঝে মাঝে একবার উর্দ্ধে ও একবার নিম্নে ঘুরতে লাগল;—বিপুল উৎসাহে করাঙ্গুলী গুনতে গুনতে শেষে দেখেন, দ্বাদশ গোপালের জাগায় চৌদ্দ গোপাল হ'য়ে গেল। তখন নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে একটু ভাবতে লাগলেন—ঠোঁট দুটি আরও ফাঁক হ'য়ে গেল, হঠাৎ একটা তুড়ি মারলেন, নইলে একটা মাছি সেই মুক্ত বদন বিবরে নিশ্চয়ই ঢুকে পড়ত। গোঁসাই দমিবার লোক নহেন, আবার উৎসাহের সঙ্গে চৈতন্য লীলার সঙ্গীরা কে কা'র অবতার বলে যেতে লাগলেন, রূপ—কৃষ্ণলীলার রূপমঞ্জরী, সনাতন লবঙ্গ মঞ্জরী, কবিকর্ণ পূর—গুণ চূড়া; এই ভাবে বহুবৈষ্ণবের পূর্ব্ব অবতার চাক্ষুষ প্রমাণের ন্যায় গর্ব্বভরে দেখিয়ে দিতে লাগলেন। মুরারিগুপ্ত হনুমানের অবতার এবং পুরন্দর পণ্ডিত অঙ্গদের অবতার নির্দ্দেশ করে বল্লেন "পুরন্দর পণ্ডিতের লাঙ্গুল অনেকেই দেখেছিলেন,—বৈষ্ণব দাসের বৈষ্ণব বন্দনায় তাহা লেখা আছে"। এইবার কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিল, এবং খর্ব্বনিক নাকটা খুব বাঁশীর মত হেলিয়ে রেখে খুব একচোট নস্যি উর্দ্ধ দিকে টেনে নিয়ে চৈতন্যদেব যে গোপীনাথের সঙ্গে মিশে গেছলেন, তা' ব'লতে গিয়ে অশ্রুপাত করলেন, এবং তিনি ঝাড়ি খণ্ডের বনে যে বাঘের মুখে হরিনাম বার করেছিলেন—বলদেব ভট্টাচার্য্য উক্ত এই কাহিনী বলতে গিয়ে ভাবে গদ্‌গদ্ হলেন। তারপর আরও কত কথা! তাঁর বিদ্যার ভাণ্ডার যা কিছু ছিল একবারে উন্মুক্ত করে ফেল্লেন—শ্রীগোবিন্দকে ঈশ্বরপুরী পাঠিয়েছিলেন,

এজন্য সে শূদ্র হয়েও মহাপ্রভুর সেবার অধিকার পেয়েছিল। চৈতন্য চরিতামৃত ও চৈতন্য ভাগবত অপূর্ব্ব গ্রন্থ, কারণ তাদের পূর্ব্বে জগতে (এক ভাগবত ছাড়া) এরূপ অপূর্ব্ব গ্রন্থ আর লেখা হয় নাই। চৈতন্য প্রভু বর্ণাশ্রম মান্‌তেন; হরিদাস যবন, সুতরাং পুরীর মন্দিরে যেতেন না, বামুনেরা যে পথে হাঁটে, সে পথ ছেড়ে তিনি বিপথে তপ্ত বালুতে আঙ্গুল পুড়ে মহাপ্রভুর দর্শনার্থ আস্‌তেন,—এতে মহাপ্রভু বড়ই তুষ্ট হয়েছিলেন। "এখনকার মূর্খেরা বলে তিনি, বর্ণাশ্রম মান্‌তেন না, কিন্তু গয়া যাত্রার পরে তাঁর যখন জ্বর হয়েছিল, তখন তিনি ব্রাহ্মণের পাদোদক ভক্তি পূর্ব্বক পান করে আরাম হয়ে গেছিলেন।" তারপর গোসাইজি কবি গোবিন্দ দাসের কথা পাড়লেন, "তিনি বুধরী গ্রাম থেকে বৃন্দাবনে পদগুলি পাঠিয়ে দিতেন—সে এক মস্তবড় পণ্ডিতের কাছে—আহা! তাঁর নামটি মনে পড়্‌ছে আবার পড়্‌ছেও না," এই বলে টিকি নাড়া দিয়ে ঘাড় চুল্‌কোতে লাগ্‌লেন। সেই পণ্ডিতের নাম স্মরণ করার চেষ্টায় তাঁর ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়ে ভাবুকতাকে সত্যি যেন এঁকে দেখাল। কিছুক্ষণ তাঁকে চেষ্টা কর্‌তে দিয়ে শেষে বাবাজি বল্লেন…"সে পণ্ডিতের নাম কি জীব গোস্বামী নয়?" "হ্যাঁহে আপনি ঠিক ধরেছেন! জীব গোস্বামী! জীব গোস্বামী! মনে আর কত ধর্‌বে, সব বৈষ্ণব শাস্ত্র মনের মধ্যে আট্‌কে রেখেছি—দুএকটা স্মৃতির ভ্রংস হতেও পারে! কি বলহে রামহরি বসাক? সে বল্লে "তাত ঠিকই গোসাইজি! মুনিদেরই ভুল হয়ে যায়, দেবতাদের ভুল হয়ে যায়!" গোসাইজি আরও কত কি বক্তৃতা কর্‌তে লাগ্‌লেন। যদুনন্দন দাসের কর্ণানন্দের কথা উঠ্‌ল, তিনি ঐ বইখানি শ্রীনিবাস আচার্য্যের কন্যার নামে উৎসর্গ করেছেন,—"হ্যা ঐ দেখ সে মেয়েটির নাম ভুলে যাচ্ছি।" বাবাজি বল্লেন 'হেমলতা' "বাবাজিরও ত বেশ দখল আছে!" এই বলে রেমো গোসাই বাবাজিকে প্রশংসা কর্‌লে তিনি বল্লেন, "এই দুই ঘণ্টা কাল

আপনি অমৃত-তুল্য বিষয়গুলি বর্ণনা করেছেন। আপনি বৈষ্ণব শাস্ত্রের রাজা, আপনাকে আর আমি কি বল্‌ব! এই সকল কথা বল্‌তে আপনার উৎসাহ কি বিপুল! আপনার এ সম্বন্ধে যেন কিছুমাত্র ক্লান্তি নেই। ভগবান তাঁর কথা বল্‌তে আমায় এখন উদ্দীপনা কবে দেবেন?"

এতগুলি লোকের সাম্‌নে এইরূপ ভাবে বাবাজি কর্তৃক অভিনন্দিত হ'য়ে রেমো গোঁসাইয়ের দন্ত-পংক্তি আর কিছুতেই ঠোঁটের আড়ালে থাক্‌তে পার্‌ল না, তারা বের হয়েই রইল।

খাওয়া দাওয়ার পর নিজ বাসা-বাড়ীতে ফিরে এসে গোসাই শিষ্য-সেবকদের নিকট বল্লেন—"যদি প্রকৃত সাধু ব্যক্তি কেউ থাকে, তবে কানাই বাবাজি। শাস্ত্র ব্যাখ্যাতে যদি কোন সুখ থাকে, তবে এমনই সমজদারের কাছে ব্যাখ্যা করে প্রকৃত আনন্দ হয়। দেখ্‌লে ত আমার কথাগুলি কেমন ভক্তির সহিত গদগদ ভাবে বাবাজি শুন্‌লেন! এঁর প্রকৃতই শাস্ত্রের অর্থবোধ আছে, তা না হলে কি এমন মনোযোগের সঙ্গে কেউ শুন্‌তে পারে।"

রামহরি তন্তুবায় বল্লে—"ত একবার বাবাজির চোখে জল এসেছিল"। কৃষ্ণপদ ফুলটি একবার একবার বাবাজি বুকে চেপে ধরে ছিলেন, তখন প্রকৃতই চোখের কোণে জল দেখা দিয়েছিল। তন্তুবায় সেই জল দেখে মনে করেছিল, গোসাইজির শাস্ত্র ব্যাখ্যা ভেতরে ভেতরে বাবাজিকে কাঁদিয়ে ছেড়েছে। অমনই লাফ মেরে গোসাই গালিচা হতে একহাত উঁচুতে উঠে তন্তুবায়কে বল্লেন, "সত্যিই চোখে জল দেখেছিলে?"

রামহরি হাত যোড় করে বল্লে "আপনার কাছে কি মিথ্যা বল্‌তে পারি? হয় নয় পরাণ মণ্ডলকে জিজ্ঞাসা করুন।" পরাণ মণ্ডল বল্লে "বুকে হাত চেপে বাবাজি সত্যই আপনার ব্যাখ্যা শুনে কাঁদছিলেন।"

রেস্তো গোসাইয়ের লম্বোদরটা এমনই ভাবে ঢুলতে লাগল, যেন মনে হ'ল তিনি এই কথা শুনে আনন্দে নাচ্‌বার উদ্যোগ কচ্ছেন।

তিনি বল্লেন—"মনে কর'না আমি তাঁকে বোকা বুঝিয়েছি। সব শাস্ত্র জানেন, দুটি জায়গায় আমার কথাগুলি মনে আসছিল না—তা বাতলিয়ে দিলেন।"

গোসাই মনে কল্লেন—তাঁর এতবড় পাণ্ডিত্যের কথাটা বাবাজি অবশ্যই কিশোর রায়ের কাছে তুল্‌বেন। কিন্তু জোগাড় ঠিক চালাতে হবে। রোজ রোজ যাওয়া চাই। "আমার উপর তাঁর ভক্তি জন্মেছে—কিন্তু এই ভক্তিকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হবে। ক্রমশঃ এই ভক্তি বড় করে তুল্‌তে হবে—কিশোর রায় রোজই যদি বাবাজির মুখে আমার গুণকীর্তন শোনেন, তা' হলে একদিন হয়ত আমারই এ আশ্রমে এসে উপস্থিত হবেন।"

এই সংকল্প স্থির ক'রে গোসাইজি রোজ সাধুবাবার সঙ্গে দুএক ঘণ্টা কাটিয়ে আসেন। বাবাজির সেই একই ভাব! বৈশম্পায়ন বক্তা, জন্মেজয় শ্রোতা। গোসাইজি শাস্ত্রের যত অদ্ভুত কথা সকলই বিশ্বাস ক'রে উত্তেজিত ভাবে ব্যাখ্যা আওড়াইয়া যাচ্ছেন, বাবাজি অতিশয় মনোযোগের সঙ্গে সেগুলি শুনছেন, এবং বিদায় হওয়ার সময় গোসাইজির পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করে প্রণাম কচ্ছেন।

---

(১১)

উভয়ের মধ্যে রোজই প্রায় এরূপ দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে। রেমো গোঁসাই ভাব্‌ছেন,—তাঁর এতবড় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে বাবাজি আর চুপ করে রন নাই, অবশ্য কিশোর রায়কে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু তিনি জোগাড় ছাড়্‌চেন না, এজন্য যাতায়াতটা পূর্ব্বের মতই চলেছে। এই ভাবে সাতদিন অতীত হ'লে গোঁসাইজির মনে একটা ধোকা এল। বাবাজি কি রকমের লোক? তিনি নিজে তো তাঁর পাণ্ডিত্যের ভাণ্ডার এই সাতদিন ব'কে ব'কে প্রায় ফুরিয়ে ফেলেছেন, তা ছাড়া কোন্ সভায় তিনি ৪ ঘণ্টাকাল অনর্গল বক্তৃতা ক'রে শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত করেছিলেন, তাঁর এক বক্তৃতা শুনে ত্রিপুরার মহারাজ তাঁকে সভা-পণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন, শিষ্য-সেবকেরা তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে মনে করে—এইভাবে নিজের বিপুল দম্ভ শাস্ত্র ব্যাখ্যার মধ্যে মধ্যে প্রকাশ ক'রে বাবাজিকে তাক্ লাগাবার চেষ্টা পেয়েছেন। কিন্তু সাধুবাবা তো নিজের কথা একটিবারও বলেন নাই! রাজাবাবু যে তাঁর কুঁড়ে ঘরে এসেছেন—সে কথাটি পর্য্যন্ত তিনি মুখ দিয়ে বার করেন নাই। গোঁসাইজির বাড়ীতে এরূপ ব্যাপার হ'লে তিনি ত একমাস পর্য্যন্ত নিজের জয়-ডঙ্কা নিজে বাজাতেন—পরের বলবার অবকাশ দিতেন না! সাধুবাবার যশঃ তো সকলেই কীর্ত্তন করে, কিন্তু তাঁকে প্রশংসা করলে তিনি অতিশয় লজ্জিত হন, সে কথা বন্ধ করবার জন্য অপর কথা পাড়েন। আর সাধু বাবা যে শাস্ত্র খুব ভাল জানেন—তা গোঁসাই মনে মনে বুঝেছেন—যেখানে ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তিনি ভুল করেন, বাবাজি বিনীতভাবে সেটি বলে দেন।

কিছুকাল দেরী করেন, গোঁসাই সে কথাটা নিজে নিজে স্মরণ ক'রে বল্‌তে পারেন, কিনা তার প্রতীক্ষায়। যেন অপরে বলে দিলে তাঁর অভিমানে পাছে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায়। শেষে যখন গোঁসাই একেবারেই মনে করতে পারেন না, তখন অতি নম্রভাবে শিষ্যের মত মৃদুস্বরে সেটি বলে দেন। সেদিনও বীর হাম্বিরের পদে যে তাঁর বৈষ্ণব নামটি আছে তা গোঁসাই ভুলে গেছ্‌লেন, বাবাজি "হরিচরণ দাস" নামটি বিনীত-ভাবে বলে দিলেন। এতদিন ধরে তো তিনি নিজে কত দাম্ভিকতা করেছেন—কিন্তু বাবাজি দিনরাত্রি যেন একটা ভাবের মধ্যে বিভোর হয়ে আছেন, কৃষ্ণনাম শুন্‌লে এক একবার চোখ্ দুটি সজল হয়, 'কৃষ্ণ' বল্‌তে যেন উন্মনা হন; তাঁর সঙ্গে সাধুবাবার কত তফাৎ! এ পর্য্যন্ত গোঁসাই নিজের পথে চলেছিলেন,হঠাৎ একি এক নূতন ধরণের লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল, গোঁসাই নিজের কথাই দিনরাত ভাবেন—কিন্তু এবার জোর করে যেন বাবাজি তাঁর মনের ভেতর ঢুক্‌ছেন—বাবাজির নীরবতা, বিনয় ও ভক্তি যেন কথা না ক'য়ে আত্ম প্রকাশ করছে। গোঁসাই এখন বাবাজির কাছে গিয়ে—নিজের দর্প জাহির কর্‌তে কেন জানি লজ্জা বোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন! বাবাজি যে তাঁর প্রতি মনোযোগের ত্রুটি দেখাচ্ছেন—তা নয়, কিন্তু তিনি বাবাজির শৈল-কঠিন গাম্ভীর্য্য এবং চরিত্রের বৈষ্ণবোচিত কোমলতার এরূপ আশ্চর্য্য প্রকাশ দেখ্‌তে পেয়েছেন, যে তাঁর নিজের কথাগুলি নিজের নিকটেই বৃথা বাগাড়ম্বর বলে মনে হতে লাগল। রেমো গোঁসাই এখন আর তত বক্তৃতা করতে উৎসাহ বোধ করেন না, বাবাজির কাছে যেতে তাঁর ভাল লাগে—কিন্তু কিশোর রায়ের কাছে প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় প্রত্যাশাটা মনের ভেতর কমে যেতে লাগ্‌ল। তিনি বাবাজির মুখের দুএকটি কথা শুনে নিজের বহু কথাগুলি যে কত অসার, তা বুঝ্‌তে লাগ্‌লেন।

একবার ভাব্‌লেন, "ও কিছু নয়, আমার মনে একটা দুর্ব্বলতা এসে পড়েছে। বাবাজি আমার মত শাস্ত্র ব্যাখ্যা করুন তো? শক্তি থাক্‌লেই প্রকাশ হোত, আমার মত ক্ষমতা ওঁর হ'তেই পারে না—তা' হলে আমাকেই বা এত প্রশংসা কর্‌বেন কেন?"

এই ভেবে তিনি বাবাজির থেকে অনেক বড়, এই স্থির ক'রে তাঁর কাছে যান, কিন্তু সোয়াস্তি পান না। বাবাজি হয়ত কোন দিন একটা কৃষ্ণচূড়ার ফুল হাতে নিয়ে বল্লেন, "গোসাইজি, চূড়ো তো দেখ্‌লেম, যাঁর চূড়ো তাঁকে কোথায় পাব?" এই বল্‌তে কণ্ঠ গদ্‌গদ্‌ হয়ে এল, মুখখানি শিশুর মত সরল ও কাঁদ কাঁদ দেখাতে লাগ্‌ল, তাঁর সেই দুটি কথা শুনেও শিশুর মত সরলতা দেখে গোঁসাইজির মনে হ'ল তাঁকে প্রণাম করতে—অদ্বৈত বংশের দর্প সে ভাবটি ঠেকিয়ে রাখ্‌ল। কিন্তু তিনি বুঝ্‌তে পার্‌লেন, যে তাঁর শত শত বক্তৃতার চাইতে বাবাজির ঐরূপ দুটি কথার ইঙ্গিত প্রাণ বেশী স্পর্শ করে, সুতরাং আর কয়েকদিন পরে তার লম্বা বক্তৃতাগুলির আয়তন আপনা আপনি খুব খাটো হয়ে এল। গোঁসাইজি ক্রমশঃ সাধুর প্রভাব বেশী করে অনুভব করতে লাগ্‌লেন। তাঁর ভক্তি, তাঁর বিনয়—এই সকল তিনি রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবেন—নিজের কথা আর রাত-দিন চিন্তা করেন না।

এই ভাবে ক্রমশঃ যাহা হয়, তাই হ'ল। গোঁসাইজি এক মাস না যেতে যেতে সাধুর একরকম শিষ্য হয়ে পড়্‌লেন! তাঁর পড়াশুনা ছিল। দর্প ভিন্ন চরিত্রের অন্য কোন দোষ ছিল না,—এবার দর্পটি নষ্ট হ'তে চল্ল এবং ভক্তি এসে দখল পাবার আশায় মনের এদিকে ওদিকে উঁকি মার্‌তে লাগ্‌ল।

বাবাজি একদিন একটা গান কল্লেন, সে একটি কীর্ত্তন গান।

গোসাই ভাব্‌লেন, আমি এতদিন নিজের অসার কথায় এত বিভোর ছিলাম, সাধুবাবাজির যে এই অপূর্ব্ব গানের শক্তি আছে, তা' আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল—একদিন ও ওঁকে গান কর্‌তে বলি নাই।

সাধুবাবা গাইলেন—

"আমার ধৈর্য্যশালা হেমাগার, গুরুগৌরব সিংহদ্বার
ধরম-কপাট ছিল তায়।
বংশীরব বজ্রাঘাত, পড়ে গেল অকস্মাৎ
সনভূম কর্‌ল আমায়।
আমার দম্ভশালে মত্ত হাতি, বাঁধা ছিল দিবা রাতি
ক্ষিপ্ত কৈল কটাক্ষ অঙ্কুশে,
দম্ভের শিকল কাটি, আবেশে লুকাল ছুট
পালাইয়া গেল কোন্ দেশে।

বাবাজির মুখের এই গান শুনে—গোসাইয়ের মনে এক যুগান্তর উপস্থিত হ'ল। গুরু-গৌরব, ধর্ম্মের দর্প, প্রভৃতি সাংসারিক ভাবে পূর্ণ মন যেদিন বংশীরব প্রথম শুন্‌ল, সেদিন যেন সংস্কার-ধর্ম্মের উপর বজ্রাঘাত হ'ল।

তাঁর মধুর আহ্বান শুন্‌লে—রাজার কাছে রাজপুরীর সিংহদ্বার তুচ্ছ হয়ে যায়। বংশীরব একদিকে মধুর, আর একদিকে উগ্র বজ্র। দম্ভে পরিপূর্ণ মনে তো নিজের কথাই বড় কথা ছিল—তিনি যে দিন ডাক্‌লেন, সেদিন দম্ভ কোথায় চলে গেল! তাঁর চোখের ইঙ্গিতে মন বিনয়ে পূর্ণ হ'ল—দম্ভ-অহঙ্কার কোথায় থাক্‌বে?

এ গান তো তাঁর সঙ্গে বাবাজির পার্থক্যটি স্পষ্ট করে দেখাচ্ছে, গোসাই মূর্ত্তিমান দম্ভ, প্রতিষ্ঠালোভী,—আর বাবাজি অহংজ্ঞান শূন্য মূর্ত্তিমান বিনয় ও প্রেম।

এই গানটি সারা রাত্রি ভরে ভেবে গোঁসাইজি নিজের দোষগুলি আবিষ্কার করে লজ্জিত হলেন—যে জিহ্বা অফুরান কথার উৎস, সে কথার উৎস শুকিয়ে গেল। গোঁসাই এখন যান্, বাবাজির মুখের কথা শুনতে, তিনি নিজের কথা একটিও বলেন না।

একদিন বাবাজি বল্লেন্, "চৈতন্য ভাগবৎ ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তকের ধারা এদেশে বহুদিন হতে চলে এসেছে, 'ললিত বিস্তর' ও তীর্থঙ্করদের জীবনী, এমনকি শঙ্কর-দিগ্বিজয় প্রভৃতির আদর্শে এই বইগুলি লেখা।"

গোঁসাইজি বল্লেন—"শুনেছি ললিতবিস্তর পালীতে লেখা। পালী কি বৈষ্ণবেরা জান্তেন।"

"কেন গৌর-পদ-তরঙ্গিনীর ৬৬ পৃষ্ঠায় ১৪ গানটি পড়ুন, নরহরি সরকারের গান। নরহরি সরকার মহাপ্রভু হতে ৪০।৪৫ বছরের বড় ছিলেন, তিনি ঐ গানে লিখেছিলেন চৈতন্যদেব পালীতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হয়ে ছিলেন। সুতরাং সে সময়ে পালী টোলে প্রচলিত ছিল।" তার পর অল্পকথায় অনেক প্রসঙ্গেরই আলোচনা করলেন। একদিন বল্লেন, "মহাপ্রভু গোপীনাথ জীউর সঙ্গে মিশে গেছেন—এপ্রবাদ লৌকিক। এর ঐতিহাসিক মূল্য কি? জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায়, মহাপ্রভু রথের দিন নাচ্তে নাচ্তে উছট্ খেয়ে প'ড়ে পায়ে ব্যথা পেয়েছিলেন, তাতে তাঁর জ্বর হয়, সেই জ্বরই তাঁর তিরোধানের কারণ। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে দেখা যায়, তিরোধানের পর মহাপ্রভুকে জগন্নাথের মন্দিরে খিল দিয়ে রাখা হয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে ভক্তদের ঢুকতে দেওয়া হয় নি। আমার মনে হয়, জগন্নাথ মন্দিরের পাথরের নীচে তাঁকে সমাহিত করা হয়েছিল - অন্য জয়ানন্দের বর্ণনা ও লোচনদাসের লেখায় তিরোধানের সময়ের একটু পার্থক্য আছে,

একজনে বলেছেন অপরাহ্নে তিনি স্বর্গারোহণ করেন, অপর জনে ব'ল্‌ছেন, রাত্রি সাত দণ্ডে। খিল দেওয়ার সময় ও খিল খোলার সময় লইয়া এই পার্থক্য। আমার মনে হয় অপরাহ্নই ঠিক, কারণ তিরোধান হওয়ার পর খিল দেওয়া হয়েছিল। তারিখ, সন প্রভৃতি সকল মতেই একরূপ। মহাপ্রভুর বর্ণাশ্রম মানা সম্বন্ধে বাবাজি বল্লেন, "যিনি সাক্ষাৎ ভগবানের পূর্ণ প্রেম জগতে—আচণ্ডাল সকলের নিকট—বিতরণ করেছেন, তাঁর কাছে আবার জাতিভেদ কি? তিনি ব্রাহ্মণের পাদোদক খেয়েছিলেন, সে কেবল বিনয়। এই বিনয় ও দাস্য দেখাতে তিনি গঙ্গাতীরে সকলের ফুলের সাজি মাথায় বহন করে নিয়েছেন; পরের ময়লা কাপড় নিজ শ্রীহস্তে নিঙড়িয়ে দিয়েছেন। হরিদাস তপ্ত বালুর পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন—ইহাতে তিনি তাঁর বিনয়েরই প্রসংসা করেছিলেন। তিনি সেখানে স্পষ্ট ক'রে বলেছিলেন যে "তোমার ভক্তি ও প্রেম এতবড়, যে দেবতারা ও তোমাকে স্পর্শ করলে পবিত্র হন।" একি আর জাতিভেদের সমর্থন? তিনি হরিদাসকে শ্রাদ্ধের আসরে বামুন পণ্ডিতের মত বিদায় দেওয়াতেন। সপ্ত গ্রামের কায়স্থ কালিদাস যখন নমশূদ্রের এঁটো খেয়েছিলেন, তখন তিনি তা শুনে প্রশংসা করেছিলেন। চৈতন্য ভাগবতের এই উক্তি অবশ্যই জানেন "প্রভু কহে যে জন ডোমের অন্ন খায়! হরিভক্তি হরি সেই পায় সর্ব্বথায়।" ডোমকে লোকে এত ঘৃণা ক'রে থাকে, যে এই ঘৃণা জয় না করলে কৃষ্ণ-প্রেম হতেই পারে না।

শ্রীগোবিন্দ সম্বন্ধে বল্লেন,—"আমার বিশ্বাস গোবিন্দ কর্ম্মকারই, এই শ্রীগোবিন্দ। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে দেখা যায় ইনি মহাপ্রভুর সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে গেছলেন, কবি বলরামদাস ও সেই কথা লিখেছেন। গৌর পদতরঙ্গিনীর, ৪০৪ পৃষ্ঠায় আছে। ইহার কার্য্যাবলি ও শ্রীগোবিন্দের সেবা মিলিয়ে পড়লে দেখতে পাবেন—ইহারা একই ব্যক্তি। গোবিন্দ, কর্ম্ম-

কারের আত্মগোপন কর্‌বার যে কত দরকার ছিল, তা কাঞ্চণ-নগরে মহাপ্রভুর সহিত শশীমুখীর আলাপ ও তাঁর স্বামীকে ধ'রে রাখ্‌বার চেষ্টা হ'তেই বোঝা যায়। ঈশ্বরপুরী কেন হঠাৎ একজন শূদ্র চাকরকে পাঠিয়ে দেবেন ? এই ছদ্মবেশ গ্রহণ না করলে গোবিন্দ কিছুতেই পুরীতে টিক্‌তে পারতেন না। তাঁকে পুনরায় কাঞ্চণ-নগরে আস্‌তে হত।

দুইএকটি কথায় বাবাজি গোঁসাইকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনেক সূক্ষ্মকথা বুঝিয়ে দিলেন। গোঁসাই বিনীত ভাবে বল্লেন, "প্রথম দুই একদিন তো আমি এই সকল বিষয়ে কতক'গুলি ভ্রান্ত ধারনা স্পর্দ্ধা ক'রে বলেছিলেম, তখন সাধুবাবা আমায় প্রশংসা করেছিলেন।"

বাবাজি……"করেছিলেম বই কি ? আপনার শিষ্যেরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের কাছে আমার ক্ষুদ্র বিদ্যা দেখিয়ে আমি আপনাকে ছোট করে দেব ! তার পর যে আমার কথাই ঠিক, তার নিশ্চয়তা কি ? ধর্ম্ম সম্বন্ধে অকপটে প্রাণের ব্যাকুলতায় যে যাহা বিশ্বাস করে তাতে তার উপকার হয়, সুতরাং আপনার মত প্রকাশ্য ভাবে অগ্রাহ্য করা উচিত মনে করি নি – তা'হলে'আপনি মনে আঘাত পেতেন, আমার একটা স্পর্দ্ধা জন্মিতো। তা' করতে নাই, কারুর মনে আঘাত দিতে নাই, স্পর্দ্ধা করে কারু মত খণ্ডন করতে নাই। আমি আপনার প্রবল উদ্দীপনা ও বিশ্বাসের প্রশংসা করেছি, তা' অকপটে করেছি, এখনও ক'রে থাকি—সুতরাং প্রশংসা করে ছলনা করি নাই।"

বাবাজি এই ব'লে হাস্‌তে লাগলেন, এবং শেষে আবার বল্লেন, "ঐতিহাসিক বিষয়ের মতভেদ থাক্‌তে পারে হয়ত আমি যা'বুঝালেম, সবই ভুল ; কিন্তু তাই বলে ভক্তি-শ্রদ্ধার মূল্য একটা আছে। এই দেখুন না গোসাই ! মানুষ মানুষকে কত ভালবাসে, কিন্তু দুইজন প্রণয়ীর উভয়েই জানে তাদের ভিতরে শুধু কঙ্কাল, মজ্জাও বশা, তবুও একের লাবণ্যে অপরে

মুগ্ধ হয়। প্রকৃত প্রেম-ভক্তি যেখানে, সেখানে ইতিহাসের কোন কথাই বকোয় না। ইতিহাস যা বলবে তা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা, সেটা প্রেমের গজকাটি নয়। আপনি কি বুঝেছেন—সেটা আমার তত ভাববার বিষয় নয়, আপনি কতটা বিশ্বাস করেন, কতটা ভক্তি করেন—সেইটে লক্ষ্য কর্‌বার জিনিষ, কারণ তাতে আপনার চরিত্র টের পাওয়া যায়।"

গোঁসাইজি বাসায় ফির্‌বার সময় সেদিন ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, যদি বাবাজি প্রথমদিনই তাঁর প্রতিবাদ কর্‌তেন, তবে তিনি কিছুতেই তা সহ্য করতেন না, বরং শিষ্য-মণ্ডলীর কাছে নিজের অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠা বজায় রাখ্‌বার জন্য তিনি আরও বেশী অহমিকার বশবর্ত্তী হয়ে স্পর্দ্ধার আশ্রয় নিতেন। তার চাইতে সাধুবাবা আগে নিঃশব্দে তাঁর হৃদয়টি দখল ক'রে নিয়ে তার পর তাঁর নিজের শক্তি বলে সেটি উন্নত করতে কত বেশী সুযোগ ক'রে নিয়েছেন! এই জন্যই মহাপ্রভু নারোজি দস্যুর কণ্ঠ-লগ্ন হ'য়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে "তুমিত প্রধান ভক্ত" এই কথা বলেছিলেন। যে দস্যু, সে যখন দেখ্‌লে, সাধু সরলভাবে তাকে ভক্ত বলে প্রেমালিঙ্গন দিচ্ছেন, তখন তার মন পাষাণের মত কঠিন হলেও একবারে গলে যেতে আট্‌কায় নাই।

---

(১২)

এদিকে হৃদয়েশ একদিন দেবেশকে ডেকে পাঠিয়ে বৈঠকখানায় বসালেন, তারপরে বল্লেন—"ভাই, রাজনারায়ণ আমাকে তোমার একটা উপকার করতে বলেছিল। সে বেচারী নেহাত ভাল মানুষ, তোমার কষ্ট দেখ্‌লেই আমাকে এসে উত্যক্ত করে এবং বলে "ছোটবাবুর দুঃখ আপনার দূর করতেই হবে।" লোকটা হৃদয়বান, সে বলছে আমায় "নব বৃন্দাবনটা" কিনে নিতে। তোমার দু পয়সা হয়। আমি আর বাপু বাগানটা দিয়ে কি করব? আমার ত নিজেরই শত শত বাগান পড়ে আছে। জমিদারীটা নিজে দেখ্‌তে শুনতে হয়, আমার কি আর খেয়াল চালাবার অবকাশ আছে? তবে তোমার উপকার যাতে হয়, সেরূপ প্রস্তাব তো আমি একবারে অগ্রাহ্য কর্‌তে পার্‌ছি না। এই জন্য তোমাকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করা, কিন্তু দর যদি বেশী বল, তবে আমার সুবিধে হবে না।"

দেবেশ বল্লেন, "কই আমি তো তাঁকে আপনার কাছে এমন কোন প্রস্তাব আন্‌তে অনুরোধ করি নাই! তিনি নিজেই বলেছিলেন বটে, কিন্তু আমি তো বাগান বেচ্‌ব না—এই কথাই তাঁকে বলে দিয়েছি। তারপর আবার আপনার কাছে এ প্রস্তাব করেছেন কেন, বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।"

হৃদয়েশ..."তিনি তোমার হিতৈষী, হিতাকাঙ্ক্ষায়ই ঐরূপ বলেছিলেন, এবং আমিও তোমার দুঃখ মোচন করবার জন্যই তাঁর প্রস্তাবে কতকটা রাজি হয়েছি—এর মধ্যে অন্য কোন ভাব নাই। ভেবে দেখ, তোমার

যদি মত থাকে তবে আমি দরের কথা বল্‌তে পারি! তোমার বৌ-দিদি বল্‌ছিলেন, "অপর যায়গায় যা পাবে, তার চেয়ে কিছু বেশী দিয়ে বাগানটা রাখ্‌তে। কারণ এই উপলক্ষে তোমাকে কিছু সাহায্য করা হলেও কোন লোক্‌সান নাই, তুমি এক মায়ের পেটের ভাই বট তো? তবে দরটা যদি নিতান্ত বেশী বল, তবে পেরে উঠ্‌ব না।"

আট বিঘা জমির দর সেখানে ৫।৬ হাজার টাকা। তবে অবশ্য আভের ছবির প্রাচীর ও ফুল, পল্লব এবং ছবিতে সজ্জিত এমন সুন্দর বাগানটি কেউ খেয়ালের উপর ১০।১২ হাজার টাকাও দিতে পারে, এর বেশী কিছুতেই নয়। হৃদয়েশবাবু তাঁর ভ্রাতার মুখটি একবার বন্ধ ক'রে মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে দেবার মতলবে উত্তর দেবার পূর্ব্বেই বলে ফেল্লেন, "যাক্ আমি ১০০০০ টাকা তোমায় দেব ভাই! এত দর কেউ দেবে না, তুমি মায়ের পেটের ভাই বলে—তোমাকে সাহায্য করার আশায় এই দর বল্লুম, তুমি আমার স্নেহ-প্রবণতা এতে ক'রে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ।"

অবশ্য এত দর বে' পাড়াগাঁয়ে কেউ দেবে না এ কথা ঠিক, কিন্তু ঐ বাগান দেখিয়ে দেবেশ বছরে প্রায় হাজার টাকা অর্জ্জন করেন, অপর কেউ কিন্‌লে এ আয়টা থাক্‌বে কিনা সন্দেহ। চট্ করে হৃদয়েশের মাথায় এই কথাটা এল, কিন্তু তিনি ভাব্‌লেন, "বাগানটা হাতে যেদিন পাব, তার পরদিনই বাড়ীতে এক বিগ্রহ স্থাপন করে, বাগানটায় আরও টাকা ঢেলে আয় বাড়িয়ে ফেল্‌ব।"

দেবেশ এবার দৃঢ় ও পরিষ্কার সুরে বল্লেন, "দাদা এ বাগান আমি বিক্রয় কর্‌ব না—আমার কণ্ঠে যতদিন প্রাণ ততদিন নয়। 'রাধা-মাধব' তোমারও পৈতৃক ভিটায় চিরকালের বিগ্রহ, তার তাঁদের আমার উপর। আমি উপোশ করে স্ত্রীপুত্র সহ মরি, কিম্বা যে কষ্টই পাই না

কেন—"নববৃন্দাবন", রাধামাধব ও শ্যামলেশ এই তিন আমার নিকট একরূপ—এদের মায়া আমার কিছুতেই যাবে না। এদের নিয়েই আমার সংসার, জান্‌বে। তুমি লক্ষ টাকা দিলেও এ বাগান পাবে না, তোমার কর্ম্মচারী রাজনারায়ণ যত ফন্দীই করুক না কেন এ সকলই পণ্ডশ্রম। আমি তোমার খাই না, দাই না, স্ত্রী পুত্র ও মন্দির-বাগান নিয়ে ভগবানের নাম ক'রে বেড়াই, আমি কারো দয়ার প্রত্যাশী নই—তুমি এ সম্বন্ধে আর কিছু ব'ল না, এতে আমি মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাই।"

হৃদয়েশ উত্তেজিত-ভাবে বল্লেন, "তোর মনটা অতি ছোট। অবস্থা খারাপ হ'লে মনের উদারতা থাকে না, রাজনারায়ণ তোর মঙ্গলের জন্য চেষ্টা কর্‌ছে, আমি তোর উপকার কর্‌তে ইচ্ছুক, তাই আমাদের শত্রু জ্ঞান কর্‌লি? এতে কি তোর ভাল হবে?"

দেবেশের দুই চক্ষু জলে পূর্ণ হ'ল, সে বল্লে "দাদা আর না, যথেষ্ঠ হয়েছে, পায়ের ধূলো দাও, আমি বিদায় হই, এ সম্বন্ধে আর বেশী কথার দরকার নাই।"

দেবেশ চলে গেল। তার কিছুক্ষণ পরে, হৃদয়েশের দেওয়া পুরাতন শালযোড়া ও শ্যামলেশের উপহার ধুতি, চাদর, পাম্পসু ও জামা—দেবেশ একটী লোক মারফৎ ফিরিয়ে দিল। একটুখানি কাগজে লিখে পাঠাল, "আমরা কেউ এগুলি এখন পর্য্যন্ত ব্যবহার করি নি।" হৃদয়েশ তাঁর পত্নীর দিকে চেয়ে বল্লেন, "দেখ্‌ছ ছোড়ার কি স্পর্দ্ধা!" পত্নী চিবুকে হাত দিয়ে খানিক্ষণ অবাক্ হয়ে রইলেন।

এই ঘটনার দুদিন পরে কানাই বাবাজি দেবেশকে নিভৃতে বল্লেন দেবেশ তুমি "নববৃন্দাবনটা তোমার ভাইএর নিকট বিক্রী কর, কিছু টাকা পাবে ও মনটা ও অনেক শান্তিতে থাক্‌বে।"

সহসা মাথায় কামানের গোলা পড়্‌লেও দেবেশ এতটা চমৎকৃত হতেন না। তিনি বাবাজির দিকে বিস্ময়যুক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বল্লেন, "বাবাজি, আপনিও এইরূপ কথা বল্‌ছেন? আর কেউ জানুক আর নাই জানুক, আপনি তো জানেন "নববৃন্দাবন" আমার প্রাণ! রাধামাধবকে দেওয়া আমার এই কষ্টের, জীবনান্তক শ্রমের বাগান—এই অপূর্ব্ব বাগান আমি দাদাকে দেব, আপনার মুখে আমি এই উপদেশ প্রত্যাশা করি নাই।"

বাবাজি ধীর স্বরে বল্লেন,—"এই বাগানের উপর হৃদয়বাবু ও তাঁর স্ত্রীর রোখ্ পড়েছে, তাঁরা হচ্ছেন বৈষয়িক লোক। তুমি যদি বৈষয়িক লোক হও, একই ধাতের লোক হও, তথাপি তোমার অবস্থা ও তাদের অবস্থায় অনেক তফাৎ। তাঁরা অজস্র অর্থ ব্যয় ক'রে তোমার অনিষ্ট চেষ্টা করলে তা' তোমার ঠেকিয়ে রাখা মুস্কিল হবে। আর যদি তুমি ভগবানের ফকির হও, তবে তোমার এই আট বিঘা জমির মায়া কেটে ওঠা মন্দ নয়। কারণ বাড়াবাড়ি রকম আসক্তি ভাল নয়।"

উত্তেজিত-চিত্ত দেবেশ এই কথার অর্থ ভাল করে বুঝ্‌তে পার্‌ল না। সে কেবল বল্লে, "উঃ আপনিও রাজনারায়ণের দলের—এ যে মর্ম্মবিদারী কথা!" এই ব'লে আর মুহূর্ত্তকাল সেখানে না থেকে, হাত দিয়ে বুক চেপে ধ'রে বাড়ী ফিরে বিছানায় পড়ে রইলেন। তুলসীদেবী বল্লেন, "কি? অসুখ করেছে?" চক্ষের জল কষ্টে নিরোধ ক'রে দেবেশ বল্লেন, "তুলসী দেখছ কি—সংসারে শত্রু মিত্র চেনা ভার! দাদাতো এই বাগানের জন্য আমার যতটা উদ্বেগ দেবার,দেবেন—সে কথা আমি তোমায় বলেছি, কিন্তু কানাই বাবাজির ভাবান্তর দেখে আমার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হয়েছে। লোক চিন্‌তে পারি নাই, তুলসী, অতটা স্বার্থত্যাগ কি একালের মানুষ অমনই অমনই করে থাকে?" দেবেশের চোখদুটি জলে পুরে এল। তুলসীদেবী অতি স্নেহে, অতি যত্নে আঁচল দিয়ে তা' মুছিয়ে দিলেন এবং বল্লেন,

"সে তোমার ভুল, কানাই বাবাজিকে সন্দেহ ক'র না। তিনি দেবতা, তাঁর বিরুদ্ধে কিছু মনে ভাবা পাপ!" দেবেশ এই কথায় বিরক্ত হলেন। সরলা তুলসীদেবী যে কানাইকে চিন্‌তে পারেন নি, এই কথাই তাঁর মনে হ'ল। তিনি তুলসী দেবীর সঙ্গে আর কথা বল্‌তে ইচ্ছা করলেন না। চোখ বুজে ঘুমের ভাণ ক'রে, পাশ-বালিসটা নিয়ে মোড় ফিরে স্ত্রীকে শুধু বল্লেন, "যাও শীতলভোগের চেষ্টা দেখ, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই"

কিন্তু ঘুমত এলনা। তার মনে হ'ল, সুরু হ'তে তাঁর, দাদা বাবাজিকে গোয়েন্দা ক'রে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন, বাগানটা হাত করবার জন্য। বাবাজির যত স্বার্থত্যাগ, যত ভালবাসা, তা' ছদ্মবেশমাত্র—তার খোরাক জোগাচ্ছে হৃদয়েশের উৎকোচ। এই ভাবটি মনে হ'তে তিনি হৃদয়ে উৎকট যন্ত্রণা বোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন। এই যন্ত্রণা অপ্রত্যাশিত, হঠাৎ উৎকটভাব হৃদয়ে ঢুকেছে। দেবেশ ছট্‌ফট্‌ করতে লাগলেন। স্ত্রীর কাছে যে সহানুভূতি পাবেন—তার লক্ষণ দেখ্‌তে পেলেন না, স্ত্রী বাবাজির 'সরলতায়' মুগ্ধ। ভাব্‌তে ভাব্‌তে প্রথম থেকে সব কথা তিনি তন্ন তন্ন ক'রে মনের ভিতর আলোচনা করতে লাগ্‌লেন। একদিন হৃদয়েশের ঝিলটার কথা বলাতে বাবাজি বিরক্তির সুরে বলেছিলেন—"পরের জিনিষে লোভ কর্‌তে নাই," এদিকে হৃদয়েশ যে তাঁর প্রাণ নিয়ে টান দিয়েছে, তার পক্ষ হয়ে 'নববৃন্দাবন' বিক্রয় করবার অনুকূলে ওকালতি কচ্ছেন—ছোট ছোট প্রত্যেক কথার এইরূপ বেঁকিয়ে অর্থ করে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এলেন—যেমন রাজনারায়ণ—তেমনই বাবাজি—দুই মিত্রভাবে হৃদয়েশের গোয়েন্দা। ভাব্‌তে ভাব্‌তে তার চোখে একটুও ঘুম এল না। চৈত্র মাস। শেষরাত্রে দোয়েল 'ও বউকথা কও' ডেকে উঠেছে, একডালে 'চোখ গেলরে' আর এক ডালে কোকিল যেন আড়াআড়ি ক'রে ডাকছে। সমস্ত গ্রামটি—তার একতল বাড়ী,

রাধামাধবের মন্দিরটি যেন সেই সুস্বরে কেঁপে উঠছে, যেন নারদ মন্দিরের কাছে বীণা বাজাচ্ছেন, যেন পদ্মাসনা বীণাপানি সমস্ত জগতে তাঁর সুর সুধা বিতরণ কচ্ছেন। এই সুরে রোজ রোজ দেবেশের প্রাণে ভক্তির উদয় হয়, তিনি মনে মনে রাধামাধবকে প্রণাম করেন. কিন্তু আজ একি উৎকট যন্ত্রণা! এ সমস্ত তার কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। প্রাতে তুলসীদেবী দেখ্‌লেন তাঁর স্বামীর সুন্দর মুখখানি ভাবনায় শুকিয়ে গিয়েছে। তিনি সজলচক্ষে স্বামীকে বল্লেন,—"তোমার জমি যাক্, শ্যামলেশও আমরা দু'জন আছি, রাধামাধব আছেন, আমরা ভিক্ষা ক'রে খাব, যতদিন আমাদের কারুর বিচ্ছেদ না হয়, ততদিন উপোস করে থাকলেও আমরা সুখী, তুমি কি ভাবছ?"

তুলসীর হৃদয় প্রেম-পরাবার, তাঁর মুখে চোখের ভাবে সেই প্রেমের যে আভা প্রতিফলিত হচ্চিল তা' দেবেশকে মুগ্ধ কর্‌লে। তখনই আর একখানি মুখ মনে পড়ল, সে মুখ ভক্তিতে চল চল—তপস্যা ও সংযমে পবিত্র, পরের দুঃখ সহানুভূতির খনি, তা' মনে হ'লে সংসার তুচ্ছ মনে হয়, হায়, বাবাজি, তুমি যে অবিশ্বাসী, তা' ভাবতেও বুকবিদীর্ণ হয়। তাঁর সহসা মনে হ'ল কিশোর রায়ের কথা। কিশোর রায় চক্ষের জল ফেলে তাঁকে এত কি বল্‌ছিলেন। তখন ভাবলেন, খুব ফন্দীবাজ লোক, হয়ত বাবাজি তাঁকে কোন বিপদে ফেলেছে; প্রথম মিত্রতা দেখিয়ে তারপর কি অনিষ্ট করেছে, কে জানে?

কানাই বাবাজির নিকট হৃদয়েশ গোপনে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর কাছে অনেক কান্নাকাটি করেন, এই বাগানটা না পেলে তাঁর ১০০ বিঘার পাছের জমিটা একবারে কাণা হয়ে প'ড়ে। নববৃন্দাবনটি হচ্চে মুখপাত। আর তাঁর স্ত্রী ওটির জন্য বড় ধরেছেন, বাড়ীতে টেকা দায়। বাবাজি বল্লেই দেবেশ স্বীকৃত হবে। কারণ সে তাঁকে গুরুর

চাইতেও ভক্তি করে। বাগানটি পেলে বাবাজির আশ্রম ঘেঁষে না হয় তিনি একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির ক'রে দেবেন। "শুনেছি আপনি নাকি রাধা-মাধবের সন্ধ্যার আরতি দেখতে দেবেশের বাড়ী পর্য্যন্ত যান। এখানে মন্দির হ'লে আপনার সুবিধেই হবে, আর পরের বাগানের জন্য আপনি এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি কেন খাটেন? বাগানটি আমার হ'য়ে গেলে আমি চার গণ্ডা মজুর ও তিন গণ্ডা মালী আপনাকে দেব। আপনি ব'সে ব'সে জপতপ কর্‌বেন, আর তারা খাটবে। আপনি মধ্যস্থ হ'য়ে যে দর ব'লে দেবেন, আমি তাই দেব।"

বাবাজি দৃঢ় ও বিরক্তিপূর্ণস্বরে বল্লেন,—"আপনি ত দেখ্‌ছি বড় লোভী ব্যক্তি! আপনার অনেক ঐশ্বর্য্য আছে শুনেছি, হাতীর দাঁতের খাটে শয়ন করেন ও ল্যাণ্ডো-মটর দৌড়িয়ে রাস্তায় বার হন,—বিস্তর জমিজমা তালুক আছে। আপনার ভাইটি নিজ হাতে মাটী কুপিয়ে, ভাঁড়ে ক'রে জল ব'য়ে এনে, আগাছা নিজ হাতে উপ্‌ড়ে ফেলে, নানা দিক্ দেশ হতে ফুল-লতা এনে এই বাগানটি করেছে। এর আয়ের এক কপর্দ্দকও সে নিজে ভোগ করে না,—সমস্তই রাধামাধবের সেবায় ব্যয় করে। আপনার এটি গ্রাস কর্‌বার ইচ্ছা হ'য়েছে, আপনার স্ত্রীর ও খেয়াল হ'য়েছে—সে খেয়াল আপনাকে পালন কর্‌তেই হবে। তা' আপনাদের সখের রথটা যদি ছোট ভাইটির বুকের হাড়ের উপর দিয়ে হাড় কয়খানা ভেঙ্গে চলে যায়, তবুও রথটা চালাতেই হবে। আমার জন্য রাধাকৃষ্ণের মন্দির উঠোতে হবে না, আমার রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের অপেক্ষা করেন না, আমার মনের ভিতর যদি মন্দির উঠোতে পারি, তবে ইট পাথরের মন্দিরের অভাবে আমার দুঃখ হবে না। যখন শরীর খাটিয়ে তাঁর সেবা করতে পারি, তখন মালী মজুর দিয়ে আমার কোন দরকার নাই। তুমি বাড়ী যাও, ছোট ভাইয়ের উপর এরূপ অবিচার করো না।

তোমার স্ত্রী কিছু বল্লে তাঁকে ব'ল, "সে আমার ছোট ভাই, আমি তার মনে কষ্ট দেব না।"

বাবাজি এই বলে নীরব হ'লেন। হৃদয়েশ খানিকটা মাথা হেঁট করে থেকে বল্লেন, "আচ্ছা বাবাজি, তুমি কেমন করে দেবার বাগানটা রাখ, তা আমি দেখে নেব, এটার জন্য যদি চারটা ফৌজদারী ও দশটা দেওয়ানী করতে হয়—আমি তা করতে প্রস্তুত হব।"

এই বলে বাবাজিকে একটা প্রণাম পর্য্যন্ত না করে, রোষ-দীপ্ত মুখে বিরক্ত হ'য়ে হৃদয়েশ বাবু চলে গেলেন। বাড়ী গিয়ে বিশে চাকরকে ডাক হাঁক্‌রালেন। সে রূপার কল্কীর উপর ফুঁ দিতে দিতে তামাক এনে হাজির। সোণার নল্‌টা টান্‌তে টান্‌তে হৃদয়েশ মনে মনে প্রতিশোধ দেওয়ার মতলব আঁটিতে লাগলেন। "২০০০০৲ টাকা বলেছিলেম, না হয় 'দাদা' বলে পায়ে ধ'রে আরও দুই এক হাজার চেয়ে নিত! সেই টাকা হ'লে ভদ্রলোকের মত থাক্‌তে পারত, স্ত্রী পুত্র নিয়ে দুই সন্ধ্যা খেয়ে বাঁচত—ছেলেটাকে মানুষ করবার উপায় হ'ত। আমি হলেম লোভী, আর ঐ ভণ্ড বাবাজি হচ্ছে ওর হিতৈষী। তা' ওর কপালে দুঃখ আছে, তা ঠেকিয়ে রাখ্‌বে কে?"

এদিকে বাবাজি বুঝ্‌লেন হৃদয়েশ যেরূপ চোয়াড় ও মতলবী,—দেবেশকে কোন বিপদে ফেল্‌তে পারে। আর সে তার টাকার জোরে দুষ্ট লোকের পরামর্শ নিয়ে নানারূপ ফন্দী আঁটবে—দেবেশের জীবন অশান্তিময় ক'রে তুলবে। এই সকল চিন্তা ক'রে দেবেশকে "নববৃন্দাবন" বিক্রয়ের পরামর্শ দিয়েছিলেন, দেবেশ তা' বুঝতে না পেরে তাঁর প্রতি সন্দিহান হয়েছিল।

---

(১৩)

হৃদয়েশের একজন পরামর্শদাতা মোসাহেব ছিলেন, তা'র নাম রতনকুমার বাঁড়ুয্যে। ইনি সিন্দুরতলার এক ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ ক'রে শ্বশুর-বাড়ীতে থাক্‌তেন। তাঁহার একটা দেশ আছে, সেখানে বিস্তর জমি আছে—একথা সকলে তাঁর মুখেই শুন্‌তে পেত; সেই জমিজমার আয় থেকে আদ্-পয়সাও তিনি কোন দিন পেয়েছেন, একথা কেউ বলতে পারে না। লেখাপড়া কিছুই শেখা হ'ল না। একটা মুদি দোকানের দাওয়ায় চট্ বিছিয়ে দিনটা সেইখানে কাটিয়ে দিতেন—খুব অধ্যবসায় ছিল, তা না হ'লে যুক্তাক্ষর না শিখেই বেশ নাকিসুরে বটতলার রামায়ণ পড়্‌তে সুরু কল্লেন কি করে? শ্রোতৃবর্গের কর্ণকুহর বিদীর্ণ হয়ে তারা পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেও রতনের কোন ক্লান্তি হ'ত না, বা পড়া থামত না। তখন তাঁর বয়স বিশ, প্রতিটি অক্ষর বানান ক'রে প'ড়ে যেতেন, কিন্তু নাকি সুরটি বজায় রেখে। কখনও কখনও একটু বিশ্রামের ইচ্ছা হ'লে চেঁচিয়ে গাইতেন, "এতদিন পরে ঘরে এলিরে রাম-ধন" এবং গাওয়ার সময় একটি হাত দিয়ে বাক্স বাজাতেন। মুদি দোকানের কাছে একজন কবিরাজ থাক্‌তেন, তাঁর একটি মাত্র ছাত্র ছিল। ছাত্রটি হঠাৎ পীড়িত হ'য়ে বাড়ী চলে যায়, তখন রতনকুমারকে তিনি তাঁর ডিস্‌পেন্সারীতে নিয়ে আসেন এবং ঔষধ তৈরী করার কাজে লাগিয়ে দেন। রতন এক হাতে বড়ী তৈরী কর্‌ত, আর এক হাতে গা চুলকাত—এবং অবিরাম নাকি সুরে গাইতে থাক্‌ত "এতদিনের পরে ঘরে এলিরে রামধন। মা ব'লে ডাকেনা ভরত মুখ দেখেনা শত্রুঘ্নন্"। যদিও তাঁর বেসুরে চীৎকারে কবিরাজ ম'শাই

বড়ই বিরক্ত হয়ে উঠ্‌তেন, তথাপি ছেলেটা ভয়ানক খাট্‌তে পার্‌ত বলে তিনি কিছু বল্‌তেন না।

এই ভাবে রতন কুমার—কস্তুরীভৈরব, চন্দনাদি লৌহ, নবায়স্‌, পূর্ণচন্দ্র-রস, মহালক্ষ্মীবিলাস প্রভৃতি ৭।৮ রকমের ঔষধ তৈরী করা শিখে ফেল্লে। মহানারায়ণ, মাসতৈল, ত্রিশতিপ্রসারিণী প্রভৃতি কয়েক রকম তৈলও জ্বাল দিতে শিখ্‌ল। কবিরাজ ম'শায়ের সঙ্গে সঙ্গে সে বড় মানুষদের বাড়ীতে যেত, ও চাকর-বাকরদের ঔষধ পত্রের দরকার হ'লে নিজে নাড়ী টিপে স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করারও কিছু সুবিধা করে নিয়ে ছিল। ২।৪৲ টাকা মাসিক যখন রোজগার আরম্ভ হ'ল, তখন তার সুর আরও অবিশ্রান্তভাবে "এতদিনের পরে ঘরে" গানটিকে কায়দা কর্‌তে লাগ্‌ল। ইতি মধ্যে তাঁর শ্বশুর মারা যাওয়াতে তাঁর নাবালক ছেলেগুলি ও বিধবা স্ত্রীর রতনকুমারই অভিভাবক হ'য়ে দাঁড়াল।

এই সময়ে রতনের স্ত্রীবিয়োগ হ'ল। অবিলম্বে কৌলীন্য বলে সে পঁচিশবছর বয়সে একটি ৭ বছরের মেয়েকে বিবাহ করে তাকে প্রতিপালন কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু পূর্ব্ব স্ত্রীর মাতা ও ভ্রাতাদের সংসার সে ত্যাগ কর্‌ল না। ৭ বছরের স্ত্রী যখন চৌদ্দ বছরে পদার্পণ কর্‌ল, তখন এ স্ত্রীটিও যেন রতনের অযতনে তার উপর বাম হয়ে ভবধাম ত্যাগ কর্‌ল, তখন আর একটি অষ্টম বৎসরের খুঁকী প্রথম স্ত্রীর পিতৃ-গৃহেই রতনের গৃহলক্ষ্মীরূপে দেখা দিল।

এদিকে নানারূপ কেলেঙ্কারী জনরবের সহায়ে সেই গ্রামে রটনা হ'ল। শাশুড়ীর সর্ব্বস্ব নাকি রতন কবিরাজ যে কোন উপায়ে তাঁকে হাত করে তাঁর অল্পবয়স্ক ছেলেদিকে একবারে নিস্ব করে ফেলেছে, সকলের মুখেই এই এক কথা। বহু দুর্ণাম হ'তে রক্ষা পেয়ে এবার শাশুড়ীঠাকুরাণী পরলোক গমন কর্‌লেন এবং তাঁর কাছ থেকে প্রায়

সমস্ত জমিজমাই রতনকুমার লিখে নিয়েছেন—সেইরূপ দলিল বার করে শ্যালকদিগকে তাদের পৈত্রিক ভিটা হ'তে তাড়িয়ে দিলেন।

এখন রতন কবিরাজের বেশ সম্পত্তি হয়েছে ও তিনি বাজারে বেশ বড় রকমের একটি ডিস্পেন্সরী খুলেছেন। পরের জমি আত্মসাৎ কর্‌বার তাঁর একটা স্বাভাবিক শক্তি ছিল, এটা মার্জ্জারের মূষিক ধরার শক্তির ন্যায়—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল-লব্ধ। তাঁর জমি সংলগ্ন কোন লোকের পতিত জমি পেলে রাত্রিকালে তিনি পিল্লে সরিয়ে দিতেন—সেই জমির দিকে জানালা খুলে স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতেন, এবং মাসে মাসে চলন্ত একটা বেড়া, যেন তৎপক্ষীয় সৈন্যের ন্যায় বিজয়-অভিমানে রওনা হ'য়ে পরের জমি ক্রমশঃ আত্মসাৎ কর্‌ত। আদালতে উকীল-বর্গের নিকট দলিল বগলে ক'রে নাকিসুরে তিনি এমনই কান্না জুড়ে দিতেন যে তাঁরা ভাব্‌তেন এ লোকটা নিতান্ত ভালমানুষ ব'লে অপ একে ঠকিয়ে খাচ্ছে।

এখন রতন কবিরাজের বয়স ৭০।৭৫ হবে, তাঁর মুখখানি অনেকটা ঘোড়ার মুখের মত লম্বা, মাথায় বিপুল টাক, দাঁতগুলি ভাঙ্গা বেড়ার মত গালের কাছে নড়বড় কচ্ছে। মৃদুস্বরে কথা বলেন এবং তাঁর পঞ্চম-পক্ষীয়া অষ্টাদশবর্ষীয়া স্ত্রীর মনোরঞ্জনার্থ পাছের দিকে যে কয়েকটি কেশ আছে তা সুগন্ধি তৈলে মার্জ্জনা ক'রে আঁচড়িয়ে রাখেন। গ্রামের কোন সঙ্গীন মোকদ্দমায় সাক্ষীর অভাব হ'লে টাকা থাক্‌লে লোকে রতন কবিরাজকে স্মরণ কর্‌লেই ফল লাভ করতে পারত, এ ধারণা সে অঞ্চলে সকলের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল।

কতকদিন যাবৎ হৃদয়েশ সর্ব্বদা রতন কবিরাজের সঙ্গে গোপনে কি পরামর্শ করতে লাগলেন। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা দেবেশের নিকট এক উকীলের চিঠি এসে হাজির। তার মর্ম্ম এইরূপ "যে আটবিঘা জমিতে তুমি বাগান করেছ, তার অর্দ্ধেক আমার পৈত্রিক সম্পত্তি। এপর্য্যন্ত তুমি তার বাবদ ৩২৸৴০ আনা বাৎসরিক খাজনা দিয়ে এসেছ, কিন্তু গত তিন বৎসর তুমি পুনঃ পুনঃ তাগাদা সত্ত্বেও কোন খাজনা দাও নি। একারণ লিখি, তুমি যদি ১৫ দিনের মধ্যে ঐ খাজনা না দাও, তবে তোমার নামে বাকী খাজনার নালিশ হবে। আরও লিখ্‌ছি যে তুমি আমার উক্ত ৪ বিঘা জমির ঠিকা প্রজা, খাজনা শোধ করে আজ হতে তিন মাসের মধ্যে তুমি আমার জমি খালাস ক'রে দেবে।"

এইরূপ যে একটা কিছু হবে, তজ্জন্য দেবেশ প্রস্তুত ছিলেন। তিনি চিঠিখানি হাতে করে গ্রামের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কার্ত্তিক চাটুয্যের নিকট গেলেন; প্রণামপূর্ব্বক তাঁর কাছে বসে বল্লেন "ঠাকুরদা, "নব-বৃন্দাবনের" আট বিঘা জমি আমার বাবা কতদিন হ'ল কিনে-ছিলেন এবং আমার খুড়ো প্রাণেশ ভট্টাচার্য্য তখন কি এক সংসারে ছিলেন, না পৃথক হ'য়ে গেছ্‌লেন ?"

কার্ত্তিক চাটুয্যে তাকিয়ায় ঠেশ দিয়ে বল্লেন, "সে অনেক দিনের কথা। তোমার খুল্লতাত প্রাণেশ ভট্টাচার্য্য তখন বিয়ে করে বিস্তর জমি জমার মালিক হয়ে স্বতন্ত্র হয়েছিলেন। তোমাদের পৈত্রিক জমির অর্দ্ধেক ভাগ ও বিবাহলব্ধ জমিদারী নিয়ে তিনি পৃথক হ'য়ে যাওয়ার পর

তোমার বাবা নিধু নাপিতের নিকট হ'তে ২৪০০৲ টাকা মূল্যে ঐ ৮ বিঘা জমি ক্রয় করেন। উহা তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি। প্রাণেশের ওতে কোন স্বত্ব নাই। এই সম্পত্তি ক্রয়ের বহু পরে প্রাণেশ তোমার সহোদর ভ্রাতা হৃদয়েশকে পোষ্য গ্রহণ করেন।"

দেবেশ···"নিধু নাপিত কে?"

"নিধু ও মধু নাপিতের ঐ ৮ বিঘা এবং বাস্তুভিটে এক বিঘা জমিতে থাকেন—মোট নয় বিঘা জমি ছিল। নিধু এদেশ ছেড়ে উত্তরে রাজসাহী অঞ্চলে চ'লে যায়, তারপর আর আসে নি—সে নিশ্চয়ই এখন বেঁচে নাই, তার সন্তান কেউ আছে কি না বলতে পারি না। কেন, তোমার খরিদা দলিলপত্র তো রেজেষ্টারী হ'য়েছিল, তোমার পিতা মথুরেশ ত কাচা লোক ছিলেন না। সে দলিলপত্র অবশ্যই তোমার কাছে আছে।"

দেবেশ বল্লেন "ঠাকুরদাদা, তার কিছুই আমার কাছে নাই। বাবার মরবার পর আমাদের ঘরের এক কোণে একটি লোহার সিন্দুকে দরকারী কাগজপত্র ছিল। আমি তিন চার বছর নবদ্বীপে থাকি—তখন বাড়ী তালা-বন্ধ ছিল। ফিরে এসে দেখি, যে জায়গায় সিন্দুকটা ছিল, তার ইটগুলি ক্ষয়ে গিয়ে উহা প্রায় আদ হাত মাটীর নীচে বসে পড়েছে। উঠিয়ে দেখা গেল—মাটীতে তলাটা ক্ষয়ে গিয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাগজপত্র নষ্ট হ'য়ে গেছে।"

"রেজেষ্টারী আফিসে খোঁজ করলে নকল পেতে পার।"

"৫০।৬০ বৎসরের পুরাতন কাগজ আছে কিনা বলতে পারি না, কত বৎসর পরে ত রেজেষ্টারী বিভাগের অনেক কাগজ জ্বালিয়ে দেওয়া হয়, শুনেছি। সত্য মিথ্যা জানি না।"

এই বলে দেবেশবাবু উকীলের চিঠিখানা দিলেন। সপ্ততিবর্ষ বয়স্ক

কার্ত্তিক চাটুর্য্যে তাকিয়াটা হ'তে মাথা তুলে সাম্‌নের বাক্সটা খুলে একটা সুতো বাঁধা চশমা বার করে চিঠিখানা পড়্‌লেন। একবার নয়, দু'বার পড়্‌লেন, বোধ হয় কি বল্‌বেন সেইটি ভেবে চিন্তে ঠিক কর্‌বার জন্য দ্বিতীয়বার পড়্‌লেন। তারপর সুরটা যেন একবারে বদ্‌লে গেল—এবং বল্লেন—"তাইতো, এখন মথুরেশ ও প্রাণেশ ভিন্ন হওয়ার আগে ঐ জমি খরিদ হয়েছিল কি না, তা' ত ঠিক মনে হচ্ছে না।"

দেবেশ···"ঠাকুরদাদা, ঐ জমিতে দাদার অধিকার থাক্‌লে কি এই পঁচিশ বৎসর সে কথা উঠ্‌তো না। আর ঐ যে আমার খাজনা দেওয়ার কথা আছে, তা যে ডাহা মিথ্যে।"

ঠাকুরদাদা কেঁকিয়ে বল্লেন—"তাই তো, দুই ভেয়ে যখন ঝগড়া তখন কে সত্য বল্‌ছেন, কে মিথ্যা বল্‌ছেন—তা তো আদালত ঠিক করবেন। এ বিষয়ে আমরা কি বল্‌ব! তোমাদের দুই ভেয়ের মধ্যে কখন কি হয়, বাইরের লোক তা জান্‌বে কি ক'রে?"

এই কথা শুনে যেন দেবেশের মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল। কার্ত্তিক চাটুয্যেই ত তাঁদের ঘরের কথা ভাল জানেন, তিনি যখন এরূপ বল্‌ছেন, তখন দেবেশ সাক্ষী পাবেন কোথায়? হুগলি গিয়ে দলিলের নকল সন্ধান করে বার করতে হবে। তিনি বাড়ী ছেড়ে ১৫ দিন দূরে থাক্‌লে বাগান রক্ষা কর্‌বে কে? হায় বাবাজি, তোমাকে ত আর বিশ্বাস করতে পারা যায় না। দেবেশের চোখ দিয়ে অশ্রু পড়্‌তে লাগ্‌ল—তিনি মুখ ঢেকে দ্রুতপদে কার্ত্তিকবাবুর বাড়ী হ'তে এসে রাস্তায় বাহির হয়ে পড়্‌লেন, দেবেশ ভাব্‌লেন—"সেই রেজেষ্টারী দলিলের নকল পেলেও উহা যে বাবা ও খুড়োমহাশয় ভিন্ন হওয়ার পূর্ব্বে সম্পাদিত হয় নাই, তার প্রমাণ পাব কোথায়?"

এই ভাবের চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে দেবেশ "নব বৃন্দাবনে" এলেন। তখন সেই সুন্দর বাগানটিকে আলো করে পূর্ব্বাকাশে অষ্টমীর ভাঙ্গা চাঁদ উদয় হ'য়েছে। বাগানের একপংক্তি ফুলের উপর সাদা রং জোছনা পেয়ে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। বকফুল অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় দেখাচ্ছে —টগর রজনীগন্ধ, কুন্দ, বেল, জুঁই—সাদার কি অপূর্ব্ব বাহার, যেন দপ্তরীর কাটা কাগজ উড়ে যাচ্ছে—যেন ধবধবে জলস্রোত ক্রীড়াশীল-ভাবে ব'য়ে চল্‌ছে। অপর দিকে লাল; যেন বাগানের উত্তর সীমানা-টায় আগুন লেগেছে। কৃষ্ণচুড়ার লালে "নববৃন্দাবন" সিন্দুর পরেছে, রঙ্গন ও জবার সেই লাল ঈষৎ কৃষ্ণাভ হয়েছে, সন্ধ্যামালতির লালে ঈষৎ নীলিমার রেখা দেখা যাচ্ছে—করবীর লাল ঘনীভূত হ'য়ে যেন অতি সূক্ষ্ম কৃষ্ণাম্বর পরেছে। পূর্ব্বদিকে হলুদ্ রং, যেন ভগবতী হাস্‌ছেন। কল্কে ফুলের হরিদ্রা বর্ণ নয়নাভিরাম, অতসী ক্ষুদ্র হ'লেও হলুদরঙ্গের একটা ঝাড়ের মত দেখাচ্ছে, মালতি যেন গায়ে হলুদ মেখে বসে আছে—এই সকল ছেড়ে ঋতু-পুষ্পের মক্‌মলের উপর রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি, চারিদিকে কৃষ্ণ লীলার ছবির প্রাচীর—জোছনাতে নব-বৃন্দাবন কি সুন্দরই দেখাচ্ছে। দেবেশের চক্ষে জল এল—দাদা আমার এই বাগান নেবেন—বাবাজি তাঁর সহায়, কার্ত্তিক চাটুয্যে তাঁর সহায়, যাদের তিনি আপন মনে করেছিলেন—তারা পর হ'য়ে গেলেন।" "বাবাজি—আমি তো তোমায় পিতার থেকে বেশী শ্রদ্ধা ক'রে থাকি, তুমি এই বাগান আমার হাত থেকে সরিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রের ভিতর আছে! আমার স্ত্রী তোমাকে এত বিশ্বাস করে, যে সে আমার চাক্ষুষ প্রমাণ মানে না। তোমার বিরুদ্ধে কথা বল্লে শ্যামলেশ মুখ ভার ক'রে থাকে—এহেন বিশ্বাসের উপর তুমি হানা দিয়েছ! সরলতার শুভ্রখনিতে তুমি কুটিলতার বিষ ছড়িয়েছ। তোমার

মুখ মনে পড়্‌লে যে আমারও একথা বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছা হয় না।” দেবেশ মাথা নীচু ক'রে হাত ছুখানি দিয়ে মাথা চেপে ধ'রে ব'সে পড়্‌লেন। আজ বাবাজি—গোঁসাইজির বাড়ীতে গিয়েছেন—আস্‌বেন না। রাত্রে বাগানের খোঁজ খবর দেবেশকে নিতে হবে, সবে রাত্রি ৮টা হয়েছে।

দেবেশ মনে মনে বাগানটিকে যুক্ত করে প্রণাম কল্লেন, “হে আমার কৃষ্ণলীলার নিকেতন, আমার আনন্দের উৎস, আজ তোমাকে রাখ্‌তে পার্‌লুম না! বশিষ্ঠের আশ্রম হতে কপিলা-গাভীকে বিশ্বামিত্র জোর ক'রে নিয়েছিলেন—আজ বশিষ্ঠের মনের অবস্থা আমার। বাবাজি পর হয়েছেন, ঠাকুরদাদা দাদার দিকে টান্‌ছেন—স্ত্রী পুত্র বাবাজি তোমার দিকে টেনে কথা বল্‌ছে, আজ আমার কে আছে? যদি কেউ থাক, তবে সহায় হও,—আমি আজ একক; আমি আমার নন্দনকানন হ'তে বিতাড়িত—আমি আত্মহত্যা ক'রে মরব। এই আমার সাধের স্থান হ'তে কুকুর বেড়ালের মত তাড়িত ও বান্ধবহীন সহানুভূতি শূন্য হয়ে ঘুরে বেড়াব—তা হবে না, এইখানেই আত্মহত্যা করে মরব! আমি মর্‌লে পর এই সকল ফুলের নিশ্বাস আমার গায়ে পড়্‌বে, তাতেই আমি স্বর্গলাভ করব। ‘নববৃন্দাবন’ হ'তে তাড়িত হয়ে আমি প্রাণ রাখতে চাই না।”

তারপর মনে পড়্‌ল, কতবার বৃষ্টি মাথায় ক'রে তিনি কাদা ছেনে ব'সে ব'সে চারাগুলি পুঁতেছেন, গভীর বনে ঢুকে বাঁশ কেটেছেন, একবার গোখরায় কামড়িয়েছিল আর কি? বাঁশের ছোট ছোট বেড়ার অন্দরমহলে তার কুসুমকলিকাগুলি ফুটতে দেখে প্রাণে কত খুসী হ'য়েছেন। ঢাকা জেলার সাভার গ্রামে “কৃষ্ণপদ” ফুলের চারা আন্‌তে নিজে গিয়েছিলেন। ভাদ্র মাসে ধলেশ্বরীর বিপুল ঢেউয়ে নৌকাখানি ডুবু ডুবু হ'য়ে ছিল, ফতুল্লার বিখ্যাত সরু ধানের চিড়া সঙ্গে ছিল, ভাত দুদিন জোটেনি, সেই

চিড়ে খেয়ে কাটিয়ে ছিলেন। কত রাত্রির হিমে সর্দ্দি কাশী সত্ত্বেও তিনি তাঁর বাবার কম্বলখানি গায়ে দিয়ে রাত দুপুরে নববৃন্দাবনে পাহারা দিয়েছেন। বাগানটি রক্ষা করবার জন্য যার হাত ধরতে পারেন না, তার পায়ে ধরেছেন। এই ১৫ বৎসর তিনি এই মৃত্তিকার আরাধনা ক'রেছেন, তাতে করেই এই "নব বৃন্দাবনের" সৃষ্টি! এখানে যাত্রীরা ভিড় করে যখন ফুল্, লতা ও ছবির প্রশংসা ক'রে, তখন তিনি সকল দুঃখ ভুলে যান।

আজ এই বাগান পরের হ'বে! তারপর কত মিথ্যা প্রবঞ্চনার কথা তাঁকে আদালতে শুনতে হবে। কত মিথ্যা কথার কৈফিয়ৎ দিতে হবে "এসকলত কখনও করি নাই।" দেবেশ দেখ্‌লেন যেন তাঁর দাদা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বাগান খানির বুক চিরে দুটুকরা কচ্ছেন, যেন রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির উপর বলদ চড়িয়ে তাতে চাষ দিচ্ছেন, তাকে যে দেখ্‌ছে সেই কৃত্রিম সহানুভূতি দেখিয়ে বল্‌ছে, "দেবেশ তুমি বড় মনস্তাপ পেয়েছ?" কার্ত্তিক চাটুয্যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে এসে সেই কৃত্রিম সহানুভূতিতে যোগদিয়েছেন। ক্রমে ক্রমে যেন এ অছিলায় সে অছিলায় তাঁর দাদার বেড়া তাঁর অংশের দিকে নিতাই এগিয়ে আস্‌ছে। রতন কবিরাজের সঙ্গে ক্রমেই বেশী রকমের ফিস্ ফাস্ চল্‌ছে। বাবাজি যেন গভীর রাত্রে বাগানের এককোণে দাড়িয়ে অতি মৃদুস্বরে তাঁর দাদাকে কি পরামর্শ দিচ্ছেন। চতুর্দ্দিক হ'তে যেন নিদারুণ কোন রাক্ষস তাঁর সুখের অমরাবতী গ্রাস্ ক'রতে আস্‌ছে। দেবেশ আর ভাবতে পারলেন না, তিনি হাত দু'খানি দিয়ে বুকটি চেপে ধরে সেই খানে বসে রইলেন।

---

(১৩)

এই সময়ে নীল পাগ্ড়ি মাথায় বড় একটা লাঠি হাতে, নাগরা ঝুটি-ওয়ালা জুতা পায়ে, গায়ে একটা মের্জ্জাই, বোতামের জায়গায় সরু সূতার দড়ি, কপালে রসকলি—একটি ৩৫।৪০ বৎসরের লোক সেইখানে এসে দাঁড়ালেন। দেবেশ তাঁর দিকে লক্ষ্য করেন নি। তিনি মাথা নীচু ক'রে নিজের ভাবনাই ভাব্ছেন। সেই বিদেশী ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলে,"বাবুজি, কানাই বাবার আখ্ড়া এখানে কোথায়,বল্তে পারেন!" দেবেশ তাঁ'কে দেখে উঠে দাঁড়ালেন এবং আঙ্গুল দিয়ে একটি ঘর দেখিয়ে বল্লেন, "ঐখানে তিনি থাকেন, কিন্তু আপনি তাঁকে আজ পাবেন না। তিনি ভিন্ন গ্রামে গেছেন, কাল সকালে আস্বেন।"

"বাবুজি, আমি বৃন্দাবন থেকে এই মেলট্রেণে এসেছি। দুদিন রাস্তায় বড় কষ্টে কাটিয়েছি। ঐ ঘরের চাবি কার কাছে? চাবি পেলে আজ এখানেই থেকে যাই।"

বাবাজির প্রতি তাঁর যতই কেন বিমুখতা থাকুক্‌না কেন, তাঁর লোক বৃন্দাবন থেকে এসে অনাহারে একটা খালি ঘরে প'ড়ে থাকবে, এ হ'তেই পারে না। দেবেশ বাবু তাঁকে আদর ক'রে বল্লেন—

"কেন এখানে থাক্‌বেন? পাণ্ডাজি, আমার রাধামাধবের সেবা আছে। কানাই বাবাজির সঙ্গে আমার যথেষ্ট আত্মিয়তা আছে। আপনি যদি রাধামাধবের মন্দিরে থেকে আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন, তবে বড়ই সুখী হব"।

বৃন্দাবনের পাণ্ডা সম্মত হ'লেন। ধীর পদক্ষেপে নিজের ভাবনায়

বিভোর দেবেশ আগে আগে চল্লেন এবং পাছে পাছে পাণ্ডাজি নাগরা জুতার থপ্ থপ্ শব্দ ক'রে দেবেশের বাড়ির দিকে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন।

হৃদয়েশ মামলা রুজু করেছেন। ধনপতি গয়লা ও রাজু সেকরা উভয়েই বয়োবৃদ্ধ, তারা প্রধান সাক্ষী। তারা ঘুষ খেয়ে দেবেশ যে রীতিমত তিনবৎসর পূর্ব্বে দেবেশকে খাজনা দিয়ে এসেছে—তার সাক্ষ্য দেবে। দেবেশ একটি কবুলিয়তি স্বাক্ষর করে দিয়েছে, তাতে সে যে ঠিক প্রজা এবং ৩২৸৵০ বাৎসরিক খাজনা দিতে সম্মত আছে—তাহা লেখা আছে,র রতন কবিরাজ,বরিশাল জেলা হ'তে সুদক্ষ জালিয়াৎ দ্বারা দেবেশের স্বাক্ষর জাল করে এনেছে। কবুলিয়তিটি চিঠির আকারে, তাহা রেজেষ্টারী না হ'লেও রমেশ চক্রবর্ত্তী ও ধীরেন্দ্র দাস ঘোষ তার নীচে স্বাক্ষীস্বরূপ দস্তখৎ করে দিয়েছেন। পাড়ার লোকদের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ সাক্ষী, তাঁরা বল্‌বেন কবুলিয়তি চিঠিতে দেবেশের স্বাক্ষর ঠিক। এই শেষ সাক্ষীদের বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, কারণ পেশাদার জালিয়তেরা নামের স্বাক্ষর এমন নিপুণ ভাবে জাল ক'রেছে যে তা দেখ্‌লে দেবেশ নিজেই সাদৃশ্য দেখে গোলযোগে পড়ে যেতেন। দেবেশ যাদের সাক্ষী মান্য করতে চাইলেন তারা নানারূপ ওজহাতে স্বীকার ক'রল না, এবং কেউ কেউ ভয় দেখিয়ে বল্লে, "আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বে যদি তুমি আমাদের সাক্ষী কর, তা হলে তার ফল ভাল হবেনা, হয়ত আমাদের কথা বিরুদ্ধ পক্ষের অনুকূল হ'য়ে পড়বে।"

দেবেশ বুঝ্‌লেন জগৎ টাকার বশীভূত। তাঁর পক্ষে কেউ নাই।

---

(১৩)

কিন্তু হঠাৎ হৃদয়েশের এত বড় ষড়যন্ত্রটা সমস্তই বিফল হ'য়ে গেল। মোকর্দ্দমার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলা ধনপতি গয়লা ও রাজু সেকরা যে এক শত এক শত টাকা নিয়ে সাক্ষ্য দিতে স্বীকার ক'রেছিল তা' ফিরিয়ে দিল এবং বল্‌ল তারা আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পার্‌বে না। হৃদয়েশের নিযুক্ত পাইকগণ তা'দের দুজনকে কুৎখানায় নিয়ে গিয়ে খুব উত্তম মধ্যম দিল, কিন্তু কিছুতেই তারা স্বীকার পেল না। পাইকগন তাদের কুঠঘরে আট্‌কিয়ে রাখ্‌ল। রতন কবিরাজ হুকুম দিলেন, পরদিন বাড়ীর পশ্চিমদিকের ঘন জঙ্গলের মধ্যে দুইটা প্রকাণ্ড বড় গর্ত্ত ক'রে তাদের হেট্ মাথা ক'রে তার মধ্যে নিক্ষেপ কর্‌বেন এবং শেষে মাটী দিয়ে গর্ত্ত দুইটি ভর্ত্তি ক'রে উপরে কাঁটার বন রোপণ কর্‌বেন। এরূপ ভয় পেয়েও তা'রা মিথ্যা বল্‌তে রাজি হ'ল না।

কিন্তু পরদিন দেখা গেল, জেলেরা বাবুর পুকুরের মাছ ধ'রে দিতে এবং দোয়ালেরা দুধ দুয়ে দিতে আসে নি। ধোপা কাপড় ফিরিয়ে দিয়ে গেল, এবং পাইক পাড়ার পাইকগুলি হৃদয়েশের কাছে এস্তাফা দিতে দলে দলে হাজির। প্রথম প্রথম হৃদয়েশ কিছুই বুঝ্‌তে পারেন নি এবং রতন কবরেজ সমস্ত প্রজা নির্ম্মূল করে শিক্ষা দেবেন এই আস্ফালন কর্‌ছিলেন, কিন্তু শেষে ভেতর কার খবর কিছু সন্ধান পেয়ে উভয়েই একটু চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌লেন।

ব্যাপারটি হ'চ্ছে এই—সে দেশের ছোট লোক সকলেই প্রায় রেমো গোসাইয়ের শিষ্য, তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবানের ন্যায় ভক্তি ক'রে। বাবাজির

সংসর্গে এসে তাঁর চরিত্রের দোষগুলি ক্রমেই সংশোধিত হচ্ছিল এবং মনে ভক্তি প্রেম প্রভৃতি সদ্‌গুন গুলি জেগে উঠেছিল। তিনি জান্‌তে পার্‌লেন, নিরীহ ব্রাহ্মণের উপর তাঁর ধনবান ভ্রাতা অত্যাচার ক'চ্ছেন এবং ষড়যন্ত্র ক'রে তাঁর সাধের বাগানটি কেড়ে নিতে চেষ্টা কচ্ছেন। রেমো গোঁসাই খুব উৎসাহী পুরুষ, তাঁর যখন যেটি ভাল লাগে, সে কাজটি তদ্দণ্ডেই সাধন কর্‌বেন—নতুবা রাত্রে তাঁর ঘুম হবে না।

তিনি যখন শুন্‌লেন ধনপতি গয়লা, রাজু সেঁকরা প্রভৃতি তাঁর শিষ্য-সেবকের মধ্যে কয়েকজন দেবেশের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য উৎকোচ নিয়েছে, তখনই তাদেরে ডেকে আন্‌লেন এবং সত্য কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। তারা গুরুর নিকট মিথ্যাকথা বল্ল না। গোঁসাইজি তাদেরে ঘূষের টাকা ফিরিয়ে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে নিষেধ কল্লেন। তাতে ক'রে জমিদারের কোপানল জ্বলে উঠ্‌বে—তখন এরা কর্‌বে কি? —এই প্রশ্ন হ'ল। গুরুজি বল্লেন, "যা শাস্তি দেবে সয়ে নেবে, কিন্তু জমিদার যদি বাড়াবাড়ি করেন তবে তার দোরগোড়া কেউ মাড়িও না। এবং যদি বাড়াবাড়ি রকমের অত্যাচার তিনি করেন, তবে উচিত শিক্ষা দেবে। ভগবান স্বয়ং যুগে যুগে দৈত্য দানব মেরে পৃথিবীর ভার লাঘব করেছেন, তিনি কারুকে বাঁশী বাজিয়ে ডাকেন, আর কারু গলা টিপে মারেন—দরকার হ'লে সকলই কর্‌তে হয়। আমার এবং আমার ভগিনী রূপমঞ্জরী দেবীর শিষ্যসেবকের সংখ্যা এ তল্লাটে বড় কম নয়—প্রায় পাঁচ হাজারের কাছাকাছি। এই পাঁচ হাজার লোক যদি জমিদারের বাড়ীর দোরে গিয়ে একটা হাঁক দেয় তবে তার ভয়ে প্রাণ উড়ে যাবে। কিন্তু সাবধান; গায়ে পড়ে ঝগড়া কল্লো না—এবং নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে কাউকে মারধর করোনা। একটা নিরীহ ব্রাহ্মণের ছেলে তার পূজা অর্চ্চনা নিয়ে আছেন, ফুলবাগানটি নিয়ে আছেন,

তাঁর উপর একি অমানুষী অত্যাচার! প্রাণনাথ মণ্ডল হাত যোড় করে বল্লে, "প্রভু যদি জমিদারকে শাস্তি দিতে হয়, আমরা পেছ্‌পা হব না, গুরুজি সাক্ষাৎ ভগবান—আপনি যা আদেশ করবেন, আমরা প্রাণ দিয়ে তা পালন করব!"

গোসাই ডান হাতের অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুলী এই দুইটি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ নস্য গ্রহণ পূর্ব্বক নাসারন্ধ্রে নিক্ষেপ করে বল্লেন, "তোমরা ফোঁস করার গল্প জান না?" মণ্ডল বল্লে···"আজ্ঞে সে আবার কি?"

গুরুজি হাসির চ্ছলে দন্ত পংক্তি বার করে বল্লেন;—

"বল্‌ছি শোন, একটা বড় মাঠে একটি গোখ্‌রো সাপ থাকৃতো বড় একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে তার বেশ একটা মস্ত বড় গর্ত্ত ছিল। গোখ্‌রাটা ভয়ানক দুষ্ট ছিল, সে যাকে দেখ্‌তো তাকেই কামাড়াতে যেত। বছরের পাঁচ ছয়মাসে তার দাঁতের বিষে দুই একশ লোক মারা পড়ত, তা ছাড়া গরু বাছুর গুলিকেও বাদ দিত না। সে এত বড় রাগী ছিল যে কোন পাখীর ছায়া যদি তার উপরে পড়েছে, অমনি ফোঁস করে ফনা উঠিয়ে শুধু ল্যাজটুকুর একটা ছোট অংশ মাটীতে রেখে সব খানি শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে উৰ্দ্ধদিকে সেই পাখীটাকে ধর্‌তে পারে কিনা সেই চেষ্টা করেছে।

"বহু লোক একত্র হয়ে লাঠী সড়কী প্রভৃতি নিয়ে তাকে মার্‌তে গিয়েছে, কিন্তু সে বিদ্যুৎ বেগে লুকিয়ে পড়ে, বিদ্যুৎ বেগে নিরীহ নিরস্ত্রব্যক্তি বেছে নিয়ে কামড়িয়ে চলে যায়। বহুবার ব্যর্থকাম হয়ে লোকজন তাকে মারার আশা ছেড়ে দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মাঠের পথে যাতায়াত ও বন্ধ করে ফেল্লে।

নিধিরাম পোদ্দার মাটিতে পড়ে প্রণাম জনিয়ে বল্লে, "আজ্ঞে আমার কাছে এমন ঔষধ আছে, প্রভু যদি পরখ্‌ দেখ্‌তে চান,

তবে দেখাতে পারি, গাছের মূলটি মাথার কাছে ধরলেই, কেউটে হউক, গোখ্‌রা হউক, মাথাটি হেঁট্ করতে হবেই।"

রামহরি বাঘ বল্লে "গল্পে বাধা দিচ্ছিস্ কেন? প্রভুর শ্রীমুখের কথা আগে শোন্।"

গোসাইজি বল্লেন, "আচ্ছা, নিধি, তোমার ওস্তাদের পরীক্ষা শেষে হবে, এখন শোন।"

"একদিন নারদ ঋষি বীণাটি ডান হাতে ধরে, কাঁধের কাছে বীণার কানগুলি মলে দিয়ে, সুর ঠিক করতে করতে সেই বনের পথে চলেছেন, তাঁর ছায়াটা সম্মুখের দিকে পড়েছে। পথ হতে তাঁকে দেখে ভয়ানক চটে যেয়ে গোখরা ফণাটা বার করে, ল্যাজের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে খানিকটা দুলতে লাগ্‌ল। হয়ত বীণাটাকে সে বন্দুক টন্দুক কিছু মনে করে প্রথম একবারে এগিয়ে আসতে সাহস করে নি, তারপর যখন দেখ্‌লে ঋষি বেশ সুকণ্ঠে বীণার মধুর সঙ্গত করে গেয়ে চলেছেন, তখন বুঝতে পারলে ওটা অস্ত্র নয়, তখন ধাঁ করে গিয়ে ঘা কতক কামড় ঋষির অঙ্গে বসিয়ে দিলে। নারদ হাস্‌তে লাগ্‌লেন, তাঁর ত আর ভৌতিক শরীর নয়।"

পরাণ মণ্ডল এখানে বাধা দিয়ে গুরুজির বৃদ্ধাঙ্গুলির ধূলি মুখেও মাথায় ছুঁইয়ে নিয়ে বল্লে, "প্রভু ভৌতিক মানে কি?"

গোসাইজি বল্লেন, "এই যে আমাদের শরীর, পঞ্চভূতে তৈরী, যথা জল, বায়ু মাটী প্রভৃতি, ঋষির শরীর সেরূপ নয়, তা চিন্ময়, সূক্ষ্মদেহ—তা' আমাদের শরীরের মত নষ্ট হয় না। সুতরাং সাপের কামড়ে কিছুই হ'ল না, বরং ঘা কতক কামড় খেয়ে তাঁর হরিনাম কীর্ত্তনের নেশাটা বেড়ে গেল।"

"গোখ্‌রাত অবাক, প্রথম রেগে মেগে সে বুঝতে পারেনি, এখন

দেখ্‌লে ঋষি ঢলেও পড়লেন না, গানও থামালেন না—বরং হাস্‌তে হাস্‌তে তার কাছে দাঁড়িয়ে আরও আগ্রহে গাইতে লাগলেন। গোখ্‌রা কখনও ত কাউকে তার কাছে দাঁড়িয়ে তার কামড় খেয়ে হাস্‌তে দেখে নি,সুতরাং সে অবাক্‌ হয়ে গেল।

"সে বুঝ্‌তে পার্‌ল "এযে সে মানুষ নয়, তখন ফণাটা হেলিয়ে মানুষের ভাষায় বল্লে—"

জোড় হাত্‌ করে শ্রীপতি বারুই বল্লে,—"প্রভু সাপ কি সত্যি মানুষের মত কথা কইতে পারে ?"

গোসাই বল্লেন, "আরে এটা যে গল্প শুনে যা না" সবাই বারুইকে গালি দিতে লাগল—"কেন গল্পে বাধা দিচ্ছিস।"

গোঁসাই আর এক টিপ নস্যি হাতে করে নাকের কাছে আন্‌তে কিছু বিলম্ব কল্লেন এবং বলে যেতে লাগ্‌লেন—"সাপটা বল্লে—তুমি কে ঠাকুর ? আমি তোমার মত লোক ত দেখিনি ! আমার কামড় খেলে গাছের পাতা জ্বলে যায়' পলক ফির্‌তে ফির্‌তে মানুষ ঢলে পড়ে—আর তুমি হাস্‌ছ ? তুমি কে ?"

"আমি নারদ, বাপু তুমি কেন এই হিংসাবৃত্তি অবলম্বন করেছ ? এতে কি বড় সুখে আছ ?"

"সুখে কিছু নেই,পরকে কামড়ে শেষে কেবলই রাগ বেড়ে যায়,তাতে, ঠাকুর সোয়াস্তি পাই নে। তবে অভ্যাস, কি করব ? ছাড়্‌তে পারি না।"

"আর কাউকে কামড়িও, না মনে শান্তি পাবে।"

"শান্তি পাব ? তোমার কথা বড় মিষ্ট ঠাকুর,তুমি আমার কামড় খেয়ে আমার শান্তি দেবে বল্‌ছ ! এমন দয়াল্‌ কোথায় দেখি নি ! . তুমি শান্তি দিতে পার্‌বে, আমার কামড়ে যখন তোমার শান্তি ভাঙ্গে নি, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে শান্তি দিতে পারবে, বল, কি করব ?"

"আজ হইতে কাউকে কামড়িও না।"

"আজ হতে কাউকে কাম্‌ড়াবনা ? সারাদিনটা তো কাকে কামড়াব এই চেষ্টায়ই কাটাই। সে চেষ্টা গেলে যে আমার কিছু কাজই থাকে না—সারাদিন কি করে কাটাব ? বল।"

"আমি তোমার হরিনাম দিচ্ছি, নাম কীর্ত্তন কর।" এই বলে সাপের মুখের কাছে মুখ নিয়ে দেবর্ষি বল্লেন, বল "কৃষ্ণ", এই দ্বিঅক্ষর নাম সারাদিন জপ কর। দেবর্ষির মুখে কৃষ্ণ নাম শুনে গোখ্‌রা থর্ থর্ করে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল, তার দ্বেষের খোলসটা যেন দেহ হ'তে পড়ে গেল। সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেল।

"দেবর্ষি বল্লেন, "এখন আমি যাই, সময় মত আস্‌ব আবার! তুমি কারুকে কামড়িও না, নাম জপ করতে থাক।"

"গোখ্‌রা তার মাথাটা ঠাকুরের পায়ের কাছে আছ্‌ড়িয়ে তার মনের গভীর কৃতজ্ঞতা জানালে।

"গোখ্‌রা তদবধি গর্ত্তে থাকে, কখনও কখনও বাইরে এসে নাম জপ করে। লোকেরা দেখলে—সে অবিরত হিস্ হিস্ শব্দ আর শোনা যায় না। ছায়ার মত কালো বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রগতি দেহটা আর মাঠের এদিক্ ওদিক্ দেখা যায় না। তারা আস্তে আস্তে সাহসী হ'য়ে এগিয়ে এল, ভাব্‌লে বুঝি আপদ মরে গেছে, সে বেঁচে থাক্‌লে লোকের পায়ের শব্দ শুনে কি আর চুপ করে বসে থাক্‌ত! রাখালের ছেলেদের একটা অসীম সাহসী ছেলে একটা কাটি দিয়ে গর্ত্তটা পর্য্যন্ত ঘাঁট্‌তে আরম্ভ কর্‌লে—কিন্তু সাপটাকে সেদিন কেউ দেখ্‌তে পেল না তখন সবাই বল্লে, "বুড় হয়েছিল, যম ছাড়বে কেন ? টিকি ধরে নিয়ে গেছে।"

"কিন্তু পরদিন দেখ্‌লে যেমন গোখ্‌রা, তেমনই আছে, গর্ত্তের কাছে শুয়ে আছে। তখন ৩।৪ দিন ভয়ে কেউ আর সে পথ মাড়ালে না। তার

পর একটা রাখাল বল্লে, "ভাইসব, এত পায়ের শব্দ শুনেও সে দিন তেড়ে এলনা কেন? চ—না দেখি বেটা কি করবে?" এই বলে লাঠি নিয়ে ৩।৪ জন সাপের কাছে গেল। সাপ গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল।

"তাজ্জব ব্যাপার! কিছুই বলে না। পরদিন যখন গোখ্‌রা গর্ত্তের কাছে শুয়ে আছে, তখন একটা ছেলে গিয়ে লাঠি সর্কা মার্‌লে, ল্যাজের কাছটা মুচ্‌ড়ে গেল, কিন্তু সাপটি কিছু কর্‌লে না, গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল।

"এই ভাবে রোজই গোখ্‌রা মার খায়। লোকেরা বলাবলি করে' "বুড় হ'য়েছে যে, ওর বিষ দাতটা পড়ে গেছে।" কিন্তু মার্‌তে কেউ কসুর ক'রে না এই ভাবে প্রহারে প্রহারে জর্জ্জরিত হ'য়ে তবু সে কৃষ্ণনাম জপ কর্‌তে ছাড়ে না। এর মধ্যে একদিন নারদঋষি তার শিষ্যটিকে দেখ্‌তে এলেন, নারদের পায়ের শব্দ পেয়ে গর্ত্ত থেকে উঠে গোখ্‌রা তার পায়ের কাছে পড়ে কাঁদ্‌তে লাগলে।

"নারদ বল্লেন,"কেমন আছ, জপ চল্‌ছে ত? কাউকেত আর কামড়াওনি? গোখ্‌রা কেঁদে কেঁদে তার ক্ষতবিক্ষত শরীরটা দেখিয়ে বল্লে,—"আমার ত আর ঠাকুর তোমার মত শরীর নয়, যে গোখ্‌রার কামড় খেয়েও তা সুস্থ থাকে! এখন উপায় কি? আমাকে কোন্ দিন মেরে ফেল্‌বে? তার ঠিক কি?"

নারদ বল্লেন, "আরে যাঃ আমি কামড়াতে নিষেধ ক'রছি, কিন্তু ফোঁস করতে ত নিষেধ করি নি। কাল সকাল থেকে ফোঁস ক'রো, তাহলে আর তোমার কেউ উৎপাত করবে না।"

"নারদ চলে গেলেন—তার পরদিন যেমনি রাখালের দল ও লোকজনেরা লাঠি নিয়ে তাকে উৎপাত করতে এসেছে, অমনি ল্যাজ আছ্‌ড়িয়ে চক্ষু দুটি বিকটাকৃতি ক'রে সাপ তাদেরে কামড়াবার মতন

ক'রে ভয়ঙ্কর ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ করতে লাগল—তদবধি ভয় পেয়ে আর কেউ তার কাছে এগোতো না।"

"তাই বল্‌ছি যদি ভয় দেখিয়ে অত্যাচারকে নিরস্ত করতে পার, তবে পীড়ন করতে চেষ্টা ক'র না। আমার কথা মত চল, তোমাদের যা কিছু সাহায্য করতে হয়, আমি করব।"

শিষ্যগণ গুরুজির পায়ের বুড় আঙ্গুলের ধূলি মুখে ও মাথায় ঠেকিয়ে, হরি হরি বলে যে যার বাড়ীতে প্রস্থান করল।"

(১৮)

হৃদয়েশ ও রতন কবিরাজ গোঁসাইজির আদেশের কথা লোক মুখে শুনেছেন। মোকর্দ্দমাটার তারিখ বদ্‌লাবার জন্য আদালতে উকিল আর্‌জি করেছিলেন। আরজি মঞ্জুর হয়েছে। আর একমাস পরে দিন পড়েছে।

রতন কবিরাজের সঙ্গে পরামর্শ করে হৃদয়েশ মোকর্দ্দমাটি উঠিয়ে নেওয়া উচিত মনে কর্‌লেন। বাড়ীতে দুধ মাছ সব বন্ধ, তার উপায় ছোটলোক-প্রজাদের যেরূপ ভাব, তারা কোন দিন বাড়ী আক্রমন করে তার ঠিক নাই তারপর ব্রাহ্মণ সাক্ষী যাঁরা ঘুষ খেয়েছিলেন, তাঁরাও সাক্ষ্য দিতে অনিচ্ছুক হলেন, বল্লেন ছোট-লোকের যেরূপ বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, আপনি বড় লোক হয়েই ভয় পাচ্ছেন, আমরা গরীব, আমাদের গলা টিপে মার্‌লে কে দেখ্‌বে?

রতন কবিরাজ বল্লে, "পুলিশ ফৌজ নিয়ে এসে তাদের দ্বারা এ ছোটলোকগুলিকে আচ্ছা রকমের শিক্ষা দেওয়া যায়। ম্যাজিষ্ট্রেটকে এদের কথা বল্লে বেশ প্রতিকার হ'তে পারে। ইভান্‌স্ সাহেব খুব তেজস্বী, আপনি গিয়ে বল্লেই অশ্বারোহী গোরা সৈন্যের জন্য তার ক'রে বস্‌বেন। কিন্তু এই ব্যাপরের আর একটা দিক্ আছে। শুনেছি, এখন রেমো গোঁসাই বাবাজিকে গুরুর ন্যায় মান্য করে, হয়ত বাবাজির অনুরোধেই সে এই সকল কাণ্ড কর্‌ছে। বাবাজির সঙ্গে কিশোর রায়ের বিশেষ ভাব আছে, কিশোর রায় দেবেশকেও স্নেহের চক্ষে দেখেন, এবং বাগানটি যে তার—তা' বিলক্ষণ জানেন। এখন সন্ধান করে সকল কথা জান্‌তে পার্‌লে প্রজাদের উপর ম্যাজ আপনার অত্যাচারের কথা শুন্‌লে তিনি আপনার নিশ্চয়ই বিপক্ষ মতন হবেন,—আপনি এতে কি কোন বিপদ দেখ্‌ছেন না?"

হৃদয়েশ চম্‌কে উঠে বল্লেন,—"বিপদ ব'লে বিপদ! আমার সমস্ত তালুকই কিশোর রায়ের জমিদারীর মধ্যে, তিনি ইচ্ছা কর্‌লে ত' ছয় মাসের মধ্যে আমায় ফকির ক'রে ছাড়্‌তে পারেন। না, কব্‌রেজ ম'শায়, এ মামলাটা উঠিয়ে নেই—তারপর অপর যদি উপায় থাকে, তা শেষে অবলম্বন করা যাবে। প্রজাদের ভয়ে বাড়ীর লোক অস্থির হয়ে আছে, ছোট লোক—ওদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান নেই। যে কোন মুহূর্ত্তে বিপদ ঘটাতে পারে। মোকর্দ্দমা আমি চালাব না।"

এর পরে মোকর্দ্দমা তুলে নেওয়া হ'ল, কিন্তু উদ্দেশ্যের পথে এরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে বাধা পেয়ে হৃদয়েশের হৃদয়ে প্রতিহিংসার বহ্নি ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল।

---

(১৯)

একটা মোড়ার উপর বুদ্ধদেবের মত স্থির হ'য়ে ব'সে 'ভোগের ঘরে' উনুনের নিকট ময়দা ছেনে, ঘিয়ের ময়ান দিয়ে পাণ্ডাজি মোটা মোটা রুটি তৈরী কচ্ছেন এবং নীচে মেজের উপর আসীন দেবেশের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন। দেবেশ জিজ্ঞাসা করলেন "কানাই বাবাজির সঙ্গে আপনার কি দরকার?"

পাণ্ডা…"কি দরকার? উনিই হচ্ছেন আমাদের মনিব! সকল বিষয়েই ওঁর সঙ্গে আমাদের দরকার!"

দেবেশ…"উনি কে?"

পাণ্ডা…"উনি কে? বৃন্দাবনে 'যশোমাধবের'মঠের নাম শোনেন নি? উনি হচ্ছেন সেই মঠের মালিক। আমার মত অনেক পাণ্ডা সেইখানে থাকে।"

দেবেশ…"সেই মঠে কি হয়?"

পাণ্ডা…"কি হয়! ধ্যান, ধারণা, পূজা, মহোৎসব, কাঙ্গালী-ভোজন, ব্রাহ্মণ-ভোজন মঠে যা' যা হবার সকলই হয়।"

দেবেশ…"টাকা আসে কোত্থেকে?"

পাণ্ডা…"কোত্থেকে আসে? সেই মঠের আয় থেকে।"

দেবেশ…"মঠের আবার আয় কিসের?"

পাণ্ডা…"কিসের? মঠে অনেক ভক্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছেন, তা' থেকে আয় হয়।"

দেবেশ…"যশোমাধবের মঠের আয় কত?"

পাণ্ডা…"কত ? আয় সাড়ে তিন লাখ টাকা।"

দেবেশ…"এ তো এক রাজার আয়, এ টাকা কি ভাবে খরচ হয় ?"

পাণ্ডা…"কি ভাবে খরচ হয় ? মহান্ত যে ভাবে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবে খরচ হয়।

"অবশ্য নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ধর্ম্ম কার্য্য আছে, তা' করতে হবে। ধরুন, আমাদের মঠের সেই সকল কাজের জন্য বৎসর ৫।৬ হাজার টাকা লাগে, তা ছাড়া এই সাড়ে তিন লাখের অবশিষ্ট সকলই মহান্ত-মহারাজ যে ভাবে খরচ করবেন, সেই ভাবেই খরচ হবে। চাই কি তিনি তাঁর কোন খেয়ালে উড়িয়ে দিতেও পারেন, নতুবা ভাল কাজে ব্যয় করতে পারেন।"

দেবেশ…"যশোমাধবের মঠের মহান্ত মহারাজ কে ?"

পাণ্ডা…"কে ? তাতো বলেছি, কানাই বাবাজি।"

দেবেশ…"কে কানাই বাবাজি ? আমাদের এই বাবাজি ? তিনি যে বড় গরিব, ভিক্ষে শিক্ষে করে দিনপাত হয়। ইনি আপনাদের মঠের কানাই বাবাজি কিছুতেই নন, আপনি ভুল ক'রে এখানে এসেছেন।"

পাণ্ডা…"পথ ভুলে এসেছি ? কখনই নয়, এ গ্রামের নাম সিন্দুর-তলা নয় ? এক বিঘে জমির উপর একখানি কুঁড়ে ঘর—মধু নাপিতের দেওয়া। এইখানেই তো কানাই বাবাজি থাকেন, তাঁর বয়স ৬০।৬৫ হবে, বর্ণ শ্যাম, মুখখানি কচি ছেলের মত সরল, যদিচ চুল গুলি প্রায় সবই পাকা।"

দেবেশবাবু দেখলেন এ বর্ণনা ঠিকই মিলে গেছে, ইনি তবে বাৎসরিক সাড়ে তিন লাখ টাকার মালিক! হতেও পারে, তা না হ'লে কিশোর রায়ের মত লোক, ডিভিসনের কমিশনর সাহেব এলে

যিনি তিন দিন ঘুরিয়ে তবে দেখা করেন, সেই কিশোর রায় এঁর কাছে কেঁচো হ'য়ে পড়্‌লেন কেন? ইনি যে বড়লোক, তার সন্দেহ নাই, এর আচার ব্যবহারে বিষয়ের উপর একটা বিতৃষ্ণা আছে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, অনেক বিষয় আছে বলেই বোধ হয় এই বিতৃষ্ণার ভাব!"

"আমি এঁকে সন্দেহ করেছি—দাদা এঁকে ঘুষ দিয়ে বশ করেছেন!" কতকটা অনুতাপ ও গ্লানি এসে তাঁর মনটা দখল করে বস্‌লো। পাণ্ডাজি ততক্ষণ রুটি ভেজে ফেলেছেন ও এক সের পরিমিত দুধ, কয়েকটা পেঁপে ও আধ্‌পো আন্দাজ খেজুরে গুড় লয়ে ভোজনে বসে গেছেন। দেবেশের কানাইবাবার সম্বন্ধে কত প্রশ্ন মনে হচ্ছে, কিন্তু পাণ্ডাজি ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত, তাঁর ভোজন সমাপনের পরে প্রশ্ন-গুলি করবেন, এই প্রতীক্ষায় চুপ ক'রে রইলেন।

(২০)

কানাই বাবাজির সম্বন্ধে পাণ্ডাজির কাছ থেকে দেবেশ যা শুন্‌লেন, তা এই। বলাই ও কানাই নামক বর্দ্ধমান জেলার একজন মধ্যবৃত্ত ব্রাহ্মণের দুই ছেলে ছিল। সেই ব্রাহ্মণও তাঁহার স্ত্রী প্রায় এক সময়েই মৃত্যু মুখে পতিত হন। তখন বলাইয়ের বয়স ২০ এবং কানাইয়ের বয়স ১৮, কানাই সেবার এলে পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার ক'রে সরকারী বৃত্তি পেয়েছেন। বলাই ছোট কাল থেকে সন্ন্যাসধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী। একসঙ্গে পিতৃমাতৃহীন হ'য়ে তিনি বৃন্দাবনে যশোধামের মঠে রাধানন্দ মহান্তজীর শিষ্য হন। দাদা চ'লে গেলে কানাই ও লেখা পড়ার পাঠ তুলে দিয়ে সরকারী বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে সেই মঠে চ'লে আসেন। এবং উভয়েই রাধানন্দ মহান্তজির অতি প্রিয় শিষ্য হ'য়ে দাঁড়ান। ইঁহাদের পরে মহান্তজির যে সকল শিষ্য মঠে এসে বাস করেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীগোপাল পাঁড়ে বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বলাই ও কানাইয়ের পরে নাম করতে হ'লে শ্রীগোপাল পাঁড়েরই নাম ক'রতে হ'ত। রাধানন্দ গোঁসাই মঠের আয় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা মঠেই ব্যয় ক'রতেন। নিত্য মহোৎসব, কাঙ্গালী-ভোজন, দোল, রথ-যাত্রা প্রভৃতি বিবিধ উৎসবে মঠটি নিরন্তর আনন্দের একটা অফুরন্ত প্রবাহ জোগাত। রাধানন্দের স্বর্গ লাভের পর বলাই বাবাজি মহান্তের পদ প্রাপ্ত হ'ন, ইহঁার রোখ্ ছিল দেবমন্দিরে অর্থ ব্যয় করা। ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে প্রাচীন মন্দিরের সংস্কারের দরকার হ'ত, সংবাদ পাইলেই বাবাজি অকাতরে অর্থ সাহায্য ক'র্তেন। সম্প্রতি তিন বৎসর হ'ল তিনি পরলোক গমন ক'রেছেন, এখন কানাই বাবাজি গদিতে অভিষিক্ত হ'য়েছেন। গদিতে

.হই ইনি ভারতবর্ষর নানা স্থানে ঘুরে এসেছেন। যেখানে দুঃখিনি সেইখানেই বাবাজি অন্নসত্র খুলতেন, যে খানে মহামারী সেইখানে তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা ক'রতেন। নগ্ন পদে, কৌপীন সার, মোটা গুধরী গায়ে, পিতার আমলের একটা লোটা হাতে মহান্ত মহারাজকে কলেরা, ক্ষয় প্রভৃতি ভীষণ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কাছে ব'সে সেবা শুশ্রূষা করতে অনেকেই দেখেছেন। নিজে রেঁধে একবার মুষ্টিমের অন্ন আহার করতেন, কিন্তু ঘড়ির কাঁটার ন্যায় দুঃখীর দুঃখ দূর করতে ঠিক নিয়মিত সময়ে যথা স্থানে তিনি হাজির হ'তেন। এমন কর্ম্মী, এমন ত্যাগী, এমন আত্মাভিমান-বিবর্জ্জিত সাধু তখন এ দেশে খুব কমই ছিলেন।

"মঠের টাকায় যে দুঃখী তাঁর অধিকার" এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সুতরাং অন্ধ আতুর, নিরন্ন তাঁকে যেমন খুঁজত, তিনিও সেইরূপ তাদেরে খুঁজতেন।

এর মধ্যে একটা ঘটনা ঘটল, যার জন্য তিনি মঠের সংসর্গ ত্যাগ করে প্রবাসী হয়ে পড়লেন।

একদিন মঠের একটা প্রকোষ্ঠে তিনি বিশ্রাম কচ্ছিলেন। অপর প্রকোষ্ঠে দুই ব্যক্তি কথাবার্ত্তা বলছিলেন—বেশ জোর গলায়। তাঁরা জানতেন না মহান্তজি অপর প্রকোষ্ঠে আছেন। ইহাদের একজন হচ্চেন, মঠের প্রধান শিষ্য শ্রীগোপাল পাঁড়ে, আর একজন তার চাইতে অল্পবয়স্ক একটি চেলা। শ্রীগোপালের বয়স এখন প্রায় ৬০ এর কাছাকাছি। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি বলছেন "কানাই বাবাজির পরে ত গদি আপনার দখলেই আসবে।" শ্রীগোপাল যেন একটু বিমর্ষ সুরে বল্লেন, "কানাই বাবাজির শরীর ত দেখছ। বয়স বেশী হ'লে কি হয়? আমি তাঁর ঢের আগেই এলোক হ'তে স'রে পড়ব। ফিরে জন্মে যদি গদি লাভ করতে পারি, এজন্মে কোন আশাই নাই।"

এরপর দুইজনই চুপ হয়ে গেলেন।

কানাই বাবাজি শুয়ে শুয়ে ভাব্‌তে লাগলেন, "তবে তো আমি গোপাল পাঁড়ের আশা-ভঙ্গের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছি। এ ঠিকনয়, আমি যশোমাধব মঠ হ'তে আপততঃ ছুটি নেব। যদি টাকা ও মঠের উপর বিন্দুমাত্র ও লোভ থাকে, তবে আর ত্যাগ কি হ'ল।"

"কিন্তু হঠাৎ পরদিনই চলে গেলে গোপাল পাঁড়ে ভাব্‌তে পারেন আমি তাঁর কথা শুনে ফেলেছি। ৭।৮ দিন থাকিব, তার পরে অভীষ্ট পথ অবলম্বন করব্‌।"

৭।৮ দিন পরে মহান্তজি পাঁড়েকে ডেকে বল্লেন, "আমি নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে পরিশ্রান্ত হ'য়েছি, অথচ এখানে থাক্‌লে কর্ম্মের ডাকে সাড়া না দিয়ে পার্‌ব না। আমি আপাততঃ সিন্দুর-তলা গ্রামে চল্লুম, সেখানে মাথা রাখ্‌বার মতন একটি কুঁড়ে আছে ও আমাদের মঠের একটু জমি আছে, সেইখানে বিশ্রাম কর্‌ব। তুমি এই মঠের ভার গ্রহণ কর।"

গোপাল পাঁড়ে প্রথমতঃ নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা কর্‌তে সুরু করে দিলেন। কিন্তু মহান্ত তাঁকে বল্লেন, "এতদিন ধরে রাধানন্দ স্বামির সংযম, দাদার ধর্ম্ম-বিশ্বাস দেখে দেখেও মঠের উদ্দেশ্য সাধন কর্‌তে যদি অযোগ্য থেকে থাকে, তবে এই গদির যে কি দশা হবে, তা বুঝতে পারি না। তুমি কঠোর কর্ত্তব্যশীল ব্যক্তি, তোমার কাজ দেখে লোকে আমার অযোগ্যতা ভাল ক'রে বুঝ্‌বে; তা আমি বুঝ তে পেরেছি।"

যাওয়ার দিন ঠিক হ'ল। কিন্তু পাঁড়েজি রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাব্‌লেন—"কানাই বাবার হঠাৎ মনের এ ভাব হ'ল কেন? কোন ব্যারাম পীড়া হয় নাই, কয়েক দিন আগেও মস্ত বড় কাজের

তালিকা করেছেন। এই বিরাগ ও শ্রমজনিত অবসাদটা নিতান্ত হঠাৎ এসেছে ব'লে বোধ হয়।"

কিন্তু চটক'রে সেই সময় তাঁর মাথায় একটা সন্দেহ ঢুকল, তাতে তিনি এতটা আকুল হয়ে পড়লেন যে কপাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম বেরুতে লাগল।

তিনি ভাবলেন, সেদিন যে মঠের একটি শিষ্যের কাছে তিনি গদি সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য বলেছেন, তাতো মহান্তজি শুনে ফেলেন নি? সন্ধ্যাকালে ত তিনি মাঁঝে মাঝে পাশের ঘরের চৌপায়াটার উপর শুয়ে বিশ্রাম করেন, সেদিন আমার খেয়াল ছিল না, ও ঘরে তো তখন তিনি ছিলেন না? সেটা কি বার? আজ হচ্চে বৃহস্পতিবার, বুধবার, মঙ্গলবার, সোমবার। সেদিন নিশ্চয়ই সোমবার ছিল, সেদিন যাদু-গোপালের কীর্ত্তন হবার কথা ছিল—সে নিশ্চয়ই সোমবার। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়ে তিনি জনার্দ্দন চাকরকে ডাকলেন, এবং বল্লেন, "যাদু কীর্ত্তনীয়ার যে দিন গান হবার কথা ছিল, সে কোন বার?" জনার্দ্দন ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে বল্লে সে সোমবার।"

"সেদিন সন্ধ্যাবেলা মহান্তজি কোথায় ছিলেন?"

"সে দিন ত সন্ধ্যাবেলা মহান্ত মহারাজ রামধন বড়িওয়ালার হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে আমার পাশ দিয়ে ঐ ঘরটায় ঢুকে চৌপায়াটার উপর শুয়েছিলেন। অনেকক্ষণ শুয়ে ছিলেন, ৪।৫ ঘণ্টা হবেক্। অসুখ টসুখ হ'য়েছিল হয়ত। তা হবেই তো, রাত নাই, দিন নাই, রোগীদের জন্য যেরূপ খাঁটেন, খাওয়ার মধ্যে ত একবেলা সিদ্ধ পোড়া রুটি ভাত, পাঁচ বছরের শিশুও ওঁর চাইতে বেশী খায়।"

"আচ্ছা সেদিন সেই সময় আমরা কোথায় ছিলেম?"

"আপনি ও শোভালাল পণ্ডিতজি ঐ পাশের ঘরে গল্প কচ্ছিলেন।"

জনার্দ্দন চাকরকে বিদায় করে দিয়ে গোপাল পাঁড়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়্লেন। "হায় আমিই বাবাজিকে মঠ হ'তে তাড়ালেম! যিনি মঠের এই বিপুল আয়ের কয়েকটি কপর্দ্দক মাত্র নিজের খাওয়ার জন্য খরচ করেন,—বহু পুরাতন একটা গুধরি ও নিজ পিতামাতার একটা লোটা ছাড়া যাঁর অন্য কোন সম্বল নেই, যিনি অনাথের প্রতিপালক, দীন-দুঃখীর পিতামাতা, বিপদে সকলের সম-বন্ধু, যাঁর তুল্য সাধু আমরা কেউ দেখি নাই, যিনি নিজে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আতুরকে বুকে চেপে ধরে তাকে জল হ'তে রক্ষা ক'রে নিয়ে আসেন, যিনি কারু দুঃখের কথা শুনলে প্রাণ দিয়ে তার দুঃখ দূর করতে উৎসাহী হন, মায়ের কষ্ট দেখ্লে, শিশুর রোগক্লিষ্ট মুখ দেখ্লে, অনশনগ্রস্ত দরিদ্রের বুকের হাড় দেখ্লে ডান হাত দিয়ে কেবলই চক্ষু মুছ্তে থাকেন,—যাঁকে আমরা এই ৩০।৪০ বৎসরের মধ্যে রাগ্তে দেখি নাই, কেউ ক্রুদ্ধ হ'লে যিনি সজল চক্ষে তার হাত দুটি বুকের মধ্যে চেপে রেখে মিনতি কর্তে থাকেন, সেই দেবতুল্য বাবাজিকে আমি মঠ ছাড়া করলুম। হঠাৎ কি কথা মুখ দিয়ে বেরুল, আমি তাঁর পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব—তাঁকে এখান থেকে যেতে দিব না।"

পরদিন সকালবেলা মহান্তজির ঘরে চাপা কান্নার একটা স্বর শুনে সকলে যেয়ে দেখ্লে, পাঁড়ে কানাই বাবাজির পায়ে পড়ে কাঁদ্ছেন। বাবাজির ও চোখ আর্দ্র হ'য়েছে। তিনি বল্ছেন "গোপাল, কিছু মনে করি নাই, প্রথম যখন শুনেছিলুম তখন মঠের প্রতি বিরাগ হ'য়েছিল, এখন আর কিছু মাত্র নেই। তবে যাওয়া স্থির করেছি, এখন বাধা দিওনা, যখন দরকার বোধ করব, আস্‌ব। তুমি কেঁদনা, তোমার কান্না দেখ্লে আমার কষ্ট হয়, দেখ দেখি কতটা আসক্তি আমার এসে পড়েছে।"

পাঁড়েজি তার পায়ে প'ড়ে কেবলই বলছেন—"আমার মুখ দিয়ে হঠাৎ কি বেরিয়ে গেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি বিষ খেতে পারি, আমার জন্য মঠ ছেড়ে যেওনা, পায়ে পড়ি।"

কিন্তু কানাই বাবাজি সব ঠিক ক'রে ফেলেছিলেন. তিনি পাঁড়ের হাত দুখানি নিজ বুকের কাছে টেনে এনে বল্লেন, "আমায় প্রসন্ন চিত্তে বিদায় দাও, তুমি যদি সত্যি কোন দরকার বোধ কর, তবে আমাকে লিখ,—আমি ফের আসব।"

পাঁড়েজি বল্লেন, "তোমার মঠের আয় সমস্তই তোমার সঙ্গে যাবে, আমাকে যা পাঠাবে, শুধু তাই এখানে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করব।"

বাবাজি বল্লেন, "সত্যি বল্‌ছি, ভাই, আমি কয়েকটা দিন দূরে থাকতে চাই, যদি আমার দরকার হয় তবে তোমাকে টাকার জন্য লিখ্‌ব।"

প্রায় বৎসর ঘুরে এল, এর মধ্যে কানাই বাবা বৃন্দাবনে ফেরেন নাই এবং কোন টাকা পয়সাও চেয়ে পাঠান নাই, শ্রীগোপাল পাঁড়ে তাই নলিন পাণ্ডাকে তাঁর খোঁজ নিতে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

পরদিন যখন বাবাজি গোসাই প্রভুর বাড়ী হ'তে ফিরেছেন, তখন দেবেশ চোরটির মত নলিন পণ্ডিতকে নিয়ে এসে অনুতপ্ত চোখে তাঁর দিকে চেয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

নলিন বাবাজিকে প্রণাম ক'রে একখানি চিঠি দিল। বাবাজি বল্লেন—"লাখ টাকা পাঠাতে চাচ্ছে! সে টাকা দিয়ে আমি কি করব? আমি তো বলে এসেছি, নলিন, আমি টাকার দরকার হ'লে যেয়ে চিঠি লিখ্‌ব, শ্রীগোপালকে বলো আমি বেশ ভাল আছি। মঠের কাজ এখন কেমন চল্‌ছে?"

নলিন···"মহারাজ, শ্রীগোপাল পাঁড়েজি বড় কঠোর কচ্ছেন। আপনি আসার পর থেকে তিনি আপনার মতই এক সন্ধ্যা একমুষ্টি অন্ন আহার করেন, পর্ব্বোপলক্ষে প্রায়ই উপোস করেন, এবং সর্ব্বদা আপনার কথা বলে অশ্রুপাত করেন। তিনি শুকিয়ে কঙ্কাল-সার হয়েছেন এবং ধর্ম্মকার্য্য-গুলির সম্পাদন কালে নিতান্ত ছোট চাকর-বাকরদের হের কাজ নিজে করেন। "তিনি গরীব দুঃখীর ভার নিয়েছিলেন, আমি নিজেকে-গরীব দুঃখীর মতন না তৈরী করলে তাদের দুঃখ বুঝ্‌ব কি ক'রে? তাদের ভার নেব কি ক'রে? মহান্তজি এখন থেকে আমায় ফকিরী দিয়ে গিয়েছেন, তিনি যতদিন না আস্‌বেন, ততদিন আমায় এই ভাবেই চল্‌তে হবে।" শীতের রাত্রিশেষে যমুনায় স্নানক'রে যতি-ধর্ম্ম পালন করেন, এবং ভয়ানক ঠাণ্ডায় ও বহির্ব্বাস ব্যবহার করেন না। "কত দীন দুঃখীর পরিবার নেংটী জোটেনা, তাদের কাছে বাস ক'রে আমি বহির্ব্বাস দিয়ে শীত নিবারণ করব কি ক'রে? কুক্ষণে মুখ দিয়ে কি

বের হয়েছিল, দাদা মহারাজকে ব'লো আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করছি। তিনি যতদিন না আসবেন, ততদিন প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।"

বাবাজির গণ্ড বেয়ে জলধারা পড়তে লাগল। তিনি বল্লেন, "তাকে ব'লো, আমি যাব। এরূপ করে সে ম'রে যাবে যে?"

"তাঁর চেহারা এমনই হ'য়েছে, যে আপনি এখন চিনতে পারবেন কি না সন্দেহ, মঠের সকল লোক তাঁর দুঃখে দুঃখী, এবং আপনি ফিরে যান, ব্যাকুলভাবে এই প্রতীক্ষায় আছে!"

বাবাজি বল্লেন, "তাকে ব'লো আমি মঠে ফিরে যাব, টাকার দরকার হ'লেই চেয়ে পাঠাব। আমাকে যদি সে মঠের মহান্ত ব'লে মান্য করে, তবে আমার কথা অবশ্য তাকে মানতে হবে। ব'লো আমি তাকে দুসন্ধ্যা খেতে বলেছি, শেষরাত্রে যমুনায় স্নান নিষেধ করেছি, গায়ে বহির্ব্বাস রাখতে অনুরোধ করেছি, আমার কথা না শুনলে আমি ভগবানের কাছে অপরাধী হব। আমার মঠ ছেড়ে আসার দরুণ যদি তার এত কষ্ট হয়ে থাকে—তবে সে অপরাধ আমার। তাকে ব'লো দাদার পাপের ভরা এমনই খুব মস্ত, তার উপর যেন আর না চাপায়। ব'লো আমি তার হাত ধ'রে অনুনয় কচ্ছি, তাকে আশীর্ব্বাদ ক'রে অনুনয় কচ্ছি, আমার কথা যদি সে শোনে, তবে আমি শান্তিতে থাকব, এই স্বার্থের জন্য অনুনয় কচ্ছি—সে যেন পূর্ব্বের মতন থাকে—আমি তো সর্ব্বদাই মঠের বাইরে থেকেছি, এবারকার এই প্রবাসও সে যেন সেইরূপ মনে করে। তার মুখখানি মনে প'ড়ে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। আমি তার মঠের মহান্ত, আমি তার দাদা, ব'লো যেন আমার সে কষ্ট না দেয়।" বলতে বলতে বাবাজির কণ্ঠ গদ্‌গদ হ'য়ে এল, তিনি বামহাতে একবিন্দু অশ্রু মার্জ্জনা ক'রে বল্লেন, "তাকে আরও ব'লো—আমি আবার সেবাব্রত অবলম্বন করব, এবং

টাকার দরকার হ'লে চেয়ে পাঠাব। তার উপর যে মঠের ভার দিয়েছিলেম, তা আমি প্রত্যাহার করলেম—আমার কথা তার মানা উচিত।"

নলিন পাণ্ডা খুসী হ'য়ে বল্লে,"এই কথা শুনে পাঁড়েজির বুক জুড়োবে, মঠের সকলেই সোয়াস্তি পাবে—তার কোন সন্দেহ নাই।"

বাবাজি নলিনকে একখানি চিঠি লিখে দিলেন, সেই চিঠি নিয়ে, দেবেশের বিশেষ অনুরোধে পাণ্ডা তাঁর বাড়ীতে দুপহরের ভোজন সমাধান করতে সম্মত হ'লেন। শ্যামলেশ নিজ হাতে তাঁর পদ প্রক্ষালন ক'রে দিল, তুলসীদেবী অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞান করে অতি শুদ্ধ ভাবে তাঁর ভোজনের উপকরণ ঠিক করে দিলেন—পাণ্ডা ১২টার সময় প্রচুর উপাদেয় খাদ্যে পরিতৃপ্ত হয়ে—একখানি শীতল পাটীর উপর একটু গড়াগড়ি দেবেন এই ব'লে—এবং তাঁর রাতেই ঘুম হয় না, দিনেত কস্মিন কালেও চোখ বুজেনা এই বড়াই ক'রে, বালিশটা হেলান দেওয়া মাত্র রেলের বাঁশীর স্বর অনুকরণ করে নাক ডাকাতে সুরু করে দিলেন; তখন তাঁর গলার আওয়াজটা ও নাকের স্বরটার সঙ্গে সঙ্গত করে, এবং বুকের ওঠাপড়ার শব্দের তালের সহযোগে এমন একটা শব্দের উৎপত্তি করলে, যে কেউ চোখ বুজে সেই ত্রিবিধ সুর শুনলে ঠিক মনে করত—রেলগাড়ী খুব নিকটের কোন পথে চলেছে। বেলা ৩টার সময় পাণ্ডাজির ঘুম ভাঙ্গল, তখন তার 'অরুনিত নয়ন' মহাদেবের চক্ষুর সঙ্গে উপমিত হ'তে পারত। "তাইতো আজ বুঝি দিনের বেলায় চোখ দুটি একবার বুজেছে? তা' আপনারা এখানে যা কথা-বার্ত্তা বলেছেন—আমি সব শুনেছি—ঘুম মোটেই হয় নাই।" ইত্যাকার আশ্বাস দিয়ে রাধামাধব মন্দিরের কাছে খুব ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে, শ্যামলেশের কপালে একটু রুলি পরিয়ে দিয়ে, নাগরা

জুতো পায়ে, ব্যাণ্ডেল ই, আই, আর রেলওয়ের ৯টা রঁাচি এক্সপ্রেশ ধরবার জন্য হন্ হন্ করে ছুটলেন—প্রায় ১২ মাইল পথ মাঝে হাঁটতে হবে এবং পথে একবার গঙ্গা পার হ'তে হবে। কিন্তু যেরূপ ক্ষিপ্র-গতিতে, বড় বড় পা ফেলে, রাস্তাটার অনেকাংশই একরূপ পায় না ছুঁয়ে—নলিন পাণ্ডা চল্‌তে লাগ্‌লেন—তাতে যে তিনি ৯টার অনেক পূর্ব্বেই ব্যাণ্ডেলে পৌঁছিবেন, সে সম্বন্ধে দেবেশের কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন দেবেশ বাগানে গেছেন, বাবাজিও বাগানে ছিলেন—দেবেশের চক্ষু লজ্জায় ও অনুতাপে নত। বাবাজি বল্লেন "বাগানের প্রতি তুমি যেরূপ আসক্ত হয়েছে – তা আসক্তির ফল যা হয়, মিথ্যা সন্দেহ, মনেরম অশান্তি তা হওয়াই স্বাভাবিক! দেবেশ, এ কয়েকদিন তোমার ভাব দেখে আমি কষ্ট পেয়েছি, কিন্তু তোমার মনের অশান্তি দূর করবার আমার শক্তি ছিল না। নলিন পণ্ডিত সব কথা ফাঁক করে দিয়েছে, কিন্তু দেবেশ, আমি মঠের মহান্ত ব'লে আমাকে তোমার হৃদয়ের পর ক'রে দিওনা।"

এই বলে বাবাজি স্নেহার্দ্রভাবে দেবেশের হাত দুখানি চেপে ধর্‌লেন, দেবেশের দুই নত চক্ষু হতে অজস্র অশ্রু বাবাজির পায়ের উপর পড়্‌তে লাগ্‌ল। বাবাজি বল্লেন, "ছি! দেবেশ কাঁদতে আছে? আজ সুন্দর-গঞ্জের হাটের বার, আমি তোমার ছবির রং কিন্‌তে যাব। কিশোর রায়ের কয়খানি ছবি এখনও প্রাপ্য আছে, তুমি তা সুরু করে দেবে। আজকার হাটে রং আনা হবে, এইত কথা ছিল, কেমন? আমি এখন মাধুকরী করে উদর পূর্ত্তির চেষ্টা দেখি, বেলা ৩টার সময় বার হতে হবে। ফির্‌তে রাত্রি ৮টা হবে। তুমি আমার টাকা দিয়া যাবে।"

দেবেশ নত চোখে চাপা গলায় বল্লে—"আমি কি ব'লে আপনার

মত লোককে ২০ মাইল পথ হেঁটে মজুরী করাতে পাঠাব—এ পাপের ফলে আমার কি হবে, কে জানে ?" দেবেশের চাপা কান্না তাঁর গলাটা যেন আটকিয়ে ধরল। সে আর কিছু বল্‌তে পারলে না।

বাবাজি বল্লেন—"এপর্য্যন্ত তুমি সমস্তই দেব-লীলার ছবি এঁকেছ, কোন মানুষের ছবি আঁক নি। এমন কি যে কিশোর রায়ের দ্বারা তুমি এত উপকৃত, তার বাড়ীর লোকের অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর পর্য্যন্ত একখানি ছবি আঁক্‌তে স্বীকার কর নি। তুমি ভগবৎ-লীলা আঁকছ; এতে আমায় একটু কাজ কর্‌তে দেবে না ? তুমি এপর্য্যন্ত আমায় বড় ভাই বা পিতার ন্যায় মনে করে এসেছ,আমার নিকট কোন আব্‌দার কর্‌তে তোমার বাধে নি ! আজ আমাকে মহান্ত মহারাজ তৈরী করে—মন হ'তে তোমার স্নেহের সীমানা হ'তে একবারে তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছ, এতে আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি।"

দেবেশ এ কথার উত্তর না দিয়ে তার ট্যাঁকে ৭টা টাকা ছিল, তা' বার ক'রে বাবাজির হাতে দিয়ে বল্লেন—"আমার সকল অপরাধ মাপ কর্‌বেন, বড় ভাই যেমন ছোটর দোষ মাপ করেন, বাপ যে ভাবে ছেলের দোষ মাপ করেন, সেই ভাবে মাপ কর্‌বেন। আজ হ'তে আপনি যা' বল্‌বেন, আমি দ্বিরুক্তি না করে তা পালন কর্‌ব।"

এই বলে দেবেশ কানাইয়ের পা দুখানিতে হেঁট হয়ে প্রণাম কল্লেন এবং উদ্গত অশ্রু বাবাজি না দেখ্‌তে পান এই ভাবে বাগান হ'তে গৃহাভিমুখে রওনা হলেন।

হৃদয়েশের চেহারাটা বেশ দোহারা ছিল; এবং তিনি রোজই কুস্তি করতেন, তাতে তার পেশীগুলি বেশ স্থূল ও হাত শক্তিশালী হয়েছিল। সর্ব্বদা মুগুর ভাঁজতে ভাঁজতে হাত দু'খানি এমন শক্ত হয়েছিল যে সহসা তাঁর শরীর দেখে কেউ তা অনুমানই করতে পারত না। তিনি রোজ কুস্তিখানায় সন্ধ্যাবেলা ব্যায়াম করতেন, এবং ফিরবার মুখে রতন কবিরাজের ডিস্পেন্সরীর এক নিভৃত কক্ষে ব'সে খুব তীব্র মদের পুরো দুটি গ্লাস পান করতেন, অবশ্য কবরেজ তাঁর সঙ্গী থাকতেন, কিন্তু দ্বিতীয় প্রাণী তা জানতে পারত না।

বাড়ীতে এ সকলের আভাস কেউ জানত না। তার স্ত্রী সুমতি-দেবী জানতে পারলে বিপদের সীমা থাকবে না এবং চাকর-বাকর-দের নিকট মান হারাতে হবে—এই আশঙ্কায় ব্যাপারটা যতদূর সম্ভব তিনি গোপনেই রেখেছিলেন। দুই গ্লাস পান করে, রতন কবরেজের দেওয়া একটা চূর্ণ খেতেন—তাতে মুখের গন্ধ থাকত না।

সেদিন মাত্রাটা একটু বেশী হয়েছিল, দুই গ্লাসের জায়গায় তিন গ্লাস পান করে চোখ দুটি বেশ রাঙ্গিয়ে উঠেছিল ও মনের মধ্যে একটা উদ্দীপনার ভাব এসেছিল—এই অবস্থায় ৭৷৷০ টার সময় যখন ডিস্পেন্সরী হ'তে তিনি বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন তখন তার সঙ্গে কবুল খাঁ সর্দ্দার লাঠি হাতে আগে আগে চলেছিল। লাঠির মাথায় তিন চারটা পেতলের আংটি বাঁধা ছিল, চলার সময় তা হ'তে একটা ঝুণুঝুণু শব্দ হচ্ছিল। এমন সময় অন্ধকারে আর একজন লোক তাঁর পাশ কাটিয়ে যেতে তিনি বল্লেন "কে?" উত্তর হইল—"কি দাদা

তুমি? আমি দেবেশ"! "তুই দেবেশ। আয় তোর সঙ্গে আমার নিরালা দুটি কথা আছে।" এই বলে দেবেশের হাত ধ'রে তাঁর দাদা একটা আঁধার জায়গায় নিয়ে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন "তুই কোথা যাচ্ছিস্?"

দেবেশ..."দাদা, আমার বাগানের পথ যে এটা, তা কি ভুলে গেছ?"

হৃদয়েশ..."ভুলিনি, তোর বাগানের কোন কথাই আমি ভুলব না, —তুই ছোট লোক ক্ষেপিয়ে আমার বাড়ীতে ডাকাতি করার মতলবে ছিলি...হ্যাঁ কি না বল্।"

দেবেশ..."তুমি যা' তা' ব'কো না, মাথা বিগ্ড়ে গেছে নাকি?"

হৃদয়েশের মনে প্রতিহিংসাটা কেউটে সাপের মত ফোঁস ফোঁস কচ্ছিল, তিনি বল্লেন, "আমার মাথা বিগ্ড়েছে? তুই মনে কচ্ছিস্, আমায় জব্দ ক'রেছিস্, তুই কি ছার কীট যে আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে সাহস পাচ্ছিস্।"

দেবেশ..."দাদা তুমি বড়লোক আছ, তাই থাক, আমার কাছে ও সকল বড়াই করে কি হবে? বৌদিদির কাছে বল গিয়ে, রাজনারায়ণের নিকট বলগে। আমি তোমায় থোড়াই কেয়ার করি, আমার কাছে চোখ রাঙ্গিয়ে বড় বড় কথা ব'লো না, বল্‌ছি, বাবাজি এখুনি আস্‌বেন, রংগুলি নিয়ে আমায় বাড়ী যেতে হবে। তা না হলে হয়ত তিনি নিজেই আবার পথ হেঁটে বোঝা নিয়ে আমার বাড়ী অবধি যাবেন, পথ ছেড়ে দাও, চলে যাই, তোমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে মাথা খারাপ করবার আমার কোন দরকার নেই।"

সহসা বজ্রমুষ্টিতে হৃদয়েশ দেবেশের কণ্ঠ চেপে ধরলেন, দেবেশ আর কথা বল্‌তে পার্‌লে না। হৃদয়েশের পুঞ্জীভূত আক্রোশ তাঁর শক্ত হাতে মারাত্মক শক্তি প্রদান করলে এবং মদের নেশার উত্তে-

জনায় তিনি ব্যাঘ্রবৎ জোর:মুষ্টিতে কণ্ঠ চেপে ধরলেন। মুহূর্তের মধ্যে দেবেশ ভূমিশায়ী হ'ল। এরমধ্যে কবুলখাঁ দূরে ছিল, সে একটা বিপরীত কাণ্ড কিছু হয়েছে—এটা অনুমানে বুঝে দৌড়িয়ে তথায় এল। তখন হৃদয়েশ ভেয়ের গলাটা ছেড়ে দিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছিলেন—তখনও যেন রাগ যায়নি। কবুলখাঁ দেবেশকে নেড়েচেড়ে নাকে হাত দিয়ে দেখে বল্লে—"বাবু, করেছেন কি? একেবারে সাবাড় ক'রে ফেলেছেন—দেহে প্রাণ নাই।"

হৃদয়েশ একটু চম্‌কে উঠে বল্লে, "প্রাণ নাই, ঘাখ্‌ ত ভাল করে, একবারে মরেছে নাকি?"

কবুলখাঁ—"একবারে ঠাণ্ডা।"

হৃদয়েশের তখন নেশা ছুটে গেছে, তিনি দেবেশের ডান হাত, ধরে টিপে নাড়ী পেলেন না। গলাটায় হাত দিয়ে দেখলেন গলার হাড় যেন ভেঙ্গে গেছে, নাকে হাত দিয়ে নিশ্বাস পেলেন না।

এমন সময় বাবাজি উপস্থিত, এটি হচ্ছে বাগানের পথ। তিনি দূর হ'তে দুটি লোকের ফিস্ ফাস্ কথা শুনে, একটু দাঁড়লেন। ঐ দুটি লোকের আলাপ তার কাছে কিছু সন্দেহাত্মক মনে হ'ল।

হৃদয়েশের মনে একটা বিষম ভয় হ'য়েছে, কিন্তু তা' চেপে রেখে তিনি কবুলখাঁকে বল্লেন "মরেছে তো কি হয়েছে? জমিদার-বাড়ীতে বছরে এরূপ দু একটা খুন হ'য়ে থাকে। কবুলখাঁ জানিস্ না, মায়ের পেটের ভাইয়ের মত শত্রু কেউ নাই। তুই শীঘ্র রজ্জবালিকে ডেকে নিয়ে আয়,—ঘোষদের জঙ্গলে লাসটা নিয়ে গিয়ে সেইখানে পুঁতে রেখে আয়, গর্ত্তটা বড় করে করিস্, শেয়ালে যেন বার না করে, কেউ জানতে পারলে তোর আমার দুই জনেরই সমান বিপদ, কারণ

তুই তো আমার সঙ্গে ছিলি। আমি এখানে আর থাকব না তুই মড়াটা শীঘ্র নিয়ে যা।"

রজ্জবালি কবুলখাঁর সহোদর। সর্দ্দারেরও মুখ শুকিয়ে গেছল, "কর্ত্তা আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি। এ পাঁচ মিনিট কি লাস্ এখানে একা পড়ে থাক্‌বে?"

হৃদয়েশ···"চ, আমরা দুজনে ধরাধরি ক'রে রাস্তা থেকে একটু সরিয়ে রেখে যাই। কাপড় মুড়ি দিয়ে রেখে যাই, ৫ মিনিটের মধ্যে শেয়াল আসবে না, বরং কাপড়ে গা ঢেকে কেউ শুয়ে আছে মনে ক'রে তারা দূরে পালিয়ে যাবে।"

"আচ্ছা কর্ত্তা, লাসের কাছে আপনার থাকাটাও ভালনয়, আপনি বাড়ী যান, আমি রজ্জাকে নিয়ে শীঘ্র এসে ঘোষদের জঙ্গলে পুঁতে রেখে আস্‌ব, আপনি নিশ্চিন্ত হউন।"

হৃদয়েশ···"দেখিস্, মাটী খুঁড়তে একটা শাবল নিয়ে যেতে ভুলিস্ না, আর ঐ ঝুণঝুণ করা লাঠিটা বাড়ী রেখে যাস্।'

এই উপদেশ দিয়ে হৃদয়েশ চঞ্চল ভাবে বাড়ীমুখে চলে গেলেন ও কবুলখাঁ রজ্জবআলির খোঁজে নিজ বাড়ীর দিকে রওনা হ'ল।

বাবাজি বুঝ্‌লেন দেবেশ খুন হয়েছে, তখন অবিলম্বে তার দেহটা নিজ কাঁধের উপর ফেলে এবং রং-এর বোঝাটা মাথায় কোরে তিনি বাগানের দিকে চলে গেলেন।

———

(২৩)

বাগানে গিয়ে রং‌এর বোঝাটা ঘরে রেখে, মা যেমন ঘুমন্ত শিশুটি কাঁধে ফেলে অতি ধীরে চলে যান, সেই ভাবে পথে যেতে লাগ্‌লেন। বাবাজির ঘন ঘন নিশ্বাস পড়্‌ছে, এমন কষ্ট ত বাবাজির শৈশবাতীতে কখনও পাননি, তিনি বিষয়-নির্লিপ্ত আসক্তি শূন্য সন্ন্যাসী—একি দুঃখ পাষাণের মত বুকে চেপে ধর্‌ল, এক ফোঁটা জল চোখ থেকে বেরুচ্ছে না, বাবাজি কেবল মৃদুস্বরে বল্‌ছেন "হরি হরি।"

পথে একটা শিবমন্দির ছিল। তার ভেতর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দিনে একবার একজন পুরোহিত এসে শিবলিঙ্গের মস্তকে ফুল বেল-পাতা চড়িয়ে, একটা নৈবেদ্য নিবেদন করে, সেটি গামছায় বেঁধে মন্দিরে শিকল এঁটে চলে যেতেন। তারপর দিন আবার যথা সময় এসে ঠিক সেই ভাবে পূজা সারতেন। তখন জোছনা উঠেছে, একটা পুকুর পাড়ে মন্দিরটি, বাবাজি সেই শেকলটি খুলে দেবেশের দেহ নিয়ে মন্দিরের ভেতর ঢুক্‌লেন।

মন্দিরে ঢুকে দোরে খিল আটকালেন, তরপর দক্ষিণের ও উত্তরের জানলা দুটি খুলে দিয়ে, একটা মোমবাতি জ্বেলে দেবেশের দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করতে লাগ্‌লেন। কান পেতে শুন্‌লেন, বুকের ওঠা পড়ার কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না। হাতের কব্‌জি থেকে বাহুমূল পর্য্যন্ত পরীক্ষা করে দেখ্‌লেন, নাড়ীর অস্তিত্ব কিছু মাত্র টের পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্বাস চল্‌ছে কি না—খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত কাপড়খানি নাকের কাছে নিয়ে দেখ্‌লেন, কাপড় নড়্‌ছে না। তখন খানিকটা মাথায় হাত দিয়ে হতাশ হয়ে ব'সে রইলেন।

তারপর নিজের ছোট কাপড়টি ছিঁড়ে কয়েকটি সুতো বার করলেন। সেই সুতোগুলি নাকের কাছে রেখে দেখ্‌লেন যেন একবার এক-গাছি সুতো নড়্‌ছে, তারপর খানিক পরে আর একবার নড়্‌ল। বাবাজির মুখে চোখে একটা প্রসন্নতার ভাব দেখা দিল। তিনি দেবেশের হাত দুখানি ধরে বুকের কাছে বসে আস্তে আস্তে সেই হাত দুখানি উঠিয়ে আবার নামাতে লেগে গেলেন। উপুড় হয়ে পড়ে দেবেশের মুখে ফুঁ দিতে লাগ্‌লেন, প্রায় ১৫ মিনিটকাল এরূপ করলে, দেখা গেল, দেবেশের নিশ্বাস ধীরে ধীরে একটু বইছে; তিনি কৃত্রিম ভাবে নিশ্বাস চালাইবার চেষ্টায় বিরত হ'লেন না। আরও ১৫ মিনিট পরে দেখা গেল, দেবেশের চৈতন্য হয় নাই, কিন্তু সে যে জীবিত তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

তখন বাবাজি আস্তে আস্তে দেবেশের গলায় হাত বুলিয়ে দেখ্‌-লেন, গলনলীর উপর গাড়ীর জোয়ালের মত যে একখানি হাড় থাকে, তা একবারে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে গেছে। "কি শক্ত আঘাতই এই হাড়টার উপর পড়েছিল! কারু হাত কি এত শক্ত হতে পারে, যে এই হাড়খানি তার চাপে ভেঙ্গে পড়্‌তে পারে? হৃদয়েশের হাত কি চাষাদের হাতের চাইতেও শক্ত।" বাবাজি এবার কিছু ভাবিত হ'য়ে পড়্‌লেন, দেবেশ বেঁচে উঠতে পারে কিন্তু এই হাড়-খানি জোড়া না দিলে তো অনাহারে এর প্রাণ যাবে! অতি তরল জিনিষ হয়ত কষ্টে খাওয়ান যেতে পারে, কিন্তু হাড়খানি যে ভাবে ভেঙ্গেছে—তাতে বড় জোর তিন দিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে, তারপর অনাহারে ও হৃদ্‌পিণ্ডের দুর্ব্বলতায় মারা যাওয়ার সম্ভব।" এবার বাবাজি বিমর্ষ হ'য়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন!

একবার মাত্র কাতরস্বরে অতি মৃদুভাবে বল্লেন "হায় দেবেশ, এই আশঙ্কাই ত আমি তোমাকে বাগানটা বিক্রয় কর্‌তে বলেছিলেম।"

বিশ সেকেণ্ড কাল পর্য্যন্ত বাবাজি চুপ করে থেকে উঠে দাঁড়ালেন, দক্ষিণ-দিকের জানালাটার দিকে দেবেশের মাথাটি আস্তে ঘুরিয়ে নিয়ে দুইখানি ইট পাশাপাশি রেখে নিজের পরিধেয়ের কতকাংশ ও বহির্ব্বাসটি খুলে ইট দুখানি মুড়ে বালিশের মত কর্‌লেন। তারপর পুনরায় নিশ্বাস পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লেন এবং খানিকটা নাড়ী ধরে বসে রইলেন, এখন তাঁর প্রতীতি হ'ল, দেবেশের নিশ্বাস খুব সূক্ষ্মভাবে হ'লেও বেশ চল্‌ছে, ও নাড়ীটা যদিও মাঝে মাঝে পাওয়া যায় না, তবু বাহুমূলের দিকে খানিক খানিক ধিকি ধিকি বইছে।

দেবেশের কাপড়ের খানিকটা ছিঁড়ে তা তার গায়ের উপর ঢাকা দিলেন এবং উত্তরের দিকের জানেলার একপাটি বন্ধ করে বাতিটা নিবিয়ে ফেলে বাহিরে এসে দরজাটা শিকল আটকিয়ে বন্ধ কর্‌লেন।

তারপর অতি দ্রুত একটা রাস্তা ধোরে গিয়ে তিনি একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে, সঙ্গিন-হস্ত পাহারাওয়ালাকে বল্লেন "রাজাবাবু বাড়ী আছেন!"

সেই পাহারাওয়ালার কাছে তকমা-পরা পোষাক আঁটা আরও-কয়েকজন সেপাই ছিল, তারা কাছে ঘনিয়ে এসে বল্লে "রাজাবাবুর কাছে রাত্রি পৌণে দশটার সময় ভিক্ চাইতে এসেছ বুঝি! আস্পর্দ্ধা ত কম নয় দেখ্‌ছি ভিখারীর।"

একজন একটা সঙ্গীনের ডগাটা দিয়ে বাবাজির পেটে খোঁচা মারবার অভিনয় করে বল্লে, ভুঁড়িটা এখনই বার করে ফেল্‌ব।"

বাবাজি বল্লেন, "আমি ভিখারী হলেও এখন ভিক্ চাইতে আসি নাই—আমার তাঁর সঙ্গে জরুরী কাজ আছে।" একটা দরোয়ান

বল্লে, "রাজাবাবু সাড়ে নয়টার পর শুতে যান, এখন হয় ত ঘুমুচ্ছেন। তোমার যদি তেমন জরুরী কাজ থাকে তবে এক ক্রোশ দূরে কায়েৎ পাড়ায় দেওয়ানজি থাকেন—তাঁর কাছে এত্তেলা দাওগে, এই মাত্র তিনি রাজবাড়ী হ'তে চলে গেলেন।"

আর আর দরোয়ানেরা বল্লে, "এই পাগলা ভিখারীটার সঙ্গে কি বক্‌ছিস্।" রামলাল দরোয়ান তখন তামাক পাতার গুঁড়ো ডান হাতে নিয়ে আর একহাতে খানিকটা চুন ফেলে দিয়ে খুব্ টিপতে টিপতে গান ধর্‌লে—"অম্বা তারে, বম্বা তারে, সুজন কষাই। হরিভজকের গণিকা তারে, তারে মীরাবাই। হরি চরণে মন লাগি রহু।"

এত কষ্ট সত্বেও সেই গান শুনে বাবাজির একবিন্দু ভক্তির অশ্রু পড়ল। বাবাজি তবু দাঁড়িয়ে আছেন দেখে একটা তকমাপরা খোট্টা বল্লে, "ঐ যে তেতালার উপর ঘর দেখ্‌ছ, সামনের দিকে বারাণ্ডা বড় বড় থাম, ঐ ঘরটায় রাজাবাবু থাকেন, এখন লাট সাহেব্ এলেও তিনি ওখান থেকে নাম্‌বেন না—যাও ভাগ।"

বাবাজি সত্য সত্যই এবার ভেঙে পড়লেন; বুঝ্‌লেন এ মঠের মহান্তের বাড়ী আসেন নি, যেখানে রাতদিন গরীব দুঃখীর জন্য দরজা খোলা থাক্‌বে। অথচ কিশোর রায়ের সঙ্গে দেখা না কর্‌লেই নয়, কি করে তা হ'তে পারে?

যে দিকে সেই বৃহৎ প্রাসাদের ত্রিতল গৃহের থামের পাশ হ'তে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বল্‌ছে—তিনি সেইদিকে চলে গেলেন, দেখলেন ৭ ফিট্ উঁচু প্রাচীর বাড়ীর চার দিকটা ঘিরে রেখেছে। তিনি কিশোর রায়ের শোবার ঘর হইতে প্রাচীরের যে অংশটা অদূরবর্ত্তী, তথায় গিয়ে একটা বৃহত বাপীর জ্যোৎস্না বিধৌত সোপানাবলির ঊর্দ্ধে মার্ব্বেলের চাতালে বসে পড়্‌লেন,

তখন ঝুরু ঝুরু বায়ু বইছে—শ্রাবণের মেঘে মাঝে মাঝে চাঁদকে ঢেকে ফেল্‌ছে।

বাবাজি গলা ছেড়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে গাইতে লাগ্‌লেন,—

আমি পরাণ নাথেরে স্বপনে দেখিলাম,
সে যে বসিয়া—শিয়র পাশে।
নাসার বেশর পরশ করিয়ে—ঈষৎ মধুর হাসে
কিবা রজনী শাঙন ঘন ঘন দেওয়া গরজন,
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে, বিগলিত চির অঙ্গে
আমি নিদ যাই মনের হরিষে
শিখরে শিখণ্ডী রোল, মত্ত দাদুরী বোল
কোকিলা ডাকিছে কুতূহলে।
ঝিঁ ঝিঁ ঝিঁ ঝিনিকি ঝাঁজে, ডাহুকী সে গরজে।
আমি স্বপন দেখনু সেই কালে।
আমার মরমে পেঠল লেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ
আমার শ্রবণে পশিল সেই বাণী।
দেখিয়ে তাহার রীত, যে করে আমার চিত
কি করিব কুলের কামিনী।
কৃষ্ণ অঙ্গ পরিমল, সুগন্ধি চন্দন
কুঙ্কুম কস্তরী পারা
পরশ করিতে রস উপজল
জাগিয়ে হইনু হারা।"

চণ্ডী দাসের এই পদটি বেদনা-কম্পিত স্বরে তিনি গাইতে লাগলেন, একেত তার মত কীর্ত্তন গাইতে খুব কম লোকই পারতো, তার উপর

নিদারুণ দুঃখে তার সুরটা করুণ-কোমল হ'য়ে গেছে—তাঁর মত্ত ভক্তির আবেশে যেন কৃষ্ণের সত্যই সেখানে আবির্ভাব হ'ল, শাওনের রাত্রিতে যেন কৃষ্ণ সত্যই এসে নাসিকার অলঙ্কার ছুঁয়ে হাস্‌তে লাগলেন। তাঁর মন ভুলালো সুরে যেন কান ভরে গেল, তার দেহ স্পর্শে যেন সত্যই হৃদয় আনন্দে কাঁপ্‌তে লাগল,—তার পর তাঁর অঙ্গ গন্ধ, চন্দন-কস্তুরীর চাইতেও কোমল গন্ধে দিক্ আমোদিত হয়ে উঠল, এমন সময় ঘুমভেঙ্গে গেল, কৃষ্ণ-সঙ্গ হারা হ'য়ে রাই কাঁদতে লাগ্‌লেন।

বাবাজির কণ্ঠ স্বরে বায়ুমণ্ডল কম্পিত হ'য়ে উঠল। মেঘগুলি যেন করুণ অশ্রুধারা বর্ষণ কর্‌তে উদ্যত হ'ল। সেই সুর-লহরী জ্ঞানদায়িনী দেবীর কর্ণে প্রবেশ করে তাঁকে একবারে উন্মনা করে ফেল্লে। তিনি নিজেও কীর্ত্তন গাইতে পার্‌তেন—কিন্তু এমন সুর তো তিনি কখনও শোনেন নি, একি মানুষের না কিন্নরের কণ্ঠ? কে এই গান কচ্ছেন? তার বাড়ীর কাছে কোন যুবক কি প্রেমের ভরা বুকে ক'রে এমন মধুর কণ্ঠে গান কচ্ছেন? তার রূপ কেমন? যাঁর কণ্ঠস্বর এত সুন্দর, তাঁর মূর্ত্তিটা যেন কেমন সুমোহন! জ্ঞানদায়িনী কৌতূহলে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগ্‌লেন, তার পর পূর্ব্বদিকের জানালাটা খুলে একটা সার্চলাইট হাতে করে তিনি পুকুরের দিকে ফেলে দিলেন। তারপর ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু খানি হেসে, তাঁর নিদ্রিত স্বামীকে ঠেলে জাগালেন, "একটা বুড় মানুষ কেমন সুন্দর কীর্ত্তন গাচ্ছে শোন।" কিশোর রায় ধড় ফড় করে উঠে সেই "রজনী শাওন ঘন ঘন দেওয়া গরজন" শুনলেন। এ যে বাবাজির কণ্ঠস্বর—এই গানটি তাঁর মুখে আমি প্রথম শুনেছিলেন—তদবধি যে এই সুর আমার প্রাণে গাঁথা আছে, এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে তিনি তিলমাত্র বিলম্ব না করে নীচে নাম্‌তে গেলেন, একতলায় পৌছামাত্র নকিব ফুকারে উঠল, "রাজা বাবু যাতা হ্যায় 'খবরদার' দরোয়ানেরা ছোট ছোট ইলেক্‌ট্রিক্‌ল্যাম্প নিয়ে রাজা বাবুর

পেছনে পেছনে চল্লে। তিনি বাপীতীরে এসে দেখেন বাবাজি তখনও তন্ময় হ'য়ে গাচ্ছেন, "অঙ্গ-পরিমল সুগন্ধি চন্দন কুঙ্কুম-কস্তুরী পারা।"

বাবাজি নগ্নদেহ, শ্রাবণের মেঘ-শীতল বায়ু বাপী-নীরে আর্দ্র হ'য়ে তাঁর দেহ স্পর্শ কচ্ছে। তিনি তন্ময় হয়ে ভক্তি গদ্ গদ্‌কণ্ঠে গাচ্ছেন. কিশোর রায় এসে তাঁর পাশে বস্‌লেন এবং আস্তে তাঁর পায় হাত দিলেন। লোকজন অবাক্ হয়ে গেল ও সঙ্গিন হাতে একটা সেপাই ভয়ে জড় সড় হ'ল। সে তার সঙ্গিনের খোঁচাদিয়ে এই লোকটার ভুঁড়িতে ছেঁদা করতে চেয়ে ছিল,—তার সেই কথা এখনই রাজাবাবুর কাণে উঠ্‌বে।

কিশোর রায় বাবাজির পেছন দিকে বসেছিলেন, সুতরাং তাঁর আগমন তিনি টের পান্‌নি। এখন পায়ে হাত পড়াতে চেয়ে কিশোর রায়কে দেখে তখনই গানবন্ধ করে কথা বল্‌তে সুরু করলেন। কিশোর রায় বল্লেন, "গানটি শেষ হ'ক তারপর কথা হবে, এমন অপূর্ব্ব আনন্দ অর্দ্ধ-সমাপ্ত রাখবেন না।"

বাবাজি বল্লেন "আমি একটু দরকারে এসেছি, এত রাত্রে তোমার সঙ্গে দেখা হবার সুবিধে হবে না, এজন্য গান গেয়ে তোমাকে ধরব, তাই গাইতে বসে গেছলাম। তুমি প্রথম আমার মুখে যে গানটি শুনেছিলে এবং যখন তখন সেটি গাইতে অনুরোধ ক'রে থাক, সেইটি গাচ্ছিলাম—তোমাকে শিগ্‌গীর পাবার জন্য। এখন আমার সময় নেই, তুমি নিরালায় আমার দুটি কথা এসে শোন।"

লোকজন দূরে সরে গেল। বাবাজি আর্ত্তকণ্ঠে সকল কথা বলে শেষে বল্লেন, "হরিদ্বারে সূর্য্যকুণ্ড হ'তে দুক্রোশ দূরে সপ্ত-স্রোতার পাড়ে একরূপ লতা জন্মে—তা ছিঁড়ে তখন—তখনই যদি সেই রস মাখাইয়া দেওয়া যায়, তবে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগ্‌বে। ডাক্তারা এসে যদি কাটা ছেঁড়া ক'রে কিম্বা জোর ক'রে

হাড়ের টুকরাগুলি একত্র করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়, তবে দেবেশ হয় ত ম'রে যেতে পারে; তার হৃদ্‌পিণ্ডের গতি এত ক্ষীণ, যে কোনরূপ জোর জবরদস্তি কর্‌লে, তখনই প্রাণ যাওয়ার খুব সম্ভাবনা আছে। হরিদ্বারে ওকে নিয়ে যাওয়া ছাড়া আর উপায় দেখ্‌ছি না। এ ভাবে বড় জোর তিনটা দিন ওর জীবন রাখ্‌তে পারা যেতে পারে। ঔষধ টাট্‌কা চাই সেখান থেকে আন্‌লে চল্‌বে না। আজই ওকে নিয়ে যেতে হবে। 'হাইওয়েড' হাড়খানি একেবারে ভেঙ্গে গেছে।

কিশোর রায় দেবেশকে খুব ভালবাস্‌তেন। তিনি ঘটনাটি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হ'য়ে বল্লেন—"এখন প্রায় দশটার কাছাকাছি, এখান থেকে ব্যাণ্ডেলে মটর যেতে ঠিক আধঘণ্টা লাগ্‌বে, মেল বা এক্সপ্রেস পাওয়া যাবে না, প্যাসেঞ্জারে যেতে হবে।" একটি সেপাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "ত্যাখ্‌তো, কটা বেজেছে" এবং টাইম টেবেল্‌খানি আন্‌তে আদেশ কল্লেন। সেপাই তার নিকেলের রিষ্ট ওয়াচ দেখে বল্লে "হুজুর, দশটা বাজ্‌তে ১৫ মিনিট বাকি।" টাইমটেবেল্‌ দেখে জানা গেল ১১টা ৪৫এ একটা ট্রেণ আছে। তখন কিশোর রায় তাঁর বড় মটরখানি প্রস্তুত কর্‌তে আদেশ করে, দুইজন বিশ্বস্ত সেপাইকে একটা ভাল ষ্টোভ, কিছু মকরধ্বজ এবং দুই একটা টনিক ঔষধ দিয়ে, একখানি খুব ভাল সিল্কে মোড়া ইন্‌ভ্যালিড্‌ চেয়ার ও কতকগুলি ধোয়া কাপড়ের টুকরা সঙ্গে নিয়ে বাবাজির সহিত মটরে উঠ্‌লেন।

বাবাজি বল্লেন "ব্যাণ্ডেল থেকে হরিদ্বার ৯৪৩ মাইল দূরে, টাইম-টেবলে দেখা গেল! মোগলসরাইয়ে ই, আই, আরের গাড়ী কাল বেলা ১১॥ সময় পৌছিবে। সেখান থেকে অযোধ্যা-রোহিলাখণ্ডের গাড়ীতে উঠ্‌তে হবে লাক্‌সার ষ্টেশনে। সেথান থেকে পরশু বেলা এগার-

টায় সাহারণপুর রেলে গিয়ে হরিদ্বারে পৌছান যাবে। খুব লম্বা পাড়ি, এই দীর্ঘ রাস্তার পাড়ি দেবেশ সইতে পার্‌লে হয়—ভিড়ের মধ্যে সেট হওয়ার উপায় নেই, গাড়ী রিজার্ভ কর্‌তে হবে—প্রথম শ্রেণীর গাড়ী রিজার্ভ করা দরকার।”

কিশোর রায় বল্লেন, “সময় বড় অল্প, তা হো'ক আমি ষ্টেশনে গেলে রিজার্ভ হ'তে দেরী হবে না।”

এই বলে তখনই মটর নিয়ে শিবমন্দির হতে অতি সন্তর্পণে দেবেশকে মটরে তুলে নিয়ে ব্যাংগুলের দিকে তাঁরা রওনা হ'লেন।

বাবাজি [redacted] নিকট ১০০০৲ টাকা চেয়ে নিলেন এবং বল্লেন “বৃন্দাবনে যশোমাধবের মঠে শ্রীগোপাল পাঁড়ের কাছে তার্ করে দাও—এই হাজার টাকা পাঠাতে; সূর্য্যকুণ্ডের কাছে মঠের যে আশ্রম আছে তা' খুব ভাল করে পরিষ্কার কর্‌তে যেন তাঁরাই তার করে দেন। সেখানে একজন ব্রাহ্মণ ও দুইটি চাকরের ব্যবস্থা যেন রাখা হয়, আর মথুরা হ'তে দুইজন ভাল ডাক্তার পোনের দিনের জন্য আশ্রমে আনিয়ে রাখ্‌তে হবে।”

কিশোর রায় বল্লেন “তা হবে, কিন্তু দেবেশ আমার অতি প্রিয়, তার জন্য হাজার টাকা আমার সরকার হ'তে খরচ করতে দিন্।”

বাবাজি বল্লেন, “মঠের অর্থ ও তো তোমাদেরই মত লোকের নিকট হইতে পাওয়া। ওতে গরীবের অধিকার, তুমি টাকা দিলেও যা হবে, মঠের টাকাতেও তাই। আমি এতে কোন আপত্তি কর্‌তে পারি না, তবে সম্প্রতি এমন কোন ঘটনা হ'য়েছে, যাতে মঠ হ'তে আমার কিছু টাকা আনা দরকার, নতুবা একটি লোক বড়ই ক্ষুণ্ণ হবেন। মঠের উদ্দেশ্য—দুঃখী, আর্ত্ত ও নিপীড়িতের সাহায্য করা; দেবেশের এখন যে অবস্থা তাতে সে মঠের সাহায্যের সর্ব্বতোভাবে

যোগ্য। তবে তুমি ক্ষুন্ন হয়ো না; পথে আমি কিছু খাব, কয়েক মুষ্টি চিঁড়ে ও কিছু গুড় তুমি আমায় ভিক্ষে দাও, তা ষ্টেশনেই পাবে। তুমি কিনে দিও।"

কিশোর রায়ের চক্ষে জল এল। তবে কানাই বাবাজি এমন কোন কথা বলেন না, যা উপরোধ অনুরোধ উল্টে যেতে পারে। তিনি নত মুখে বাবাজির আদেশ পালনে সম্মতি জানালেন।

১০॥টার সময় ষ্টেশনে পৌঁছে কিশোর রায় ষ্টেশন-মাষ্টারের কাছে কার্ড পাঠালেন। ছুটাছুটি করে ষ্টেশনের রেলওয়ের সকলগুলি সাহেব হ্যাট নামিয়ে কিশোর রায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। তারা আর্থিক অভাবে পড়্‌লে সর্ব্বদাই রাজাবাবুর সাহায্য পেয়েছে। তাঁর অনুরোধে তখুনি ফাষ্টক্লাসের একটা কামরা জুড়ে দিল, এবং মোগলসরাই, লক্ষ্ণৌর ও সাহানাবাদে তার ক'রে এরূপ বন্দোবস্ত করে দিল যাতে ষ্ট্রেচার ট্রলি বা রোগীর উপযোগী বিশেষ গাড়ীতে ক'রে দেবেশকে উঠান-নামান হয়। কিশোর রায় জান্‌তেন, বাবাজি চিকিৎসা শাস্ত্র বেশ পড়েছিলেন এবং অনেক রোগীকে নিজে ঔষধ পত্র দিয়ে ভাল করে-ছেন। তথাপি বল্লেন, "বাবাজির সঙ্গে কি একজন ডাক্তার দেব?" কানাই বাবাজি বল্লেন, "দরকার নেই!" তবে চাকর দুটিকে ফাষ্টক্লাসের সংলগ্ন কামরায় যেন দেওয়া হয়।"

"সে তো ব্যবস্থা করেই রেখেছি।"

ইন্‌ভ্যালিড্‌ চেয়ারখানির কল কব্জা এত সুন্দর যে তাহা যথেচ্ছা সংকোচন ও প্রসারণ করা যেতে পারে, তাতে সিল্কের গদি ও বালিশ, হাত পা ছড়িয়ে বা সংকোচ ক'রে থাকা ও হেলান দেও-য়ার নানারূপ সুন্দর ব্যবস্থা আছে। সেই চেয়ারখানি সংকুচিত ক'রে ফাষ্টক্লাসের কামরায় দেওয়া হ'ল।

বিদায় কালে কিশোর রায় নত হ'য়ে কানাইবাবাজিকে প্রণাম ক'রে সাশ্রু চক্ষে বল্লেন "আমি আপনার সঙ্গে যেতে পারি। আপনার সঙ্গ আমার কাছে কত দুর্লভ তা কি বল্‌ব। জীবনে এই টুকুই আমার সুখ।"

বাবাজি বল্লেন' "তুমি এই খানে থাক, দেবেশের বাগানটি যেন তার দাদা দখল না করে বসেন। আমি তোমায় আশীষ কর্চ্ছি, ভগবান তোমার হৃদয়ে বল দিন্। দেবেশ কতকটা ভাল হ'লে আমি শীঘ্র ফিরে আস্‌ছি। কিন্তু ওকে আর সিন্দূরতলায় থাকতে দেওয়া হবে না। আর মটরের সোফারকে বলে দিও, শিবমন্দির থেকে একজনকে গাড়ীতে তুলে নেওয়া গেল—সে কথা যেন কেউ জান্‌তে না পারে। আর দুটি লোক অবশ্য এ খবর জানে—যদিও দেবেশের নাম কেউ জানে না—সে হচ্ছে তোমার দুটি সেপাই। তারাত আমারই সঙ্গেই চল্ল, আমি তাদিকে বারণ করে দেব। তুমি দেবেশের বাড়ীতে খবর দিও, সে আমার সঙ্গে তীর্থ দেখ্‌তে চলে গেছে। কোন্ তীর্থ, তা' বল্‌বার দরকার নাই। এই খবর যে পর্য্যন্ত না পাবে—সে পর্য্যন্ত দেবেশের স্বাধ্বি স্ত্রী উতলা হ'য়ে থাক্‌বেন।"

কিশোর রায়কে এই বলে বাবাজি যখন থাম্‌লেন, তখন রেল ছাড়ার ঘণ্টা পড়ে গেছে এবং একটা অতিকায় সরীসৃপের মত রেলগাড়ীটা আস্তে আস্তে চল্‌তে সুরু করে দিয়েছে। রেলগাড়ী চলে গেল, কিশোর রায় অশ্রুভারাক্রান্ত চক্ষে বাবাজির কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, "এঁর কাছে যেটুকুন থাকি—তাই আমার স্বর্গ। এমন সান্ত্বনা কোথাও নাই। সংসারের কষ্ট যখন অসহ্য হয়, তখন কানাইবাবার মুখখানি মনে পড়্‌লে জুড়িয়ে যাই, মনে হয় তিনি আদর ক'রে আমার চিবুক ধরে বল্‌ছেন "ছি! কিশোর মনকে বশ কর্‌তে চেষ্টা

কর, "সর্ব্বং আত্মবশং সুখং", তখন আমার মধ্যে কোন্ একটা মহাশক্তি যেন জেগে উঠে দুঃখগুলি তুচ্ছ করতে শিখিয়ে দিয়ে যায়।"

কিশোর রায় রেলওয়ে আফিস থেকে বৃন্দাবনে তার্ করলেন। মটরে তিনি যখন বাড়ীতে ফেরেন, তখন রাত্রি ১২½টা। জ্ঞানদায়িনী দেবী দেখ্লেন, তাঁর স্বামীর মুখখানি যেন বর্ষনোন্মুখ মেঘের মত। স্বামী সম্বন্ধে তাঁর কোন কালেই কোন কৌতূহল ছিল না, কিন্তু আজ জিজ্ঞাসা না ক'রে থাক্তে পেলেন না, "নেংটিপরা সেই বুড়ো গায়কের সঙ্গে মটর ক'রে কোথায় গেছলে? মুখ ভার ক'রে এসেছ কেন?"

কিশোর রায় বল্লেন, "সে কথার কি দরকার জ্ঞানদা? আমার মুখ মলিন হ'য়েছে কি প্রসন্ন হয়েছে—তা কি কখনও তোমার দেখ্বার অবকাশ হয়েছে?"

জ্ঞানদায়িনী বিরক্তির ভাবে বল্লেন, "সব কথারই বেঁকিয়ে নিয়ে অর্থ করা।" এই বলে পাশ ফিরে আর কোন কথা না বলে শুয়ে রইলেন। কিশোর রায়ের চক্ষে জল এল। তিনি চোখ মুছে ঘুমোতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

বাকী রাত্রিটুকু বাবাজি দেবেশের শুশ্রূষা করেছেন, কখনও পূবের দিকের শার্শিটা খুলে দিয়েছেন আবার তা দিয়ে শীতল বায়ু যখন দেবেশের গা ছুঁয়েছে, তখন সেটি বন্ধ ক'রে পশ্চিমের খানিকটা খড়খড়ি খুলে, দেবেশের নিশ্বাস কেমন বইছে, হাত নাকের কাছে রেখে তা পরীক্ষা করেছেন। কখনও বুকের ওঠা-পড়ার শব্দ শুনেছেন। কখনও বা নাড়ী ধরে ধ্যানীর মত বসে রয়েছেন। একটা ষ্টেশনে নেমে সেপাইদের কাছ থেকে ষ্টোভ ও বার্লি নিয়ে এসে অতি যত্নে বার্লি তৈরী করে ফিডিংকাপ্ দিয়ে দেবেশের মুখে দিয়েছেন। তা অধঃ করতে

গিয়ে দেবেশের আবার শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হচ্ছে দেখে, সে চেষ্টা হ'তে বিরত হয়ে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে তার বুকে হাত বুলিয়েছেন। শেষ রাত্রে মকরধ্বজ খুব তরল করে মধু দিয়ে মেড়ে এক ফোঁটা করে দেবেশের জিভে লাগিয়ে দিলেন, মনে হ'ল সে ফোঁটাটি গলা দিয়ে গেল, কিন্তু পরের ফোঁটা দিতে আবার শ্বাস-কষ্ট সুরু হ'ল দেখে সে চেষ্টায় বিরত হয়ে একখানি হাতে পাখা দিয়ে আস্তে আস্তে তার মাথায় বাতাস করতে লাগ্‌লেন। দেবেশের মা থাক্‌লেও বোধ হয় এর চাইতে বেশী শুশ্রূষা করতে পার্‌তেন না।

ভোরের বাতাসে হউক বা যে টুকু মকরধ্বজ খেয়েছে তাতে করেই হউক, পাঁচটার সময় দেবেশ যেন নিদ্রিত হ'য়েছে, এরূপ বোঝা গেল। বাবাজি দেখ্‌লেন নাড়ী অনিয়মিত হ'লেই চলেছে ও শ্বাস প্রশ্বাস ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে। কতকটা আশ্বস্ত হয়ে তিনি নিজেও একটু তন্দ্রাবিষ্ট হলেন—স্বপ্ন দেখলেন, যেন দোলৎসব হচ্ছে, —হঠাৎ আবির ও কুঙ্কুমের লালবর্ণ যেন রক্ত স্রোতে পরিণত হ'য়ে জগতকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—রাধা কৃষ্ণ ও গোপীরা যেন রক্ত স্রোতে ভেসে যাচ্ছেন। সেই দৃশ্য দেখে যেন বাবাজির নিশ্বাস বন্ধ ও কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল। তিনি অব্যক্ত বেদনার একটা শব্দ করে জেগে দেখ্‌লেন, পূর্ব্ব দিক হ'তে অরুণ কিরণ শার্সির ভিতর দিয়ে মন্দীভূত তেজে দেবেশের কপাল স্পর্শ কর্‌ছে। অমনি উঠে পূর্ব্ব দিকে জানালার খড়খড়িগুলি বন্ধ করে দিয়ে বসে বসে ভাবলেন, "আগুণের কাছে থাক্‌লে তাপ না লেগে যায় না, সংসার নিয়ে ঘাট্‌লে সংসারের দুঃখ এড়ান বড় শক্ত। আমি মনে করেছিলেম আমি একক,

আমার দুঃখ নেই, কিন্তু দেবেশের জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা কিছুতেই থামাতে পাচ্ছি না।"

তখন পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে ধ্যানস্থ হ'য়ে এমনই এক জায়গায় পৌঁছিলেন যেখানে পৃথিবীর দীপ জ্বলে না—যেখানে তাঁরই নিত্য আলো জ্বলে। যেখানে সম্পূর্ণভাবে আত্ম সমর্পণ ক'রে ভক্ত হৃদয়ের সুখ দুঃখ তাঁকে নিবেদন ক'রে দেন এবং তাঁর অরুণ চরণ আশ্রয় ক'রে আনন্দিত হন।

---

(২৩)

বহু কষ্টে বাবাজি ত্রিস্রোতার পাড়ে যশোমাধবের মঠের সন্ন্যাসী-দের জন্য নির্ম্মিত আশ্রমে দেবেশকে লইয়া উপস্থিত হয়েছেন। লাক্-সারের নিকট রোগী এতদূর ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন যে আশ্রম পর্য্যন্ত তাঁকে জীবিতাবস্থায় পৌঁছাইতে পারবেন কি না—বাবা-জির সে আশঙ্কাও হয়েছিল। ব্যাণ্ডেল থেকে তথাকার ষ্টেশন মাষ্টারকে অপর দু একজন রেলওয়ে-কর্ম্মচারী সাহেব যে তার্ করেছিলেন, তাহার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেশনে দেবেশকে অচৈতন্য অবস্থায় গাড়ী হ'তে নামা উঠা করাতে সাহেবেরা বিশেষ সাহায্য করেছিলেন।

কোনরূপে দেবেশের প্রাণটুকু বজায় রেখে বাবাজি আশ্রমে প্রবেশ কর্‌লেন। আশ্রম বেশ পরিষ্কার হয়েছে এবং নানারূপ সরঞ্জাম ও রোগীর সুবিধাজনক বিবিধ ব্যবস্থা দেখে বাবাজি বুঝ্‌তে পারলেন, মঠ হ'তে গোপাল পাঁড়ে তার্ করেছিলেন।

তিনি ১২টার সময় আশ্রমে পৌঁছিলেন, এবং তিনি দিন পরে ব্যাণ্ডেজ খুলে বাবাজি ডাক্তারদের বল্লেন, "আপনারা দেখুন এঁর গল-নলের উপর যে হাড়খানি থাকে, তা ঠিক আছে কি না।" বাবাজির উপদেশ মত রোগীকে কোনরূপ বিরক্ত না ক'রে ও ক্লেশ না দিয়ে তারা কণ্ঠের হাড়টির পরীক্ষা করলেন এবং প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বল্লেন "কি বল্‌ছেন? এখানে কোন হাড় যে ভেঙ্গে-ছিল, তার চিহ্নমাত্র নাই।"

ঔষধের আশ্চর্য্যগুণে সেই দিন সন্ধ্যাকালে দেবেশ পাঁচদিন পরে কথা কইল।

প্রথমতঃ অতি ক্ষীণ স্বরে কি বল্লে, বোঝা গেল না, পরে দু এক দিন, 'আঃ' 'উঃ' করে শরীরের যন্ত্রণা বুঝলে। ক্রমে আরোগ্যের দিকে সে অগ্রসর হচ্ছে দেখে বাবাজি আশ্বস্ত হলেন। দশদিন পরে যখন দেবেশ পরিষ্কার ভাবে দুটি কথা বল্‌তে পেরেছে, তখন বাবাজি ডাক্তার দুজনকে আরও ২০ দিনের জন্য তথায় থাকতে বন্দোবস্ত করে সিন্দুর তলার দিকে রওনা হয়ে গেলেন। তাঁদের উপদেশ দিয়ে গেলেন, নিতান্ত কোনরূপ নূতন খারাপ লক্ষণ না দেখা দিলে, দেবেশকে যেন স্বর্ণ সিন্দুর ছাড়া অন্য কোন ঔষধ না খাওয়ান হয়; যেন দুবেলা তার কণ্ঠনালী ও বক্ষ পরীক্ষা চলে এবং তরল জিনিষ ছাড়া কিছু খেতে দেওয়া না হয়—খাবার জিনিষ তৈরীর সময় যেন ডাক্তার দুজন উপস্থিত থাকেন এবং তাদেরই সন্মুখে খাওয়ান হয়, রাত্রে কোন্ জানালা খোলা থাক্‌বে এবং কোন্‌টি বন্ধ রাখতে হবে তা আকাশ ও জলবায়ুর অবস্থা বুঝে যেন তাঁরা নির্দ্দেশ করে দেন।

এ পর্য্যন্ত দেবেশ বিশেষ কোন কথাই বলে নাই। এমন কি বাড়ীতে কে কেমন আছে তা পর্য্যন্ত বাবাজিকে জিজ্ঞাসা করে নাই। শুধু "একটু ভাল" কি "গায়ের কাপড় খুলে ফেল", "বালিশটা পায়ের নীচে রাখ" এই ভাবে শরীরের অভাব অভিযোগ অতি সংক্ষেপে জানিয়েছেন। এবং শারীরিক কুশল সম্বন্ধে প্রশ্ন শুনলে দুই এক কথায় 'হাঁ' 'না' বলে উত্তর দিয়েছেন। তা ছাড়া সারাটা দিন সপ্নাবিষ্টের ন্যায় চোখ বুজে পড়ে থাকতেন।

বাবাজি বুঝ্‌লেন, সম্পূর্ণরূপে আরাম হ'তে দেবেশের দেরী লাগ্‌বে। তিনি ইহার মধ্যে সেপাই দুজনকে সিন্দুর তলায় পাঠিয়েছেন ও

তাদের হাতে রাজা বাবুকে যে চিঠি দিয়েছেন—তাতে দেবেশের প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই, তা লিখে জানিয়েছেন।

কিন্তু দেবেশকে কিছুতেই আর সিন্দুরতলায় থাকতে দেওয়া হবে না, তাঁর পৈত্রিক ভিটা ত্যাগ করতে হবে। তার স্ত্রী পুত্র কেমন আছে এবং তাদের জন্য কি ব্যবস্থা করতে হবে এই সকল একটা ঠিক করার প্রয়োজন বুঝে তিনি হরিদ্বার পৌছাবার ১০।১২ দিন পরে দেবেশের সম্বন্ধে সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে বাঙ্গালা দেশ মুখে রওনা হয়ে গেলেন।

এদিকে আর ৪।৫ দিনের মধ্যে দেবেশ অনেকটা সেরে উঠেছেন। তিনি বিছানায় উঠে বসতে পারেন এবং ২।৪ মিনিট ডাক্তারদের সঙ্গে কথা ও বলে থাকেন।

কিন্তু আরোগ্যের পথে পা দিয়ে দেবেশ ভয়ানক মানসিক যন্ত্রণা বোধ করতে লাগলেন। দাদার ব্যবহার স্মরণ করে তাঁর মনে প্রতিহিংসা নেওয়ার ইচ্ছা বেড়ে চল্ল। শুয়ে শুয়ে তিনি এক একবার ভাবেন, আর একটু ভাল হলেই তিনি বাড়ী ফিরে যাবেন এবং গুণ্ডাদের প্রধান ইয়াকুব আলি খাঁকে টাকায় বশ ক'রে হৃদয়েশের মস্তক যেন লাঠির আঘাতে দ্বিখণ্ড ক'রে ফেলে—গোপনে তার ব্যবস্থা করবেন; কখনও সঙ্কল্প করেন, নেড়ার মা বুড়ি সর্ব্বদা তাদের বাড়ীতে যাতায়াত করে, তার বোনঝি দয়া হৃদয়েশের অন্দর মহলের ঝি। নেড়ার মাকে টাকার দ্বারা হাত ক'রে কিছু হলাহল বিষ যাতে দয়া হৃদয়েশের খাবার ঘরে কুঁজোর জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়—তার জোগাড় করবেন। কখনও মনে মনে ভাবেন, "শুনেছি বরিশাল-বাসী লোকেরা সাপ দিয়ে মানুষ মারে। হৃদয়েশ কখনও কখনও রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত তাঁর একতলার বৈঠকখানা ঘরের বিছানার তাকিয়াটা

বুকের নীচে রেখে উপুড় হ'য়ে ঘুমোন, বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া সমস্ত শেষ হলে অন্দর মহলে ঢোকেন; দেবেশ নিতাই-সাপুড়ের কাছ থেকে একটা জ্যান্ত বিষধর কেউটে নিয়ে এসে, তার মুখ আট্‌কে রেখে সেই বৈঠকখানার জানেলার ভেতর দিয়ে সেটিকে হৃদয়েশের বিছানায় গলিয়ে দেবেন—এবং তার মুখের বাঁধ খুলে দিয়ে নিজে সরে পড়বেন। কেউটে ভীষণ ক্রুদ্ধাবস্থায় হৃদয়েশকে সম্মুখে পেয়ে তাকে কামড়িয়ে মারবে!"

এমন কত রূপ ফন্দী তার মনে আস্‌ল—তা লিখে ওঠা কঠিন। কখনও কখনও মন নানা চিন্তায় কোমল হ'য়ে পড়ে, তখন মনে মনে বলেন "দাদা, তুমি আমায় মার্‌লে। আমরা দুজনে এক মায়ের পেটের ভাই, ছোট বেলা ঘুড়ি উড়্‌তে যেয়ে মাঠের মাঝখানটায় আমি একদিন পড়ে গিয়ে পা কেটেছিলুম—তুমি কত স্নেহে আমার রক্ত বন্ধ ক'রে, দুর্ব্বাঘাস থেতো ক'রে পায়ে লাগিয়ে দিয়েছিলে, এবং আমি কাটা পা নিয়ে হাঁট্‌তে পারিনি দেখে তুমি আমাকে কোলে ক'রে বাড়ী নিয়ে এসেছিলে,—তুমি আমার থেকে বেশী বড় নও, আমার ভার বইতে পারার মত সামর্থ্য ছিল না, তথাপি ছোট ছোট হাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে কত স্নেহে হাঁপাতে হাঁপাতে নিয়ে এসেছিলে! হায় সেই তুমি আমায় খুন করতে দাঁড়ালে!" তখন দেবেশের কান্না পেতে লাগ্‌ল।

কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তাঁর মন ক্রোধে উত্তেজিত থাক্‌তো। এই উত্তেজনায় ক্ষুধা চলে গেল, চোখের ঘুম চলে গেল। একটু তন্দ্রার মত হ'লে কত বিভীষিকা দেখতে থাক্‌তেন। একদিন দেখ্‌লেন, "নব-বৃন্দাবনের দুটো কৃষ্ণ চূড়ার গাছের গোড়ার সঙ্গে হৃদয়েশের হাত পা তিনি শক্ত ক'রে বেঁধে ফেলেছেন, তার পর দুখানি ধারাল ছোরা

দিয়ে তাঁর পুত্র শ্যামলেশও তিনি স্বয়ং হৃদয়েশের দেহটা টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে কেটে ফেল্‌ছেন। দাদার গোঁ গোঁ শব্দে যেন দেবেশের উল্লাস বেড়ে যাচ্ছে।

ডাক্তাররা দেখ্‌লেন, দেবেশ একেবারেই ঘুমোন না। তাঁর এতটা অগ্নিমান্দ্য হয়েছে যে খাওয়া দাওয়া একরূপ বন্ধ, চক্ষু দুটি লাল। কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লে কিছুই বলেন না, সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক ভাবে কোন একটা দিকে ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে চেয়ে কি ভাবেন।

তাঁরা রোগের কারণ ঠিক না কর্‌তে পেরে একটু ব্যস্ত হয়ে পড়্‌লেন।

দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণায় দেবেশ পাগলের মত হয়ে পড়্‌লেন। সমস্ত মন ও দেহে এমন জ্বালা বোধ কর্‌তে লাগ্‌লেন, যেন মনে হ'ল তাঁকে কেউ অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

দেবেশ যতই রাধামাধবকে স্মরণ কর্‌তে যান, ততই যেন মন সে কথা ঠেলে ফেলে দিয়ে কেবলই হৃদয়েশের কথা ভেবে উত্তেজিত হয়। কখনও কখনও এরূপ ক্রোধের উদ্রেক হয় যেন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ হবার জোগাড় হয়। উৎকট যন্ত্রণায় দেবেশ ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে থাকেন, তাঁর মনের মধ্যে কেউ যেন আর্ত্ত স্বরে চীৎকার ক'রে বলে "আমায় ত্রাণ করগো, আর তো সইতে পারি না" কিন্তু উত্তেজনার কিছুতেই হ্রাস হয় না। এই নিদারুণ অবস্থায় একদিন দেবেশ রাত্রি ১০টার সময় বিছানার এপাশ ওপাশ ফিরে হাঁস্‌ ফাঁস্‌ কচ্ছেন। বড় কষ্টে তিনি রাধা মাধবের যুগল মূর্ত্তি স্মরণ কর্‌তে চেষ্টা পাচ্ছেন। এক একবার মনে হচ্ছে যেন মাধবের চূড়ার নীল ময়ূর পুচ্ছটি তিনি আভাষে দেখ্‌তে পাচ্ছেন, কিন্তু সে মূর্ত্তি ঠেলে ফেলে হৃদয়েশের চিন্তা-জনিত উত্তেজনা মনে জোর ক'রে দস্যুর মত ঢুক্‌ছে এবং তাঁকে ভয়ানক যন্ত্রণা

দিচ্ছে। নিঃসহায় ভাবে দেবেশ এক একবার রাধামাধবের পায়ে স্মরণ নিতে যাচ্ছেন, কিন্তু পাচ্ছেন না।

বড় কষ্টে দেবেশ চক্ষু বুজে একবার বল্লেন, "ভগবান উদ্ধার কর। দাদা খুন করেছিলেন, ভাল ছিল, আমায় কেন বাঁচালে?"

এমন সময় রাত্রি ঠিক তখন ১২টা, তার ঘরের পার্শ্বে উচ্চ দেবদারু বৃক্ষ হ'তে কে অপূর্ব্ব সঙ্গীত গেয়ে উঠল? এ যেন পৃথিবীর সুর নয়, মা যেমন ছেলেকে ঘুম-পাড়ানী গান গেয়ে ঘুম পাড়ান, এমনই যেন একটা সুর তাঁকে ঘুম পাড়াতে এসেছে। উৎকট ঘায়ে শীতল প্রাণ জুড়ান প্রলেপের মত এ গান। দেবেশ নিজে গাইতে পারতেন—এ কোন্ রাগিনী? বেহাগ নয়, পূরবী নয়, খাম্বাজ নয়—এ কোনো জানা রাগিনী নয়—এ যেন অজানা রাজ্যের গান, এ কি গান না কথা? অতি মৃদু, কোমল, যেন তার ভিতর গঞ্জনা আছে, তথাপি কি মধুর।

সেই গান শুন্‌তে শুন্‌তে দেবেশের চোখ বুজে এল, কথা বল্‌বার শক্তি লোপ পেল—বুকের ভার যেন নেমে গেল। গানের সুরে যেন বলতে লাগ্‌ল, "পরকে আঘাত ক'রনা, নিজে আঘাত পাবে। পরকে মেরনা, নিজের বুকে দাগা—লাগ্‌বে" এ কি ভাষা, এ কি কথা? এ গান ত শুধু কানে শোন্‌বার নয়, এ যেন জ্বালা ভুলান মহৌষধ। দেবেশের চক্ষু বুজে ঘুম এল, এমন শান্তিতে তিনি বহুদিন ঘুমোন নি।

পরদিন প্রাতে উঠে দেবেশ দেখ্‌লেন, তার হৃদয়ের ভার কতকটা হাল্কা হ'য়ে গেছে। দাদার উপর রাগটা কমে এসেছে। ডাক্তার দুজন সকাল বেলা দেখ্‌লেন, দেবেশের চোখ দুটি এ কয়দিন জবা ফুলের মত ছিল, তার লাল রংটা অনেক তরল হয়েছে, নাড়ী সূক্ষ্ম ও চঞ্চল ছিল, আজ তা কতক পরিমানে স্বাভাবিক। রোগীর এ

কয়েক দিনের ভাব দেখে তাঁরা স্থির করেছিলেন, বাবাজিকে তার্ করবেন; কিন্তু আজ সে সঙ্কল্প ত্যাগ করে ঠিক কর্লেন, আরো দু এক দিন দেখে শেষে তার্ করা যাবে।

দেবেশের কানে সেই রাতের গানের রেশ বাজ্‌ছে ছিল, গানটা শূন্য হতে আস্‌ছিল মনে হচ্ছিল। পূর্ব্ব দিকের জানালা খুলে দেখ্‌লেন, নির্ম্মল বাপী নীরে হংস ক্রীড়া ক'রে বেড়াচ্ছে। জল কালো দর্পণের মত নির্ম্মল। পাড়ে একটি মাত্র দেবদারু বৃক্ষ, মঠের মত উঁচু হ'য়ে আছে—পূর্ব্বদিকে আর কোন লোকালয় নেই; এ গান কে গাইল? সারারাত্রি সে গান গেয়েছে। যতবার ঘুম ভেঙ্গেছে,—ততবার যেন সেই সঙ্গীত মৃদু-গুঞ্জনে তাঁকে আবার ঘুম পাড়িয়েছে। এ গায়ক কে?

দিন চলে গেল। রাত্রি দশটা বেজে গেছে। পূর্ব্বদিকে চাঁদ উদয় হয়ে যেন সেই বাপী-নীরে মুখ লুকিয়ে হাস্‌ছে। বর্ষাকাল, আকাশে কালো কালো মেঘ—দূরে হৃষিকেশ পর্ব্বতের একাংশের মত শোভা পাচ্ছে। দেবদারু গাছ্ থেকে পাতার সর্ সর্ শব্দ হচ্ছে। আশ্রম নীরব। দেবেশের কামরার ঠিক সংলগ্ন ছোট একটি ঘরে দুই জন পরিচারক নিদ্রিত। তাদের নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ডাক্তার দুজন, পাচক, আশ্রমের কর্ম্মচারী যে যার শয্যায় নিদ্রিত। দশটার পর আবার সেই গান, প্রথমতঃ অতি ধীরে সুর শোনা গেল। খোলা জানালা দিয়ে দেবেশ দেখ্‌লেন, দেবদারু গাছের খুব উঁচু কোন জায়গা হ'তে যেন কেউ গাচ্ছে। এত উঁচুতে কে উঠেছে? ডাল নাই, শুধু পাতা,—মই ছাড়া কি ক'রে উঠল?

তখন সেই গান—যেন দেবেশকে কত মধুর কথায় সান্ত্বনা দিচ্ছে, "পরকে ঘা দিতে গেলে নিজে ঘা পাবে। পরে যে ঘা দেবে—তার জন্য তাকে ক্ষমা কর—সেই আঘাত হ'তে তা হ'লে অমৃত উৎপন্ন হবে।" কি

ক'রে যে গান এই কথাগুলি বুঝাল, তা বলা শক্ত, কারণ সেই গানের ভাষা কারু বোধগম্য হবার নয়, দেবেশ গান শুনতে শুনতে বুঝলেন—যেন তিনি নিজে অপরাধী।

কার পূজার জন্য দেবেশ "নব বৃন্দাবনের" ফুল ফুটাচ্ছিল? রাধামাধবের জন্য? অন্য গাছের ফুলে কি তাঁদের পূজা হয়না? তোমার মন্দিরে যিনি আছেন,—তিনি কি শুধু তোমার? দেবেশ তুমি দেবতার জন্য ফুল-বেল-পাতা কুড়োতে কুড়োতে দেবতাকে ভুলে সেই ফুল বেলপাতা নিয়েই ব্যস্ত ছিলে, রাধামাধবের মন্দিরের পথে "নব-বৃন্দাবনই" তোমার প্রধান বাধা। তুমি তোমার দাদার থেকে কম বৈষয়িক নও। তাঁর ঝিলের দিকে তোমার লোলুপ দৃষ্টি সর্ব্বদা ছিল, এমনকি বাবাজির ঘর-সংলগ্ন জমিটুকু তুমি আত্মসাৎ করবার ইচ্ছা পোষণ ক'রেছিলে—এ কি বৈষয়িকের আসক্তি নয়? গগনের চন্দ্রতারা যাঁর আরতির দীপ, বিশ্বের সমস্ত ফুলের দ্বারা যাঁর কণ্ঠমালা তৈরী হয়, তাঁর পায়ে তুমি "নব বৃন্দাবনের" ফুলছাড়া আর কোন ফুল দিতে না। তাঁর কণ্ঠমালা অন্য কোন জায়গার ফুলে গাঁথতে তোমার প্রবৃত্তি হ'তনা, যিনি বিশ্বদেবতা তিনি তোমার বিষয়ের উপলক্ষ মাত্র। এ কয়েক দিনত তুমি তোমার দাদাকে খুন করবার চিন্তায় মত্ত ছিলে—তুমি বৈষয়িক, ধর্ম্মের ভণ্ড, খুনী, অপরকে বিচার ক'রোনা, নিজেকে দেখ।"

সেই গানের সুরে এত গুলি কথা মনে হ'ল, সেই করুণ গুঞ্জনাশীল সুর কি মিষ্ট! গুঞ্জনাতেও কত অন্তরঙ্গের ভাব! দেবেশের চক্ষু হ'তে কেবলই জল পড়ছে,—সে বিছানার উপর উঠে জানু পেতে ব'সে সেই সুরের উদ্দেশে প্রণাম জানাচ্ছে। সেই সুমিষ্ট সুর যেন বেড়া জালের মত মনকে ঘিরে রেখেছে। দেবেশ অবিরত কাঁদছে, এ দুঃখের কান্না নয়, এ কান্নার কানায় কানায় আনন্দ। দেবেশ এতদিনে খুঁজে

তার নিজকে ধর্‌তে পেয়েছেন—তাঁর রাধামাধবের আভাস দেখতে পেয়েছেন "আমার নববৃন্দাবনও যা, দাদার বৈঠক খানাও তা,—আমার দেব মন্দিরও যা, দাদার তোষাখানাও তা। রাধামাধবের সেবা কর্‌লে সমস্ত আসক্তি নষ্ট হয়, দৃষ্টি নির্ম্মল হয়,—কিন্তু আমার সেবা প্রবৃত্তিকে উস্কে দিয়েছে মাত্র ও দৃষ্টি এত খাট করেছে, যে আমি বাবাজিকে পর্য্যন্ত সন্দেহ করেছি—শত্রু জ্ঞান করেছি।"

দেবেশ কাঁদ্‌ছেন। নিজেকে পুণ্যাত্মা মনে করেছিলেন। এবার তিনি নিজের বিচার নিজে কঠোর ভাবে কচ্ছেন। আরতির সময় যেরূপ পঞ্চপ্রদীপ, চামর প্রভৃতি ঘুরোবার সঙ্গে তাল রেখে আঙ্গিনায় বাজনা বাজে—সেই গানের সুরের সঙ্গে তাঁর চিন্তার এইরূপ এক অপূর্ব্ব সঙ্গত হচ্ছে। তিনি এবার যেন দ্বিতীয় বার জন্ম গ্রহণ কর্‌লেন—প্রথম জন্মে পরকে দেখেছেন—এজন্মে নিজেকে দেখ্‌তে সুরু কর্‌লেন।

কেঁদে সেই সুরের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আত্মার এক অপূর্ব্ব আনন্দ নিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়্‌লেন—তারপর দিন ডাক্তারগণ দেখ্‌লেন, দেবেশ প্রাতে উঠে দেবদারু তলায় পায়চারি কচ্ছেন, তাঁর দেহে রোগের লেশ নাই, মুখখানি প্রফুল্ল।

কিন্তু সাধ্বী স্ত্রী যেরূপ সারা দিন সাংসারিক কাজ-কর্ম্মের মধ্যে রাত্রে স্বামী সঙ্গের জন্য আগ্রহশীলা থাকেন—দেবেশ দিনের বেলা যাহা কিছু কচ্ছেন, রাত্রে সেই সুর শোন্‌বার প্রতীক্ষা তাঁর সর্ব্ব কর্ম্মের মধ্যে আছে। "এই জন্যই বাবাজি 'নববৃন্দাবন' বিক্রয় কর্‌তে উপদেশ দিয়েছিলেন; নববৃন্দাবনের সমস্ত পুষ্প সম্পদ ছেড়ে আমি রাধামাধবের পায়ে যদি একটি অশ্রু উপহার দিতে পার্‌তেম—তবে তাহাই যুগল মূর্ত্তির পায়ে ঠিক পৌছত।"

দেবেশ পরিচারকদের জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "এখানে রাত্রে কেউ গান

গায়, তোরা শুন্‌তে পাস্?" তারা বল্লে "কাছেত জনপ্রাণী নাই—কই, কোন গানত আমরা শুনি নি!" ডাক্তার দুজন বল্লেন—"ও আপনি স্বপ্নে শুনে থাক্‌বেন, আপনার মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, এ অবস্থায় স্বপ্নে দৃষ্ট ও স্বপ্নে শ্রুত বিষয় গুলি কখনও কখনও ঠিক সত্যের মত মনে হয়।"

দেবেশ এ নিয়ে কোন তর্ক কর্‌লেন না। "কেউ শোনেনা আমি শুনি, আমার মর্ম্ম নিয়ে এ আনন্দের খেলা কে খেলে?" সমস্ত দিন দেবেশ প্রার্থনা কল্লেন—"কে গান কর, কে আমায় এমন আশ্চর্য্য ভাবে ঊর্দ্ধদিকে টেনে নিচ্ছ! আর একটু কাছে এস, তোমার গান কথা না ক'য়ে কথা বলে—তুমি কেমন গায়ক একবার দেখ্‌ব।"

সেই দিন রাতে নিঝুম হয়েছে, আবার সেই গান! অর্দ্ধরাত্রি—প্রদীপ স্তিমিত, দেবেশ পদ্মাসনে ধ্যানের ভাবে বসে আছেন, তাঁর সমস্ত প্রাণ কার প্রতীক্ষা করছে? কার আবির্ভাবের জন্য তিনি সজল চক্ষে দেবদারু গাছে বদ্ধ-দৃষ্টি হয়ে আছেন? জানেলার পথে অপর্য্যাপ্ত চাঁদের আলো, তার মনে হ'ল সুর যেন মৃদুতর কোমলতর হয়ে আস্‌ছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, উহা খুব নিকটবর্ত্তী হ'য়েছে এতে সন্দেহমাত্র নাই। দেবেশের দেহে কাঁটা দিল, চক্ষু হতে অজস্র অশ্রু পড়তে লাগ্‌ল।

তার পর যা বিশ্বাস্য নয়—যা কখনও হয়নি, যা দেবেশ অপরের সম্বন্ধে হ'লে গল্প ব'লে উড়িয়ে দিত, তাই ঘট্‌ল। জানেলায় লৌহের গরাদে—শুধু মাছি ঢুক্‌তে পারে, দ্বারে খিল দেওয়া, দীপের অস্পষ্ট আলোকে তিনি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলেন, ডান হাত খানি দ্বারা আশীর্ব্বাদের ভঙ্গী করে, মৃদুহাস্যে মুখখানি উজ্জ্বলকরে, একজন স্ত্রীলোক তাঁর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে। দেবেশের ভয় হ'লনা। এ যেন মায়ের মূর্ত্তি, সমস্ত ভয় দূর করতে এসেছেন! ঠিক মানুষের মত দেহ নয়; এ যেন দেহের

আভাস, দেহের শ্রী বিদ্যমান, কিন্তু দেহটি অস্পষ্ট। রমনীর মূর্ত্তি শ্যাম-বর্ণ, বরং কালো; একরাশ কালো চুল, সাদা থানের ধূতিপরা—ইনি সুন্দরী নন্—কিন্তু অপূর্ব্ব শ্রীশালিনী, যেন পরিপূর্ণ স্নেহে গঠিত। ইনি যুবতী নন, প্রৌঢ়া।

তিনি সুস্পষ্ট স্বরে বল্লেন, "দেবেশ আমি গান গেয়ে তোমার মন ফিরিয়েছি। যাঁরা দেবতার উদ্দেশে রওনা হয়ে মন্দিরের সিঁড়ির কয়েক ধাপ নীচে পড়ে পথ-ভ্রষ্ট হন—আমরা তাদের হাত ধরে তুল্‌তে চেষ্টা করি।"

"মা তুমি কে? আমার প্রণাম নেও, আমার মা আমাকে একবার জন্ম দিয়েছিলেন, তুমি দ্বিতীয় বার দিলে—আমার কাছে তোমরা তুল্য, তুমি কে, আমায় বল?"

"সে আর একদিন বল্‌ব—আজ তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে গেলাম—তুমি আমাকে এখন থেকে দরকার হলেই পাবে।"

এই বলে রমনী অদৃশ্যা হ'লেন, সে দিন' দেবেশ আর তাঁর গান শুন্‌তে পেল না।

কিন্তু তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ সেই রমণী কে, জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইল।

ডাক্তারেরা চলে গেছেন। দেবেশ সম্পূর্ণরূপ সেরে উঠেছে। এর মধ্যে সেই অপূর্ব্ব নারী একদিন রাত্রে এসে তাকে তাঁর আত্ম-কাহিনী বলে গিয়েছেন—তা' এই :—

"আমি বহুদিন পূর্ব্বে ২৪ পরগণার অধীন একটি গণ্ডগ্রামে জন্ম গ্রহণ করি। আমার যে ঘরে বিবাহ হয়, সেখানে আমার দেবরদের সঙ্গে আমার স্বামীর সর্ব্বদা কলহ হ'ত। এই ঝগড়া বিবাদে গৃহে শান্তি ছিল না, অনেক সময় দেবর-পত্নীদের সঙ্গে কথা বার্ত্তা বলা কঠিন হ'ত। যা' কিছু বলেছি, তার কূটার্থ করে তাঁরা তাদের স্বামীদের কানে তুলেছেন এবং সেই কথা নিয়ে ঘরের ঝগড়া আবার দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে।

"আমার যখন ২৮ বৎসর বয়স, তখন আমার স্বামীর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর আমার আর একদিনও শ্বশুর বাড়ীতে মন তিষ্ঠিল না। ঝগড়ার ভাব তখনও খুব ছিল, তার পর আমি একটু বেশী আচার-প্রিয় থাকাতে—সে গৃহে তাঁরা বড়ই অসুবিধা বোধ করতে লাগ্‌লেন। ব্রাহ্মণের ঘর, হ'লে কি হয়?—তথায় বহু কালাবধি কোন বিধবার বাস ছিল না। আমি যখন প্রথম এ বাড়ীতে আসি, তখন এক বিধবা পিস্‌শাশুড়ীকে দেখেছিলেম, সে প্রায় ১৮।১৯ বৎসর পূর্ব্বে। সেই বৎসরই তিনি মারা যান, তার পর আর কোন বিধবাকে এ বাড়ীতে থাকতে দেখি নি। দেবরেরা খুব মৎস-প্রিয় ছিলেন এবং তাঁদের স্ত্রীগণ আচার বিষয়ে বড়ই শিথিল ছিলেন, কারণ ঘরে কোন বয়স্কা গিন্নি বা অভিভাবিকা ছিলেন না।

"এদের সঙ্গে একত্র থাকা আর কিছুতেই সম্ভব পর হ'ল না। আমি আমার স্বামীর অর্জ্জিত কিছু পুঁজি পেয়ে ছিলেম, তা এক জনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, তাই নিয়ে রাধাকৃষ্ণের নাম জপ করতে করতে বৃন্দাবন রওনা হ'লেম।

"বৃন্দাবনে এসে আমি সংকল্প করলেম, ধর্ম্মের জন্য কঠোর আচার পালন ক'রে আমি সবাইয়ের কাছে বিধবার আদর্শ হয়ে থাকব। দিনে রাত্রে প্রায় ৭।৮ বার যমুনায় স্নান করতেম্। মথুরা ও বৃন্দাবনের সমস্ত তীর্থ ও ঘাট আমি দর্শন করে পুণ্য অর্জ্জন করতেম্। বিশ্রান্তি ঘাট, সূর্য্যতীর্থ, ধ্রুবতীর্থ, চক্রতীর্থ প্রভৃতি তীর্থ সম্বন্ধীয় সমস্ত পৌরানিক কথা আমার নিকট সুবিদিত ছিল। ষষ্ঠী-ঘরা কুণ্ডে স্নান ক'রে—সঙ্কর্ষণ কুণ্ডে স্নান করতেম্। রাওল কুণ্ডে কৃষ্ণের ইচ্ছায় সর্ব্বতীর্থের মিলন হ'য়েছিল, ঐ কুণ্ডে স্নান ক'রে মনে হ'ত সর্ব্ব পাপ দূর হয়ে গেল। শ্যাম কুণ্ড ও রাধা কুণ্ডে প্রত্যহ স্নান করতেম। কংস-খালিতে কৃষ্ণ কংসকে বিনাশ করে ছিলেন, কুব্জা কূপে কৃষ্ণের সঙ্গের কুব্জার প্রথম মিলন হয়, তাল-বনে কৃষ্ণ তাল রক্ষক অসুরকে বধ করে ছিলেন। এই ভাবে সমস্ত ঘাট মাহাত্ম্য আমি সর্ব্বদা কীর্ত্তন কর্ত্তেম, এবং এক একদিন এক এক ঘাটে স্নান করে মনে হ'ত, বিষ্ণু দূতেরা আমার স্নান চেয়ে চেয়ে দেখ্‌ছেন এবং স্বর্গে এই পূণ্য ফলে আমার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা হ'চ্ছে। উপবাস এত বেশী করতেম, যে আমার স্থূল দেহ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে পড়্‌ল।

"যে সকল বিধবারা আচার বিষয়ে কোনও রূপ শিথিলতা দেখাতেন, তাদের আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করতেম্। আমাদের কুঞ্জের কাছে একটি ভদ্রলোকের অষ্টম বর্ষীয়া বিধবা কন্যা একখানি লাল সাড়ী প'রে-ছিল—তাই দেখে ঘৃণায় অমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলতে লাগল। আমি তৎক্ষণাৎ

বৈকুণ্ঠ ঘাটে গিয়ে স্নান করে এই দৃশ্য দেখার পাপ হ'তে মুক্তি লাভ কর্‌লেম। শ্যাম বাঁড়ুয্যের পরিবারের সঙ্গে আমার বিশেষ ভাব ছিল, কিন্তু একদিন যেয়ে শুনলাম, তাঁর এক ভ্রাতা ষ্টিমারে থান—ও [illegible] ওরা বাড়ীতে স্থান দিয়েছেন, কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হয় নি। সেই দিন থেকে বাঁড়ুয্যে বাড়ীতে আর যাই নি! তাঁর পরিবার একদিন এসে ছিলেন, তাঁকে আমি স্পষ্ট বলে দিলেম, "দিদি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে, কিন্তু তার খাতিরে আমিত পরকালটি ছেড়ে দিতে পারিনে। তুমি আর আমার এখানে এস না।" স্পষ্টবাদিতা সম্বন্ধে আমার সুযশ ছিল, কিন্তু এই স্পষ্টবাদিতার জন্য যে বাড়ুয্যে-পত্নীর মুখখানি ম্লান হ'য়ে গেল, এবং একান্ত লজ্জা ও দুঃখ সহকারে ধীরে ধীরে পা' ফেলে তিনি চলে গেলেন, তা দেখে দুঃখ অনুভব করবার আমার অবকাশ হ'ল না।"

ধর্ম্মের বিচারেই সর্ব্বদা থাকা যেত। আমাকে যেন ভগবান ধর্ম্মের প্রহরী ক'রে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছেন—এই স্পর্দ্ধায় আমি বিপুল আনন্দ লাভ করতেম। এক গর্ভবতী ও রুগ্না বিধবা তৃষ্ণায় প্রাণ-ত্যাগ করেছে, তথাপি একাদশীর দিন এক ফোঁটা জল খায় নি—এই আদর্শ-জীবনের কথা কত জনের কাছে বলেছি, এবং যখন কোন কিশোরী বিধবার ক্ষুধায় পরিম্লান মুখখানি দেখে তার মা-বাবার বুক বিদীর্ণ হ'য়ে যেতো—তাঁরা খেতে বসে চোখের জলে ভাত দেখতে পাননি, তখন যেয়ে তাঁদের উৎসাহ দিয়ে বলেছি "আজ রাধাষ্টমী, আজকার উপোসের ফলে যে, পুণ্য হবে, তা যদি জানতে, তবে ক্ষুধা না সয়ে যদি মেয়েটা এখনই ছট্‌ফট্‌ করে মরে যেত, তবুও তোমাদের আনন্দ ভিন্ন অন্য কিছু হ'ত না।"

"ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সমস্ত জাতীয় লোকের প্রতি আমার ঘোরতর

ঘৃণা ছিল, তাদের ভগবান অপবিত্র ক'রেই সৃষ্টি করেছেন, এই ছিল আমার বিশ্বাস। একদিন যমুনার ঘাট হ'তে আস্‌ছি। পথে এক কুঁড়ে ঘরে এক ঘর বাঙ্গালী বাগ্দী এসে বাস করেছিল। বাপ জন খাটুতে বার হয়ে গেছে, মা ঘোর সান্নিপাতিক জ্বরে অজ্ঞান, পাশে পাঁচ বছরের ছেলেটি। তারও খুব জ্বর। আমি যমুনায় স্নান ক'রে এক কলসী জল নিয়ে কুঞ্জে আস্‌ছি, তখন শুনলেম শিশু কণ্ঠের কাতরধ্বনি—ছেলেটি বল্‌ছে "মাইজি, আমায় একটু জল—বড় তৃষ্ণা।" তার কোমল করুণ আহ্বানে যেন মনটা গ'লে গেল। "মাইজি', বলে ছেলেটা ডাক্‌ছে—আমি ত কখনও মা হই নি, কিন্তু তথাপি সে ডাকটি বড় মধুর লাগ্‌ল, কিন্তু পরক্ষণেই ঘেন্নায় গাটা জ্বলে গেল, ছিঃ বাগ্দীর ছেলে। এই অপবিত্র জীবটাকে আমি জল দেব? নিজেকে ধিক্কার দিয়ে সে জায়গা হ'তে প্রস্থান করলেম। একবার মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌লেম, ছেলেটা জ্বরে ও তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্‌ করে আমার কাঁখের জলের কলসীটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

"আমার বাড়ীর পাশে এক বুড় ডিপুটি অবসর নিয়ে বৃন্দাবনে বাস করতে এসেছিলেন। তাঁর গিন্নির অসুখ, একটি চাকর ও একটি বামুন সঙ্গে ছিল। আমার কাছে কে বল্লে ঐ ডিপুটিবাবুর এক ভাই বিলাত গেছে। শুনে কি আমি স্থির থাকৃতে পারি? আমাদের কুঞ্জের পাশ দিয়ে তাঁদের চাকরটা বাজার করতে যাচ্ছিল, তাকে ডেকে বল্লেম, "চাকরী করবি বলে কি ধর্ম্ম লোপ করবি?" সে বল্লে, "কি হ'য়েছে মা ঠাকরুণ?" আমি বল্লাম, "জানিস্‌না, তোদের বাবুর ছোট ভাই যে বিলেত গেছে—সেখানে কি না খাচ্ছে আর কি না করছে? তার খাটিয়ে খাবি, জাতটিও খোয়াবি নাকি?" সেই চাকর সেদিন ডিপুটিবাবুর কাছে গিয়ে বল্লে, তার

বাবা দেশে মারা যাচ্ছে,—এক্ষুণি সে দেশে যাবে। যাবার সময় সে বামুনঠাকুরকে টিপে দিয়ে গেল। সেও সন্ধ্যাবেলা বডড পা ও কোমর বেদনা হ'য়েছে, বলে চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে রইল, তার পরদিন সে গোপনে কিছু চিঁড়া গুড় খেয়ে "এব্যারাম শীঘ্র যাবে না" ব'লে ছুটি নিল। ডিপুটি বাবুর গিন্নি বুড় ও বাতে অশক্ত, তিনি যে কি কষ্ট পেলেন তা দেখে আমার দয়া মায়ার লেশ মাত্রও হল না। দেখ্‌লেম, তিনি পা খুঁড়িয়ে চল্‌তে তিন বার থামেন ও 'আহা' 'উহু' করেন, সেই অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে তিনি রাঁধ্‌তে বসেছেন, কখনও আঁচল পেতে শুয়ে হাঁফাচ্ছেন। ডিপুটি মোটা মানুষ, নড়্‌তে চড়্‌তে আছাড় খান। এই অবস্থায় কূয়ো থেকে জল তুলে বাসন মাজ্‌ছেন। তাঁরা দুদিন যে ভাবে কাটালেন তা দেখে আমার কষ্ট হল না। ভাবলুম "ভাইকে বিলেত পাঠিয়েছ কেন? তার শাস্তি ভোগ কর।"

"একদিন একটি বিধবা বৃদ্ধা একটি পনের বছর বয়স্ক বিধবা কন্যা নিয়ে আমাদের কুঞ্জের পাশে বাড়ী ভাড়া করলে। তারা বাঙ্গালী বামুন, মেয়েটি সুন্দরী, দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। কেমন কচি সুন্দর মুখখানি, ডাগর চোখ দুটি মাটীর দিকেই নত থাকে। বড় লজ্জাশীলা ও স্বল্পভাষিণী, পাড়ায় তার নামে একটা কুৎসা শুন্‌লেম। সে কথা সত্য কি মিথ্যা তা বিচার করার প্রবৃত্তি আমার হ'ল না, কারণ এ ভাবের কথা শুন্‌লে রাগে আমাতে আর আমি থাক্‌তেম না। সেই মা ও মেয়ে একদিন আমাদের কুঞ্জের পাশ দিয়ে যাচ্ছে আর আমি হেঁকে বল্‌লুম—"কুল-খেগো নচ্ছার মেয়েটাকে বুড়ী ঢেকে রেখেছিস্—নিজের পরকাল তো ঝরঝরে, আমাদের কাছে কথা গোপন রেখে আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট কচ্ছ কেন, বাপু? তোদের ওখানে গেছি বলে আমি দুটো উপোস্ করেছি ও কাল ভোরে সাতটা ঘাটে

স্নান করে এসেছি—শীতকাল, কি কষ্ট! এই সকল আপদ বৃন্দাবনের পবিত্র মাটি অপবিত্র করতে এসেছেন!” দেখলেম আমার কথা শুনে সেই মেয়েটির ডাগর দুটি চোখ জলে ভ’রে গেল। সে মলিন মুখে তাঁর মায়ের আঁচল ঘেঁষে রইল,—তার মুখখানি তখন যে দেখ্‌ত, হয়ত তারই কান্না পেত। কিন্তু আমি স্পষ্টবাদিনী, ধর্ম্মের ডঙ্কা বাজিয়ে চলি, আমি এ সকলের প্রশ্রয় কিছুতেই দিতে পারি নি।”

সন্ধ্যাকালে কোন দেব-দর্শনে গিয়ে মালা গুণে দশ হাজারবার নাম জপ না করে আমি ফিরতাম না। আরতি হ’ত, আর আমি কত কি ভাবতে থাক্‌তেম,—রামটহল চামার আমাদের পেছন দিক-টার পথ দিয়ে গেছে, সে পথটা ভোরে উঠে ঝাঁটা দিয়ে গোবর জলে সাফ্ করতে হবে। একাদশীর দিন বিক্রমপুরের এক বিধবা সন্ধ্যাবেলা ফল ও দুধ খেয়েছে; কি ঘেন্নার কথা? রাজকুমার চৌধুরী মারা গেছে, তার ছেলেরা তার শ্রাদ্ধ করবে, কি ক’রে শ্রাদ্ধ ক’রে আমি দেখে নেব। বেদী থেকে আমি পুরুৎকে উঠিয়ে নেব। চৌধুরী বাড়ীর এক ছেলে মুরগী খায়, এমন ধর্ম্মনাশা ছেলের মুখে মার ঝাঁটার বাড়ী।” এইরূপ কত কি ভাবতে থাক্‌তেম। ভাবতে ভাবতে এমনই উত্তেজিত হ’য়ে যেতেম, যে আরতির কাঁসর ঘণ্টা যে কখন বেজে বেজে থেমে যেত, ধূপের ধোঁয়া ও চামর ব্যজন যে কখন শেষ হ’ত, তা মনেই পড়্‌ত না। এক একদিন এমন হ’য়েছে যে জপের মালা করাঙ্গুলি ঘুরছে, কতবার ঘুরেছে তা ভুলে গেছি।”

“আরতি দেখার পর কোন কোন দিন আমাদের কুঞ্জে অনেক বিধবা আস্‌তেন। কার বাড়ীতে কোন ছিদ্র আছে, তা নিয়ে আলো-চনা করতেই আমি বড় সুখ পেতেম—এবং আমি যা করি সেইটিই আদর্শ কার্য্য এই মনে করে প্রত্যেক কথায় কথায় তার উদাহরণ

দিতেম। রসা গয়লার মেয়ে কেমন চঞ্চল,—হউক—না, ন' বছরের কিন্তু এত ছুটোছুটি করে যাওয়া কেন? মেয়ে মানুষতো, আমরা, যে চলি তা কেমন ধীর ভাবে। কুমোর একটি মেয়ে হয়েছে, শুনেছি তার একটা চোখ কাণা, আমরা মায়ের পেট থেকে যদি কাণা হয়ে বের হ'তেম তো মা আমার গলাটা টিপে মেরে ফেল্‌তেন। যাবজ্জীবন দুঃখ পাওয়ার চাইতে একদিনের দুঃখ ভাল। দ্বাদশ সূর্য্যতীর্থ দেখনি? আহা! কালিয়হ্রদ হ'তে উঠে কৃষ্ণ শীতার্ত্ত হ'য়ে পড়েন, দ্বাদশ সূর্য্য এখানে কৃষ্ণ অঙ্গে তাপ দিয়ে তার শীত নিবারণ করেছিলেন।" সেখানে গিয়ে দত্তদের বাড়ীর মেয়েরা বলে কিনা এ জাগাটা বড় দুর্গন্ধ। তীর্থমাহাত্ম্য না বুঝে এই সকল পাপ কথা মুখে আনে। তীর্থস্থানে আমরা কি ভাবে থাকি তাহা দেখে না—যমুনার জল যেখানে অতিশয়—রামবিষ্ণু—যেখানে পবিত্র হ'লেও ততটা পরিষ্কার নয়, সেখান থেকেও কাদার গাদা শুদ্ধ জল আমরা ঢক্ ঢক্ করে গিলে ফেলেছি, তবেত পুণ্য অর্জ্জন হয়েছে।"

"আমার সর্ব্বদা মনের ভিতর একটা গর্ব্বের ভাব ছিল, যাকে তাকে যা ইচ্ছা তাই বলে গালাগালি দিয়েছি, কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, আমি পুণ্যাত্মা আর সকলে দুরাত্মা। এমন কোন লোক দেখ্‌তে পেতেম না, যার কোন না কোন দোষ আবিষ্কার কর্‌তে না পেরিছি। যদি কারু বিপদ দেখ্‌তেম, তবে তার কোন দোষে সেই বিপদ ঘটেছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করতে বসে যেতাম। 'এ আর হবে না রথযাত্রার দিনে মন্দিরে না এসে সে হাওয়া খেতে বাইরে চলে গেল।—সে তার বড় মেয়েটাকে একটা ধর্ম্মহীন লোকের নিকট বিয়ে দিয়েছে। সে ঠাকুর দেবতা মানে না—তার মুখে একদিনও ত রাম নাম শুনি নি, বয়স এতটা হয়েছে—একদিনও জপের মালাটি হাতে তোলেনি'

ইত্যাদিরূপ দোষ কীর্ত্তন করে উপসংহারে বল্‌তেম চন্দ্রসূর্য্য এখনও আছে, ধর্ম্ম সইবে কেন? অন্য কোন দোষ না পেলেও 'সে মাঘ-মাসে মূলা খেয়েছে, উত্তর শিয়রে শুয়েছে, যাতে ক'রে গণেশ হেন ঠাকুরও রক্ষা পাননি'—এই সকল দোষ বাগাড়ম্বর করে হাত পা নেড়ে সঙ্গিনীদের বলে তাদের তাক লাগিয়ে দিতেম। একদিন রূপবতীর ছেলেটা আমায় বল্লে, "রাজ্যের লোকের দোষ তুমি দেখ্‌ছি দিব্য চক্ষে দেখতে পাও, তোমার বৈধব্য কেন হ'ল—লোকেরা যে সকল সুখ ভোগ করে তারতো প্রায় সকলটি হ'তেই তুমি বঞ্চিত, তোমার নিজের কি কি পাপে তুমি এমন বরাত করে এসেছ, তা বিচার করলে যে শোধরাতে পারতে, পরের দোষ নিয়ে নাড়াচাড়া করে কি লাভ হবে?" সে ছেলেটার বয়স সতের, তবুও তার গালে একটা চড় কষে মারতে গিয়েছিলেম। সে হেসে ছুটে পালিয়ে গেল, আমি রাগে গর্ গর্ করে বল্লুম, "ছেলেটার আস্পর্দ্ধা দেখ, আমায় যদি ভগবান কষ্ট দিয়ে থাকেন, সে তো দুঃখ্য দেখাবার জন্য। কলিতে ভাল লোকেরা কষ্ট পাবেই কি পাবে।"

"এই বলে, নিজে কত উপোস্ কাচ্ছি, কতবার স্নান কচ্ছি, কেমন যত্নে তুলসী পাতা কুড়িয়েছি ও ঠাকুরের নৈবিদ্য তৈরী করেছি—শূদ্র, ও অন্ত্যজ জাতিকে কত সতর্কতার সহিত পরিত্যাগ করেছি—লোকের পাপ কিরূপ স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছি—এই সকল একে একে বিস্তার ক'রে ব'লে গর্ব্বে ফুলে উঠ্‌লেম।

"আমি যখন রেগে মেগে যাকে যা ইচ্ছা তা বক্‌তেম, তখন মনে ভাবতুম, ঠিক কাজ কচ্ছি, আমার মত স্পষ্টবাদী কে?" কখনও একটা চামার বাগ্দী কি কাওরাকে দেখে—ঘৃণায় নাশা কুঞ্চিত করে গালাগাল দিয়ে বলেছি, "তোরা কি আমি জল নিয়ে বাড়ী যাবার

পরে রাস্তায় হাঁটতে পারিস্ না। ঠিক যখন শুদ্ধ হয়ে যমুনায় স্নান করে বাড়ী ফির্‌ব—তখনই কি রোজ রোজ তোদের মুখ দেখ্‌তে হবে।" এক কথায় তারা যে কুকুর বেড়াল থেকেও অধম, এইটে বুঝিয়ে দিয়েছি এবং তারা মলিন মুখে রাস্তা হতে সরে গিয়েছে, তখন মনে ভেবেছি আমি নিজের শুদ্ধতা কি অপূর্ব্ব রকমেই রক্ষা কর্‌তে পেরেছি! আমার প্রতি কর্ম্মেরই আমি গুণ আবিষ্কার করতুম, কেউ যদি আমার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করেছে, অমনই তার মাথা হাতে কাট্‌বার উদ্যোগ করেছি; কিন্তু আমি যে দিন-রাত তাদের দোষ কীর্ত্তন করেছি, তাতে তারা রাগ কর্‌তে পারে, এটি ভুলেও মনে হয়নি, কারণ আমি যে তাদের হিতের জন্য দশজনের কাছে তাদের অপরাধ ঘোষণা ক'রে লজ্জা দিচ্ছি—তাদের শোধরা-বার উপায় করে দিচ্ছি।

"এই ভাবে যখন আমার বয়স ৪০শে এসে পৌঁছল, তখন যেন শুকনো লঙ্কার ন্যায় মেজাজটা আরও তীব্র হ'য়ে উঠল, লোকে আমাকে দেখে ভয় কর্‌ত। আমার শরীর বেশ বলিষ্ঠ ছিল, উপোস করে করে যদিও কতকটা ক্ষীণ হ'য়ে গেছেলেম, তবুও আমার হাড়গুলি খুব পুরু ছিল, আমার স্বাস্থ্যও বেশ ছিল—তবে জীবনে কঠোরতা অবলম্বন করাতে এখন আর স্থূলাঙ্গী ছিলেম্ না।

"সেদিন সন্ধ্যাকাল। আষাঢ়ে মেঘে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে, ঘন কালো মেঘ মালার মধ্যে বিদ্যুৎ স্ফুরণ হচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি এক কলসী জল নিয়ে যমুনা হ'তে বাড়ী ফির্‌ছি। সঙ্গিনীরা কেউ নাই, আমি অনেক সময়ই তাদের প্রতীক্ষা কর্‌তুম না, কারণ আমার চরিত্রের গুণে লোকজন আমার নিকট হ'তে দূরে থাক্‌তেই যেন সোয়াস্তি বোধ করত, আমার আবার ভয় কিসের? বর্ষণ সুরু

হয় নি, ঘোর গর্জ্জন হচ্ছে। সন্ধ্যার আঁধার, যমুনার কালো জল, আকাশের ঘন ঘটা, পথে একাকী আমি,—এই সময় হঠাৎ মনে হ'ল কতকগুলি ছোটলোক দৌড়ে আমার পেছনে পেছনে ছুট্‌ছে।

"মর, বেটারা আমার আঁধারে ছুঁয়ে ফেল্‌বে না কি? যত ছোট লোক! আমি খুব উঁচু গলায় ডেকে বল্লুম, 'কে'রে তোরা? আর কোন রাস্তা দিয়ে যা,' আমার এ পথ মাড়াস্‌নে। কিন্তু সে লোকগুলি আমার কথা শুনতে পেলে বলে বোধ হ'ল না, সন্ধ্যার আঁধারে আমায় দেখ্‌তে পেলে বলে বোধ হ'ল না; কারণ তারা ছুটে আমার কাছেই এসে পড়্‌ল। ঘোর বিরক্তির সহিত আমি চেঁচিয়ে বল্লুম, "তোরা ডোম-পাড়ার মাতাল বুঝি, ত্রিদিব গোঁসাইয়ের কুঞ্জের কাছে থাকিস্‌, আমি তাঁকে ব'লে এমন শাসন করব যে তোদের ঘর বাড়ী ভেঙ্গে বৃন্দাবন হ'তে সরে যেতে হ'বে।"

কিন্তু তারা একটুও ভয় পেলে না। তাদের একজন এগিয়ে এসে জোর করে আমার কলসীটা ভেঙ্গে ফেল্লে এবং আমার মুখ চেপে ধর্‌ল। আর তিন চার জনে আমার হাত পা বেঁধে দৌড়িয়ে আমায় এ কোথায় নিয়ে চল্ল? এরা তো ডোমপাড়ার মাতাল নয়। এরা ত্রিদিব গোঁসাইয়ের কুঞ্জের কাছে থাকে না। এদের একজনের মাথায় সেই ঘোর অন্ধকারে স্পষ্ট একটা সাদা টুপি দেখ্‌তে পেলেম্‌। আঁধারের গায় পায়রার পালকের মত তা' যেন উড়্‌ছে। আমি কখনও জীবনে ভয় পাই নি; এই অবস্থায় প'ড়ে কি কর্‌ব, বুঝ্‌তে পারলুম না। হায়! আমার যমুনায় স্নাত, উপবাস পূত শুদ্ধদেহ! রাগে ক্ষোভে আমি আগুনের মত হ'য়ে গেলাম। কিন্তু

মুখ বাঁধা, চীৎকার ক'রে গালাগালি কর্‌ব—সে শক্তিও আমার ছিল না।

"তখনই মনে হ'ল, হয়ত শঙ্খ, চক্র গদা পদ্ম নিয়ে বিষ্ণু এখনই পাপী দিগকে বধ কর্‌তে আস্‌বেন, কিন্তু তিনি এলেন না। মনে হ'ল আমার পবিত্রতার প্রখর তেজ বরদাস্ত করতে না পেরে, এরা জ্বলে পুড়ে মরে যাবে, যেরূপ সাবিত্রীর তেজে যম-দূতেরা জ্বলে গেছল। মনে হ'ল হয়ত এখনি ভূমি কম্প হবে, ধরণী এ পাপ কিছুতেই সহ্য করবেন না। বজ্র মাথার উপর বৃথাই গর্জ্জন করতে লাগ্‌ল, পাপীদের মাথায় পড়্‌বে মনে করেছিলেম—কিন্তু তা পড়্‌ল না।

"বিধতা এই পাপীদের প্রতি কোনই শাস্তির বিধান কল্লেন না। যমুনার জলে একখানি ডিঙ্গি খুব শক্ত দড়ি দিয়ে পারের অশ্বথ গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল। এরা আমাকে নিয়ে তাতে তুলে, হাত দুখানি পেছুন মোড়া করে বেঁধে, পা দুটি দড়ি দিয়ে বেঁধে, মুখ কাপড়ে বেঁধে মরার মত ফেলে রাখ্‌ল।

"নৌকাতে একটি লণ্ঠন মিট্‌মিট্‌ করে জ্বল্‌ছিল। তার আলোতে দেখ্‌লুম—এদের মধ্যে দুই একজন মুসলমান, আর বাকী অতি ছোট জাতের হিন্দু, খোট্টা—কারণ তাদের মাথার পেছনে টিকি ও গলায় লাল বড় বিচির মালা। সকলেরই প্রায় নেংটি পরা। একজন মুসলমান, তার দাড়িটা ঢেউ খেলে নাচে নেমে আবার যেন উর্দ্ধদিকে ফিরে উঠ্‌বার চেষ্টায় উঁচু হ'য়ে আছে। তার গায়ে একটা মের্জ্জাই ও পায়ে নাগড়া জুতা, হাতে একটা বড় বাঁশের লাঠি। আমার মনে হ'ল সে এই দলের সর্দ্দার,—তখন হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া এসে মেঘগুলি সরিয়ে নিয়ে চলে গেল, আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে গেল। ব্যাটারা নৌকা ছেড়ে দিয়ে যমুনার উজানের দিকে এগিয়ে চল্ল।

"কতকদূর গিয়ে তারা আমার মুখের কাপড় খুলে দিল। হঠাৎ নদীর স্রোতের গতি নিরুদ্ধকারী পাথরটা যদি সরে যায়, তবে যেরূপ প্রবল বেগে শতধারে সেই নিরুদ্ধ স্রোত ছুটে চল্‌তে থাকে, আমার মুখ সেইরূপ বন্ধন মুক্ত হ'য়ে তাদেরে অবাধ ভাষায় গালি দিতে লাগ্‌ল "মুখ পোড়া, নচ্ছার, পাজি—দুষ্ট, তোরা আমার মত বামুনের মেয়েকে এই দুর্দ্দশা কর্‌লি, তোদের কি গতি হবে ভেবে দেখ্—এখনও চন্দ্র সূর্য্য আছেন, এখনও অগ্নি আছেন—তোরা জলে পুড়ে মরবি, আমার হাত-পায়ের বাঁধন ছেড়ে দে, আমি যমুনায় ঝাঁপিয়ে মরি"—চীৎকার করে কাঁদতে লাগ্‌লেম ও তাদের বাপান্ত করে গালি দিতে লাগলেম, তারা আমার এই ক্রোধ দেখে হাস্‌তে লাগল। রাগে আমি নিজের জিভটা দাঁত দিয়ে কেটে রক্তাক্ত ক'রে ফেল্লেম।

"সেই মুসলমান সর্দ্দার আমার কাছে এসে বল্লে, "বিবি তুমি এত রাগ্‌ছ কেন? হিন্দুর বিধবার চাইতে দুঃখী কে?" আমরা তোমার সকল দুঃখ ঘোচাব, খোদাতালা মরজি করলে হয়ত তুমি আমার বিবি হবে। আমরা চা বাগানে কাজ করি। তোমার শরীর বেশ বলিষ্ঠ, তুমি সেখানে বিস্তর আয় করাতে পারবে, আর যদি আমি তোমায় নিকে করি, তবে তোমার খাটতেও বেশী হবে না, লেড়কা হ'লে তারাই শেষে বড় হ'য়ে আমাদের খাটুনি খাটবে।" প্রভৃতি নানারূপ কুবাক্য দ্বারা কান দুটা যেন লৌহ শলাকায় বিদ্ধ করতে লাগল। কি পাপ কথা শুনলেম, আমি যে আমি তা' বিশ্বাস করতে পারলেম না, মনে হ'ল আমি জ্বর বিকারে বিকট স্বপ্ন দেখ্‌ছি।

"কুলির সর্দ্দার শেষে আমায় বল্লে, "ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তোমাকে উপস্থিত করাব, তুমি নিজ ইচ্ছায় আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ এইটি কবুল কোর। তোমার দুঃখ আমরা ঘুচিয়ে দেব।" বিকট সুরে

আমি চেঁচিয়ে বল্লেম, "নিয়ে চ, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কাছে, তোদের মুণ্ডপাত করব, তোদের দস্যু বৃত্তির কথা বলে দিয়ে এখনই তোদের সকল গুলিকে জেলে পুরব।"

"তারা একত্র হয়ে কি যেন একটা ফন্দি আঁট্‌ল, আমি তার কতক কতক শুনতে পেলাম। আমার একটা খড়ো ঘরে বেঁধে রেখে, আর একটা স্ত্রীলোককে ষ্টীমারে নিয়ে তাকে দিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সব কবুল করাবে। তারপর খালাসীকে ঘুষ দিয়ে সেই মেয়েটিকে ছেড়ে দেবে ও তার জায়গায় আমায় নিয়ে ষ্টীমার ছেড়ে দিবে।।

"আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। যা কথা সেই কাজ। এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের ফলে আমি একটা পাহাড়ে জায়গায় চা বাগানে এসে উপস্থিত হ'লেম।

"আর তোমায় কি বল্‌ব, আমার উপর সব রকম অত্যাচার হ'ল। শুদ্ধা, অপাপ-বিদ্ধা, বিধবা, আমি তাদের দ্বারা দুর্দ্দশার চূড়ান্ত সীমায় নীত হ'লেম। আমি চারদিন পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাস ক'রেছি, একান্ত দুর্ব্বল অবস্থায় একদিন আমার চোখে একটু ঘুম এসেছে, হাত পা বাঁধা, এমন সময় হঠাৎ চার পাঁচটা কুলি ডাক্তার সাহেবের নির্দ্দেশানুসারে আমার গলায় একটা নল চালিয়ে দিল। প্রায় আধসের দুধ ও মদ উদরস্থ ক'রে দিল, আমি ঘুম ভেঙ্গে সেই নলের প্রবল গতি হ'তে আত্মরক্ষা করতে পাল্লেম না। মদের নেশায় আমি প্রায় অজ্ঞানের মত রইলাম—এই অবস্থায় তারা আমাকে কয়েকবার আরও দুধ ও মদ খাইয়েছে।

আমার উপর যে সকল অত্যাচার হ'য়েছে, তা বিস্তারিতভাবে বলা কষ্টকর ও নিষ্প্রয়োজন। এর মধ্যে একবার যে হাত পা বাঁধা অবস্থায় প'ড়ে আছি, মদের নেশা ছুটে গেছে, আমি নিজের অপবিত্রতা স্মরণ ক'রে

মনে করতে পাচ্ছিনা যে আমি সেই কমলা দেবী। ঘৃণা ও রাগে জর্জ্জরিত হ'য়ে আমি চোখ বুজে শু'য়ে আছি, মনে হ'ল যেন সত্যই আমি নরকে বাস কচ্ছি।

"হঠাৎ দেখ্‌লেম, আমার শয্যা-পার্শ্বে একখানি দা। মুনিয়া কুলি রাত্রে সেটা হাতে ক'রে বসেছিল, যাবার সময় নিতে ভুলে গেছে। আমি গড়িয়ে গড়িয়ে সেই দা খানির নিকট গেলাম, এবং দাঁতের ফাঁকে দাখানি ধ'রে আস্তে আস্তে হাতের বাঁধনটা কাট্‌তে লাগ্‌লেম। দাখানি খুব ধারাল ছিল, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল শরীরকে উল্টিয়ে, ঘুরিয়ে, বেঁকিয়ে, যে ক'রে হ'ক, দড়ির বাঁধনটা কেটে ফেল্লুম। হাত খোলা, এখন পায়ের বাঁধন কাট্‌তে কোন মুস্কিল হ'ল না। আর ৫ মিনিটের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে লাগ্‌লেম, আস্তে কুঁড়ে ঘর হ'তে বার হ'য়ে দেখ্‌লেম প্রায় ১৫সের ওজনের একটা পাথর দোর গোড়ায় প'ড়ে আছে। নিজ পরিধেয় শাড়ির অর্দ্ধেকখানি কেটে সেই পাথরটা তা'দিয়ে কষে বাঁধ্‌লেম, তারপরে দড়ি দিয়ে পাথরটা গলার সঙ্গে বেঁধে সেইভাবে মুয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পুকুরের পাড়ে গেলুম—বড় পুকুর, রাত্রিতে বেশ জোছ্‌না, আমি গড়িয়ে গড়িয়ে পুকুরের ধাপগুলি পাড়ি দিয়ে জলের মধ্যে আস্তে প'ড়ে গেলাম। বোধ হয় আর ৮।১০ মিনিট পরে জলের উপর একটা জায়গায় বুদ্‌বুদ্ দেখা দিয়েছিল, তখন আমার জীবন সাবাড় হ'য়েছিল।

"দেহ-সম্বন্ধ বিচ্যুত হ'য়ে আমি নিজের একটা অতি ভয়ানক যন্ত্রণা-দায়ক অস্তিত্ব অনুভব করতে লাগ্‌লুম। জীবিত অবস্থায় এরূপ কষ্টের ধারণাই হ'তনা। মনে হ'ল শত শত ছুরি দিয়ে কেউ আমায় কাটছে, যেখানে একবার কেটেছে ভয়ানক রক্ত বেরুচ্ছে, সেইখানেই আবার ছুরি চালাচ্ছে। খানিক পরে মনে হ'ল ভীষণ শীতে আমার দাঁত কপাটি লেগেছে, আবার তারপরই যেন আগুনে ফেলে আমায় দগ্ধ ক'রে তারই উপর হলাহল বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। কেউ যেন শত শত ছুঁচ আমার গায় ফুটিয়ে দিচ্ছে এবং একটু পরে বিস্ফোটকের যন্ত্রণায় আমি অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এত যন্ত্রণায়ও চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল বেরুচ্ছে না। মনে হচ্ছে চোখের এক ফোঁটা জল বেরুলে হয়ত অর্দ্ধেক কষ্ট দূর হ'ত। এত চেষ্টা ক'রেও গলা দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ বার করতে পারলুম না, মনে হ'ল একটিবার গোঁ গোঁ শব্দ করতে পারলে আমার অর্দ্ধেক কষ্ট দূর হ'ত। চল্‌বার গতি নাই, দেখবার চক্ষু নাই কাণ নাই, হাত পা নাই, কেবল এক অতি বিষম, অতি ভীষণ যন্ত্রণার অনুভূতি—সেই যন্ত্রণা যেন তপ্ত লৌহশলকায় বিদ্ধ ক'রে আমায় ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে। আমি অন্য কোন চিন্তা করতে পারি নাই—কেবল সেই কষ্টের বোধ আমায় যেন গ্রাস্ ক'রে রাখ্‌ল।

"এই অবস্থায় আমার কতদিন, কতমাস বা কত বছর গেল, তা বুঝতে পাল্লেম না। দিন গেলে, বোধ হয়, তা আমার নিকট বছরের মত লম্বা হ'য়ে যেত, কারণ প্রতিমুহূর্ত্ত আমার কাছে তার সুকঠোর অস্তিত্ব যেন

শলাকা বিঁধিয়ে বুঝিয়ে চলে যেত—এক মুহূর্ত্তই কি ভয়ানক দীর্ঘ বোধ হ'ত।

"এইভাবে বহুকষ্ট সহ্য ক'রে, আর কষ্ট অসহ্য হ'ল। আমার মনে হ'ল, অনেক বছর এইভাবে কাটালুম—তখন কেবলই যন্ত্রণার সঙ্গে একটা প্রার্থনা মন হ'তে উঠতে লাগল, "ত্রাণ কর, ত্রাণ কর" সমস্ত আত্মা বেদনাতুর হ'য়ে যেন বলে উঠল 'ত্রাণ কর, ত্রাণ কর'। কাকে ডাকৃছি তা মনে নাই, অমুদ্দেশে বালক যেমন ঢিল ছোড়ে, আমিও তেমনই কোন অনির্দ্দিষ্ট লোকে "ত্রাহিমাং" প্রার্থনা অবিরত প্রেরণ করতে লাগলুম।

"একদিন সেই অসহ্য কষ্টে মনের থেকে আপনি যেন ত্রাহি ত্রাহি রব কচ্ছে। যন্ত্রণা উৎকট হ'তে উৎকটতর হচ্ছে—এমন সময় বহুকাল যা হয় নাই, আমার চক্ষে তন্দ্রা এল। একি তন্দ্রা না অমৃত! কয়েকটি অমূল্য মুহূর্ত্ত যেন একটু শান্তি বোধ করলেম—জেগে উঠে বোধ করলুম, কেউ আমায় ছুঁয়েছেন, এবং সেই স্পর্শের পুলকে আমার চোক দিয়ে অবিরল জল পড়ছে।

বহুদিন পরে চোখের জল ফেলতে পারলুম, মনে হ'ল কি সুখী তারা, যারা দুঃখের সময় চোখের জল ফেলতে পারে। ওগো কে আমায় ছুয়েছে! কার দেবলোক হ'তে আনীত অঙ্গের বাতাসে আমার এমনই ভাবে সর্ব্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিলে? কে তুমি শ্রী? লবণাক্ত কটু সমুদ্র হ'তে এই অমৃতের ভাণ্ড নিয়ে এসেছ? তোমায় একটুখানি স্পর্শে যে আমার যুগব্যাপী ব্যথার অবসান হ'ল। আমি বহুদিন কথা বলতে পারি নাই, আজ জিভের জড়তা দূর হ'ল, বল্লুম "কে তুমি? তুমি আমার কে? তুমি ভিন্ন আমার কেউ নাই; তুমি কে চিনি না, এরূপ অপরিচিত হ'তেও অপরিচিত, অথচ আত্মীয় হ'তেও আত্মীয় কে এসেছ? কে আমার জন্য

আনন্দ নিয়ে এসেছ? কে কোথা হ'তে দুঃখ দূর করতে এসেছ—প্রণাম প্রণাম, শতবার প্রণাম—বল, শুনে জুড়াই, কে তুমি?"

যিনি আমায় ছুঁয়েছিলেন, তিনি বল্লেন, "আমায় দিদি হ'লে ডেক?" কি মিষ্টি সুর, নারদের হাতে শতবার বীণার ঝঙ্কার হ'লেও বোধ হয় এত মিষ্টি হ'ত না। এ যেন আর্ত্তের আর্ত্তিনাশক, মৃতের অমৃতময় সুর। তিনি আমায় বল্লেন, "তাঁর উপর নির্ভর কর।"

আমি···"কাঁর উপর?"

দিদি···"ভগবান্ বই নির্ভর করবার কে আছে?"

"আমার পূর্ব্বজীবনের সমস্ত স্মৃতি জেগে উঠল, কথা বলবার শক্তি পুনরায় পেয়ে আমি অনর্গল যা তা বলতে লাগলেম। বল্লুম, "কে ভগবান্? আমি তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করি না। তিনি কি শ্রীরাম? তাহ'লে তিনি বিকট-দর্শন রাবণের হাতে মারা গিয়েছেন। রামায়ণ মিথ্যা ক'রে উল্টো কথা বলেছে। তিনি কি শ্রীকৃষ্ণ? তাহ'লে কংস তাঁকে পাথরে আছড়ে মেরেছে, কিংবা পুতনার স্তনের হলাহল বিষ খেয়ে তিনি মরেছেন, নতুবা বকাসুর তাঁকে বিকট ঠোঁট দিয়ে ঠিকে মেরেছে—নয়ত তৃণাবর্ত্ত ঘূর্ণবায়ুর ঘুরপাকে ফেলে তাঁর জীবন সাবাড় করেছে। তিনি থাকলে কি আর এমন হ'ত?

দিদি···"কি হ'য়েছে?"

আমি···"দিদি তুমি দেবতা,—বোধ হয় সব জান। কিন্তু তবু বলছি। আমার মত শুদ্ধ চরিত্রা রমণী কে ছিল? আমি প্রাতে সঙ্কর্ষণ কুণ্ডে স্নান করতুম,—এক প্রহর বেলায় মথুরায় বিশ্রান্তি-ঘাটে স্নান ক'রে পবিত্র হতুম। দ্বিপ্রহর বেলায় পুনরায় ধ্রুবতীর্থে গিয়ে ১০০৮ বার নাম জপ ক'রে তারপর স্নান ক'রে শুদ্ধ হতেম। তারপর বৃন্দাবনের কেশীঘাট, মথুরার চক্রতীর্থে এবং শেষরাত্রে শ্যাম কুণ্ডে ২০০০ বার নাম জপ ক'রে স্নান

ব্রত পূজা নৈষ্ঠিকে—যদি করুণা নাহি দীনে” তোমার জপ, তপ, ব্রত, পূজা সমস্ত মিথ্যা,তোমার নিষ্ঠা কপট। সমাজের যাঁতাকলে পড়ে দুর্লভ মনুষ্য জন্মের সমস্ত সদ্‌গুণ হারিয়ে তুমি ধর্ম্মরাজ্যের ব্যাপার করছ—এই স্পর্দ্ধা মনে মনে পোষণ কচ্ছ।”

“দিদির কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে হ’ল যেন আমি রাক্ষসী। এ যেন আমার নালী ঘা চিরে চিকিৎসা সুরু হ’ল। সে ঘায়ের বেদনা-বোধ লুপ্ত হ’য়েছিল—এরূপ পাপিষ্ঠা আমি, আমার নিজের পাপ বোধ মাত্র ছিলনা।

“অবিরল চক্ষু জল পড়্‌তে লাগল—কিন্তু নিদারুণ মনস্তাপ ও অনুতাপের সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝ্‌তে পারলুম্‌ আমি আরোগ্যের পথে যাচ্ছি।

“দিদি আবার বল্লেন, “তুমি পাপী, নিজের বৃহৎ পাপ বোধ তোমার ছিল না,পরের ছোট ছোট কথা নিয়ে কেবলই কুৎসা ক’রেছ, তুমি মানুষের হিতৈষী দেবতা নহ—তুমি নরদ্রোহি রাক্ষসী। কচি মেয়ে গুলি বিধবা জীবনের কি কষ্ট না সইছে! কোথায় তাদের চোখের জল মুছোবে—না তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ অনুসন্ধান ক’রে, তারা নির্দ্দোষী হ’লেও তাদের কুৎসা রটনা ক’রেছ। অনেক সময় তারা তোমার কুৎসা-রটনায় বিষ খেয়ে মরতে গিয়েছে, তুমি তাদের দুঃখ বোঝনি। কিন্তু তাদের যিনি সৃষ্টি করেছেন তা তাঁর চোখ এড়ায় নি। একটা কুকুরকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে রাস্তায় যেয়ে যদি কেউ চীৎকার ক’রে বলে—কুকুরটা ক্ষেপে গেছে, তবে কি সে প্রকৃতই ক্ষেপেছে কি না—তা জানবার জন্য কেউ প্রতীক্ষা করে? সকলেই লাঠি নিয়ে তাকে তাড়া করে। একটি বাল-বিধবার কুৎসা-রটনা ও সেইরূপ—সে অভাগী মুখে কিছু বল্‌তে পারেনা, তার এই সকল কথায় যে কষ্ট হয়, তাকি তোমার বোঝ্‌বার শক্তি ছিল? ওঃ তুমি কি নিষ্ঠুর! কষ্ট হচ্ছে? কাদ্‌ছ—আজ, এই অবধিই থাক্‌।”

"আমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লুম—"না দিদি ব'ল, ব'ল, তোমার তিরস্কার আমার কানের অমৃত, আমাকে নূতন জন্ম দিচ্ছে!"

"তুমি নাম জপ ক'রে ভগবানকে পাওনি—তিনি হৃদয়ে এলে তোমার মনে তার শ্রীপদ নিঃসৃত করুণার গঙ্গা বয়ে যেত, তিনি এলে প্রীতি-ক্ষীরোদ সমুদ্র তোমার হৃদয়ে উথ্‌লে উঠত, ঘৃণার হলাহল দূর হ'য়ে যেত। চামার কি মুচি হউক,—যার দুঃখ দেখ্‌তে, তাঁরই দুঃখ দূর করতে প্রাণান্ত চেষ্টা ক'রতে। তাঁর আবির্ভাব হ'লে তোমার মনেই মন্দির উঠত। তুমি যে সকল মন্দিরে গেছ—তা শুধু ইট, চুন, সুরকীর ডেলা, তুমি যে সকল দেবতা পূজা করেছ তা মাটী আর পাথর। জীবন্ত দেবতা এলে তুমি অন্যরূপ হ'য়ে যেতে।"

"আমি···"দিদি, এখন আমার উপায় কি বল?"

দিদি···"তুমি ভগবানের নাম জপকর, এবং সম্পূর্ণরূপে তাঁর কাছে নিজেকে ছেড়ে দাও, "বল আমি বুঝিনা, আমি অজ্ঞান, তুমি আমায় নিজে শেখাও, আমি পরের বুলি শুনব না, তুমি আমাকে ভাল কর।"

"তারপর দিদির স্পর্শ আর পেলেম না, তার কথা আর শুন্‌লেম না। তিনি যেরূপ বলেছিলেন, আমার ছায়া দেহ নত ক'রে···কর যোড়ে দিন রাত সেইরূপ প্রার্থনা করতে লাগ্‌লেম। কত দিন মাস চলে গেল—আমি একাগ্র হয়ে উপসনা করতে লাগলেম···"এ আমার অহঙ্কারের, ইন্দ্রিয় বিকারের ঘোরকলুষ উৎকট খোলসটা ফেলে দিয়ে আমাকে তোমার ক'রে নাও।"

"কত রাত্রি কতদিন এইভাবে তাঁর উপাসনা ক'রেছি, তাঁর নাম জপ করেছি। তার পর আবার দিদির অমৃত স্পর্শে আমার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। আমি বল্লুম,—"দিদি তুমি এসেছ—এসে ব'স, আমার সূক্ষ্ম দেহের এই চুলগুলি দিয়ে ঝেঁটিয়ে তোমার জন্য বেদী তৈরী ক'রে

দেই, তোমার ছোঁয়ায় আরোগ্যের পথে এসেছি—এ হ'তে বঞ্চিত ক'রে আমায় আবার রোগের মধ্যে ছেড়ে দিওনা।"

"দিদি বল্লেন "এই সময়টা ভগবানকে ডেকে ডেকে কি ফল লাভ করেছে, বল দেখি?"

"আমি বল্লুম—"আমি তাঁর কাছে চেয়েছি যেন আবার জন্ম দিলে আমায় ব্রাহ্মণকুলে জন্ম দিওনা, স্পর্দ্ধার মধ্যে নিজেকে বড় ক'রে অপরকে তুচ্ছ করবার প্রবৃত্তির মধ্যে যেন জন্ম না হয়। আমাকে চাঁড়াল কর, আমাকে মেথর কর, পরকে পীড়ন করেছি এতকাল, পরের সেবায় অতি হীন কার্য্যেও যেন আমি তোমাকে স্মরণ করে গৌরব বোধ করতে পারি।"

"তার পর বহু যুগ চলে গেছে। এর মধ্যে সেবা-ধর্ম্ম গ্রহণ করে সংসারে কতবার এসেছি, গেছি,—সে তোমার জানবার দরকার নেই। এখন আমি অনেকটা মুক্ত। যাঁরা ধর্ম্মের পথে চলতে গিয়ে আসক্তির বাধা পেয়ে উছট্ খেয়ে পড়ে—আমি তাদেরই হিতে নিযুক্ত থাকি—এইজন্য তোমার কাছে এসেছি। এই সকল অলৌকিক কথা তুমি কারু কাছে প্রকাশ ক'রনা। অনেক লোকই অলৌকিকের আভাস নিজ জীবনে পান- উহা ভগবানের দান, আত্মার উন্নতির সোপান। কিন্তু তা' পরকে বলতে নাই, অপরের অবিশ্বাসজনিত মন্তব্যে নিজের ভিতরকার মহা-প্রকাশের মূল্য নিজের কাছেই কমে যেতে পারে—সুতরাং তা' বলতে নাই। আমি চল্লুম—জীবনে তোমার আরও যে সকল কষ্ট পাবার আছে, তা' নির্ভরের ভাবে যেন সইতে পার, ভগবান তোমাকে সেই শক্তি দিন্।"

---

(২৮)

দেবেশ সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ ক'রে বাড়ী যাবার প্রতীক্ষা কচ্ছেন। বাবাজি চিঠি লিখেছেন, তিনি শীঘ্র এসে তাঁকে নিয়ে যাবেন। তিনি মনে ভাবছেন, এবার বাড়ী গিয়ে নববৃন্দাবনটা তার দাদার নামে লিখে পড়ে দেবেন, দাম নেবেন না।

কিন্তু বাবাজি আজ আসছি, কাল আসছি, বলে প্রায় ১৫ দিন কাটিয়ে দিলেন। দেবেশ ভাবলেন, বোধ হয় তুলসী ও শ্যামলেশের জন্য দেরী হচ্ছে। বাবাজি নাকি বলেছেন, দেবেশ বাড়ী ফিরে গেলে তিনি আর সিন্দূরতলায় থাকবেন না।

দেবেশ ক্রমশঃ সাধনার পথে এক পা ক'রে এগুচ্ছেন। বৃহত্তের মধ্যে ছোট ছোট জিনিষ ডুবিয়ে দিতে না পারলে জীবনের কোন স্বার্থকতা থাকে না; ছোট ছোট নদী সাগরে পৌছে চরিতার্থ হয়। সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসক্তিগুলি বিশ্বপ্রেমে পৌছিবার পথ-স্বরূপ হলেই সেগুলির স্বার্থকতা, নতুবা সেগুলি বিষয়ের প্রতি আত্মাকে বেঁধে রাখবার দড়ি স্বরূপ হয়। তাঁর 'নববৃন্দাবনের' প্রতি প্রীতি একটা আট বিঘা জমির প্রতি আসক্তি মাত্র, এটি তিনি বেশ বুঝেছেন।

সংসারের সমস্ত আসক্তি দূর ক'রে সংসারের কাজ করতে হবে। এই তার মনের অবস্থা। সে দিন রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন—শ্মশান ঘাটে কয়েকজন প্রৌঢ় ও যুবক একটি শবকে ঘিরে তার শেষ কার্য্যের ব্যবস্থা কচ্ছেন,—সকল জোষ্ঠের অনেকগুলি চুল পাকা। চিতা প্রস্তুত করে তাঁরা বস্ত্রে ঢাকা শবের মুখ খুল্লেন—মৃত ব্যক্তির বয়স প্রায় ৯০। কিন্তু তাঁর মুখখানি যেন পরিচিত। দেবেশ দেখলেন,

সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা একটা সূক্ষ্ম শরীর নিয়ে পূব-দক্ষিণ দিকে রওনা হ'ল,—দেবেশ তাঁর অনুসরণ করলেন। সেই সূক্ষ্মদেহী যেন সিন্দুরতলায় গিয়ে তাঁর গৃহে জন্ম নিল এবং কতক সময় পরে শ্যাম-লেশ নাম ধরে তাঁর আঙ্গিনায় হামাগুঁড়ি দিয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল।

ঘুম ভাঙ্গার পর দেবেশ ভাবলেন, হয়ত তাই সত্য—সেই প্রৌঢ় ও যুবক পুত্রগণের মধ্যে কেউ হয়ত এখনও তাঁর উদ্দেশ্যে বাৎসরিক শ্রাদ্ধ কচ্ছেন। তাঁরা যাঁর উদ্দেশ্যে পিতৃতর্পণ এখনও কচ্ছেন, হয়ত তাঁকেই আমি পুত্র বলে চুম্ খাচ্ছি। জীব নিজ কর্ম্ম-ফলে দেহ পরিবর্ত্তন ক'রে নব মায়া-সূত্র সৃষ্টি করছে। এই ভাবতে ভাবতে দেবেশের মনে বিরাগ এল। তিনি অনাসক্ত ভাবে ভগবান্‌কে ডাকতে লাগলেন এবং বল্লেন, "মাতৃকল্পা যিনি আমার মনের তামসা কাটিয়ে এই নির্ম্মল বুদ্ধি দিয়েছেন,' তাঁকে নমস্কার; আমি যেন সংসারে কাজ ক'রে যাই, কিন্তু কোন ভায়গায় যেন আটকে না থাকি—আত্মার শক্তি অসীম—সেই শক্তি যেন গৃহপ্রাচীরের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে না থাকে।"

এই ভাবে চার পাঁচ দিন গেল। একদিন পোষ্টাফিসের পিয়ন আশ্রমের এক পরিচারককে একখানি চিঠি দিয়ে গেল, সে জিজ্ঞাসা করলে "চিঠি কোথেকে এসেছে।" পিয়ন শিল দেখে বল্লে "সিন্দুরতলা হ'তে।"

সেই চিঠি খানি এসেছিল আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নামে—কিন্তু পরিচারক জানতো দেবেশবাবুর বাড়ী সিন্দুরতলা, সুতরাং এ চিঠি তাঁরই নামে হবে। সে চিঠিখানি দেবেশবাবুর হাতে দিয়ে

এল, দেবেশও কিছু মনে না করে—চিঠিখানি তাঁরই ভেবে উহা খুলে ফেল্লেন। চিঠিতে এই লেখা ছিল।

শ্রীযুত রঘুপতি চৌবে—

বরাবরেষু।

আমি সিন্দুরতলা ছাড়্তে পাচ্ছি না, বড় বিপদ। দেবেশের পুত্র শ্যামলেশ চারদিনের জ্বরে প্রাণত্যাগ করেছে। একটা ব্যবস্থা না করে যেতে পাচ্ছি না। দেবেশের নিকট এই কথা গোপন রাখবে এবং বল্বে আমি যত শীঘ্র পারি, হরিদ্বারে রওনা হচ্ছি।

মহান্ত।

চিঠি পড়ে দেবেশ একঘণ্টা কাল চুপ ক'রে বসে রইলেন, তারপর ঝর ঝর করে চোখের জল পড়্তে লাগ্‌ল।

একদিকে তার রাধামাধব,—একদিকে শ্যামলেশ—সিন্দুরতলায় তার আর কে আছে? হতভাগিনী তুলসীরই বা কে আছে? দেবেশের অজস্র অশ্রু-বিন্দু তার পরিধেয় বস্ত্রের উপর পড়্তে লাগল।

কতদিন বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে শ্যামলেশ কাদা ছেনে, গাছের বিচি বুনেছে! কতদিন দেবেশের ফরমাস্ পালন করতে তার ক্ষুদ্র শক্তির সমস্তটুকু প্রয়োগ করেছে। দেবেশ বাগান নিয়ে ব্যস্ত,—১০।১১ বছরের শিশু দশবার বাজারে ছুটেছে, দেবেশ পেঁপে খেতে ভালবাসেন, রোজ এক ক্রোশ দূরে লক্ষ্মণপুর হ'তে সে পেঁপে নিয়ে এসেছে—সিন্দুরতলায় ভাল পেঁপে পাওয়া যায় না। তুলসীর অসুখ হ'লে সে নিজে ঠাকুর-ভোগ রেঁধেছে, এতটুকুন শিশু ভোগের ডেগ্ নামাতে গিয়ে এক দিন পা পুড়িয়ে ফেলেছিল, তা' বাবা মাকে বলে নাই, তিন দিন পরে পায়ে বড় ফোস্কা দেখে তুলসী তা' টের পান। রাত্রে বাগান দেখ্‌বার জন্য কতবার দেবেশ তাকে পাঠিয়েছেন,

হয়ত এই ঘুম এসেছে, কাঁচা ঘুম ভাঙ্গা চোখ্ রগ্ড়াতে রগ্ড়াতে শ্যামলেশ বলেছে—"বাবা এই যাচ্ছি।" একদিন যেতে একটু দেরী হয়েছিল—দেবেশ তাড়া দিয়ে বল্লে, "বসে আছিস্ যে? এখনও যাস্নি।" দ্বিরুক্তি না করে শ্যাম চলে গেল, তার তখন গায়ে জ্বর, রাত্রে হিম লাগিয়ে সেই জ্বর বেড়ে গেল। আরতির সময় বাবার কাছে থেকে সে নেচে নেচে গাইত, সে সুর কি মিষ্ট। একদিন শ্যাম বাগানে পাহারা দিচ্ছিল, এর মধ্যে একটা গাই ছুটে এসে কতকগুলি ফুলের চারা নষ্ট করে চলে গেল। দেবেশ এসে তাকে গাল মন্দ দিয়ে বল্লেন, "তুই থাক্তে এমন কাণ্ডটা হ'ল! তুই ঘুমোচ্ছিলি নাকি, তোর কোন দায়িত্ব বোধ নেই।" দেবেশ চলে গেলে শ্যাম খোঁড়াতে খোঁড়াতে খিড়কির দোর দিয়ে বাড়ীর আঙ্গিনায় এল, তুলসী দেবী বল্লেন, "খোঁড়াচ্ছিস্ কেন?" বালক ডান হাত দিয়ে চোখ মুছতে লাগল। মোট কথা, গরুটা বাগানে ঢোক্বার সময় সে তাকে তাড়া করেছিল, শিশু দেখে গাইটি শিং দিয়ে তার পায় ঘা দিয়ে তাকে মাটীতে ফেলে দিয়ে বাগানের ফুলের চারা খেয়ে পালিয়ে যায়। শ্যাম পিতার গাল খেয়ে সে কথা বল্তে পারে নি।

তুলসী তার ছিন্ন কাপড়খানি তালি দিয়ে সেলাই ক'রে দিয়েছেন, তাই পরেই সে কত আনন্দিত। উৎসবের সময় আর আর ছেলেরা কত সুন্দর নূতন কাপড় পরেছে, শ্যাম সেই মায়ের হাতের তালি দেওয়া পুরোনো কাপড় পরে রাস্তায় যেতে কোন লজ্জা বোধ করেনি। যদি দেবেশ তাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, "শ্যাম তোর কি কাপড়-জামার দরকার আছে?" সে হেসে বলেছে "বাবা, আমার আছে।" কতদিন দেবেশ বাগান থেকে পা-দুখানি মোজার মত দন কাদায় ঢেকে বাড়ী এসেছে। একদিকে তুলসী, অপরদিকে

শ্যাম জল দিয়ে পা দুখানি ধুয়ে দিয়েছে, শ্যামের কচি হাতের স্পর্শ মনে করে দেবেশের চোখের জল অবিরত পড়্তে লাগ্‌ল।

আমি তো বাগানের সেবা করেছি, বাবা, তুমি শুধু তোমার মা-বাবার সেবা করেছ। যে কাজ বলেছি তা প্রাণ দিয়ে করেছ, তোমার ক্ষুদ্র শক্তির সকলটুকু প্রয়োগ করেছ, কি করেছ? হাট-বাজার করেছ, বাগানে গাছ বুনেছ, আমার ছবির জন্য রং গুলে রেখেছ, তুলি সাফ্ করেছ, আমার বিছানাটি ফুলশয্যার মত পরিষ্কার করে রেখেছ, তুলসী ত সময় পায় নি! তার অসুখ হ'লে তুমি আমাদের রেঁধে খাইয়েছ। ঠাকুর সেবার "শেতল" তৈরী করেছ। এতটুকুন ছেলে তুমি—তুমি অক্লান্ত কর্ম্মী, যা করেছ স্বার্থত্যাগী যোগীর মতন করেছ তারপরে আমার মিছামিছি ধমক খেয়েছ, ধমক খেয়ে আবার অনুগত ভৃত্যের মত এসে আমার আদেশের প্রতীক্ষা ক'রে থেকেছ। তোমাকে ছাড়া আমার গৃহের কি আছে? তোমাকে একদিনও বলি নাই, কিন্তু রাজার ঘরে যে রত্ন নেই, তুমি আমার তাই ছিলে। তুমি গেলে, তোমার অভাগা মাকে আমি কি ব'লে বুঝাব?"

কাঁদ্তে কাঁদ্তে দেবেশের মনের ভার কতকটা লঘু হ'ল, হঠাৎ তাঁর মন হ'তে প্রশ্ন হ'ল—"এ শ্যামলেশ কে?—আমার ঘরে কেন এসেছিল?" সহসা তার মনে হ'ল—এ তাঁর আরাধ্য দেবতা, তার ঘরে এসে তাকে সেবা ক'রে গিয়েছেন; তিনি আমার পায়ে হাত দিয়ে পা ধুইয়ে দিয়েছেন, তিনি আমায় রেঁধে খাইয়েছেন, পীড়া হলে তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন, বাতাস করেছেন, যে রূপ ধরে এলে আমি বিশেষ তুষ্ট হব—আমার মনোরঞ্জনার্থ তিনি সেই রূপ ধরে এসেছিলেন, আমি তাকে চিন্‌তে পারিনি, পুত্র বলে শিশু

বলে অবজ্ঞা করেছি। তিনি এত সেবা করে গেলেন, প্রাণপাত ক'রে আমার জন্য খেটে গেলেন আমি তাঁর প্রতি-সেবা করতে পারি নি; আমি মন্দিরে পাথরের মূর্ত্তির পূজা করেছি, বাইরের "নববৃন্দাবনের" জন্য দেহপাত করে খেটেছি, কিন্তু ঘরে যে বাল গোপাল জীবন্ত হ'য়ে আমার সামনে দিন রাত আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় খেটেছেন, তাঁর পায়ের ধূলোতে যে বৃন্দাবন হ'তে ও সত্যি সত্যি আমার আঙ্গিনা পবিত্র হ'য়েছিল, কই তার ত কোন সেবা আমি করি নাই, তার অপরিসীম স্নেহ ও সেবার বিনিময়ে আমি তাকে কি দিয়েছ। রাজনারায়ণ ঠিক বলেছিল—'আমি তার পায়ে একজোড়া জুতো পর্য্যন্ত দিতে পারিনি। তাকে সেঁৎসেতা একতলাঘরে মেজের উপর শুইয়েছি, তাঁর ছেঁড়া কাপড় তালি দিয়ে পরতে দিয়েছি, আমার জীবন্ত গোপালকে এইরূপ তুচ্ছ ক'রে, পাথরের গোপালের বাঁশীর মকরমুখ সোনা করে দিয়েছি। তাঁর খাট রূপো দিয়ে মুড়ে দিয়েছি। তিনি কি সত্য সত্যই তাতে প্রীত হ'য়েছেন?"

যশোদা যেরূপ শিশুকৃষ্ণের মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছলেন, সেইরূপ ক্ষুদ্র শিশুর মধ্যে অপরিসীম দেবত্বের প্রকাশ দেখে স্তব্ধ ও বিমূঢ় হ'য়ে রইলেন। আমাকে সেবা-অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। শ্যাম, তুমি আমাকে তোমার স্বরূপ চিনিয়ে দিয়েছ। পৃথিবীর জীবন্ত গোপাল-দের সেবা ক'রে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। শ্যামলেশ ও তাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। আমি এতদিন বৃথা চন্দন ঘষেছি, বৃথা পূজার ফুল সংগ্রহ ক'রেছি। আমার আশে পাশে গোপালের মূর্ত্তি সব ননীখাবার জন্য হাত বাড়িয়েছে, তাদের না দিয়ে আমি বৃথা নৈবেদ্য তৈরী করেছি। তারা আমার কাছে বস্ত্র অলঙ্কারের জন্য বায়না ধরেছে আমি পাথরের মূর্ত্তি সাজিয়েছি। অতি সহজে পেয়েছিলেম বলে তাদের মূল্য দিতে ভুলে গেছি—শ্যাম, তুমি আমার দেবতা চিনিয়ে গেলে—তুমি হামাগুড়ি

দিয়ে আমার আঙিনায় নাড়ু গোপালের অভিনয় ক'রে গেলে। তুমি যে আমাদের সঙ্গে কত লীলা করে গেলে—কত ত্যাগ ও স্নেহ দেখিয়ে গেলে—তা বিফল হ'বে না। আমি তোমার সেবায়—তোমার মধ্যে যে দেবতা পুত্রভাবে আমার সেবা করে গেলেন—তাঁর সেবায় জীবন দেব; তোমার জীবন ও মৃত্যুর শিক্ষা আমি মাথায় ক'রে নিলুম।"

দেবেশ দরজা রুদ্ধ ক'রে অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছিলেন, এখন শ্যামলেশের মধ্যে বালগোপালকে পেয়ে যেন নবশক্তি লাভ করলেন। তিনি চোখের কোণ হ'তে অশ্রুর শেষ বিন্দু মুছে ফেলে, মহিমান্বিত ভাবে দাঁড়ালেন। যে ব্যক্তি জিনিষ হারিয়ে আকুলি-বিকুলি কচ্ছে—এ তার মূর্ত্তি নয়,যে ব্যক্তি বহুমূল্য কিছু পেয়ে বড় কারবারে নামচে, এ যেন তারই দৃঢ় সঙ্কল্পিত মূর্ত্তি। তিনি যথারীতি ভোজন করলেন, আশ্রমের সকলের সঙ্গে মিষ্ট কথায় আলাপ করলেন, কিন্তু অপরাহ্নে আর কেউ তাঁকে সে আশ্রমে দেখতে পেলে না।

---

(২৯)

মেদিনীপুর বন্যার সময় দেখা গেল—একটা খড়ো ঘরের খড়ের চালার উপর একটি স্ত্রীলোক প'ড়ে আছেন, আর প্রায় ডুবু ডুবু হ'য়ে চালাটা জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে। স্বেচ্ছা-সেবকের দল একটা জেলে-ডিঙ্গি, যাতে পেরেকের বদলে বেতের বাঁধ, সেইটি নিয়ে কিছুতেই এগুতে পাচ্ছে না। বিপরীত দিক হ'তে হাওয়া এসে সেই ডিঙ্গিটা ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে স্বেচ্ছাসেবকের দলের মধ্যে একটি লোক তখন ঝাঁপিয়ে জলে পড়্‌ল। সকলে "কি কর ? কি কর ? পারবে না, প্রাণ দেবে" ব'লে চীৎকার করতে লাগ্‌ল। দৈবাৎ সেই সময় একটা বড় কাঠ ভেসে যাচ্ছিল, যুবক সেইটিকে আঁকড়ে ধ'রে প্রবল চেষ্টায় সেই খড়ের চালা ধরে ফেল্লেন এবং তার কোমরে জড়ান দড়ি খুলে সেই চালার একধারে বেঁধে দড়ির আর একটা মুখ ডিঙ্গির দিকে ছুঁড়ে ফেল্লেন। স্বেচ্ছাসেবকের দল অনেকবার বিফলকাম হ'য়ে শেষে দড়ির সেই মুখটা ধরে ফেল্লে। এই অবস্থায় সেই স্ত্রীলোকটি শুদ্ধ চালখানি নিয়ে বহুকষ্টে তারা একটা ডাঙ্গায় উঠ্‌লেন—সেটা একটা প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ বন্যায় সেটি ডোবে নাই।

চালাটা টেনে ভূমির উপর উঠিয়ে তারা যে দৃশ্য দেখ্‌লেন, তাতে সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত ও ভীত হ'লেন। আসন্নপ্রসবা রমণী চালাটি আশ্রয় ক'রে বন্যায় ভেসেছিলেন—এই অবস্থায় প্রসব হয়। তাঁরা দেখ্‌লেন, স্ত্রীলোকটির প্রাণ নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সদ্যঃজাত শিশুটির

তখনও প্রাণ আছে। সে কিছু খাবার জন্য যেন মাঝে মাঝে হাঁ কচ্ছে, ছেলেটি এত দুর্ব্বল যে কাঁদতে পাচ্ছে না। স্বেচ্ছা-সেবকের দলের সঙ্গে বার্লি ও এলেনবাড়ীর কৌটা ছিল—যে লোকটি চালা ধ'রে এনেছিলেন, তিনি দেশলাই কাটি জ্বেলে একটু এলেনবাড়ী গরম ক'রে নিজ পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে—তা দিয়ে সল্‌তে করে সেই সল্‌তে এলেন-বাড়ীতে সিক্ত ক'রে ধীরে ধীরে শিশুর মুখে দিলেন। শিশুর গলা শুকিয়ে গেছ্‌ল—কিন্তু বন্যার মধ্যে এই বিপরীত অবস্থায় যার প্রাণ যায় নাই, ভগবান্‌ই যেন এই লোকটির তৈরী খাদ্যের দ্বারা তার জীবনের একটা নূতন সনন্দ দিলেন। চার পাঁচ দিনের মধ্যে শিশুটি আরোগ্য-লাভ কল্লে, শিশুটিকে স্বেচ্ছাসেবকের হাতে দিয়ে লোকটি কোথায় গেলেন, কেহ বল্‌তে পারলে না।

তারপর পনের দিন পরে যখন জল শুকিয়ে গেছে, তখন দেখা গেল, চারিদিকে পচা পশুপক্ষী ও মানুষের শব, তাদের মধ্যে এক জায়গায় একটা বড় জাম-গাছের খুব উপরকার ডাল হ'তে যেন একখানি কাপড় বাতাসে উড়ছে। স্বেচ্ছা-সেবকের দল মৃতদেহগুলি সরিয়ে একটু পথ ক'রে সেই গাছটিতে চড়ে সেই লোকটিকে দেখ্‌তে পেলেন—তার বুকের কাছে একটি ৬ বছরের ছেলে। দড়ি দিয়ে সে নিজেকে ও শিশুটিকে শক্ত ক'রে ডালের সঙ্গে বেঁধেছে। সেই গাছে প্রচুর কালো জাম হ'য়েছে—শ্রাবণ মাস, সেই জাম যে সে নিজে খেয়েছে ও শিশুটিকে খাইয়েছে, তারও অনেক প্রমাণ পাওয়া গেল। একটা মস্ত বড় ডাল লোকটির প্রায় মাথার কাছে ভেঙ্গে প'ড়েছিল, তা' দেখে বোঝা গেল, খুব প্রবল ঝড় সেইখানে বয়েছিল। তাঁরা বলাবলি কল্লেন—"এ ঝড়টা কাল রাত্রির সেই বড় ঝড়।" পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল—বালক ও সেই লোকটির মধ্যে কেহই মরে নাই—অজ্ঞান হ'য়ে আছে। তারা দড়ির বাঁধন কেটে তাদের

নীচে নামিয়ে আগুনের সেক দেওয়াতে উভয়েরই চৈতন্য হ'ল। বালকটির দাঁত কপাটি লেগেছিল,সে দুই দিন ভাল ক'রে কথা বল্‌তে পারে নি। লোকটি চৈতন্যলাভ করাব পর তাঁরা তাঁকে অনেক প্রশ্ন ক'রে জান্‌তে পার্‌লেন—বন্যার জল যখন একবারে শুকোয় নি,৪।৫দিন আগেকার কথা, তখন এই-দিকে তিনি বালকের কান্না শুনে বিস্তর মড়া ও জঞ্জাল ঠেলে বহুকষ্টে এ গাছটার তলায় এসে দেখেন সেখানে ৪।৫টি লোক মরে আছে,বালকটি তাদের একজনের ক্রোড়ে শুয়ে কাঁদ্‌ছে, সে এত দুর্ব্বল যে নড়তে চড়তে পাচ্ছেনা। সে বল্লে, তার বাপ তাকে বুকে ক'রে সাঁতার কেটে আসছিলেন, কিন্তু এইখানে এসে তিনি হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে হাত দু'খানি অবসন্ন ভারে রেখে হাঁফাতে লাগলেন ও আর কোন কথা বল্লেন না। বালক তাঁকে 'বাবা' 'বাবা'বলে কত ডেকেছে, কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, কথা বল্‌তে পারেন নি। ক্ষুধায় তাঁর প্রাণ যায়, চারদিক থেকে কি রকম গন্ধ—তাতে তার দম্‌ আটকে আস্‌ছে। তখন লোকটি তাকে কোলে ক'রে, কোমরের দড়ি খুলে পিচ্ছল গাছের গায়ে ঠেকা দিয়ে সেই গাছের উপরকার একটা ডালে উঠ্‌লেন, তার পর তিন দিন কালো জাম পেড়ে নিজে খেয়েছেন ও বালককে খাইয়েছেন। পরদিন তিনি তাকে নিয়ে নামবেন এই ঠিক করেছিলেন,—কারণ জল শুকিয়ে গেছে, কিন্তু হঠাৎ রাত্রে এমনই ঝড় হ'ল যে তিনি শক্ত ক'রে মস্ত একটা বড় ডালের সঙ্গে তাঁকে আর বালককে বেঁধে রেখে সেই ঝড়ের বেগ সামলাতে লাগ্‌লেন—অনাহারক্লিষ্ট শিশুটি অজ্ঞান হয়ে পড়্‌ল, এবং তিনিও প্রকাণ্ড ডাল ভাঙ্গার সঙ্গে বজ্রাঘাতে এতদূর বিহ্বল হয়ে পড়্‌লেন যে কখন তার জ্ঞান লুপ্ত হ'য়েছে তা' তাঁর নিজেরই মনে নাই।

এ লোকটি দেবেশ,অল্পদিনের মধ্যে তাঁর অপূর্ব্ব কর্ম্মঠতা ও ত্যাগের কথা এতদূর ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়্‌ল যে বরিশাল ঝালকাটী বাসী এক ধনাঢ্য বনিক

পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করে যে এক অনাথ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা কল্লেন, দেবেশকে তার ভার নেওয়ার জন্য অনুরোধ কল্লেন। শিশু-পরিচর্য্যার সুবিধা পাবেন, মনে করে দেবেশ সম্মত হ'লেন।"

দশ বারটি ছেলে নিয়ে আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হ'ল। দেবেশ 'বালকদাস' নামে নিজের পরিচয় দিলেন। বালকদাস সকাল হ'তে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত প্রত্যহ একটা বাগানের মাটী খুঁড়ে বিচি বুনতেন। 'নববৃন্দাবন' যেরূপ যত্নের সঙ্গে তৈরী ক'রে ছিলেন— এটির পাছেও সেইরূপ যত্ন। বাগানের নানারূপ ফুলের চারা হ'ল, ফুল ফুটল। শাক সবজী জন্মাল। কুমড়ো, বেগুন ও সীমে, একটা দিক ভর্ত্তি হ'য়ে গেল। ছেলেরা ঘুমালে দেবেশ নিজ হাতে তাদের বালিসের ধারে ফুল ছড়িয়ে রাখতেন। কার মুখে হাসিটুকু লেগে আছে, কার মুখে রোগের ছায়া পড়েছে, এ দেখবার জন্য দীপ ঘুরিয়ে তাদের মুখের কাছে আনতেন, হাত-পাখা দিয়ে বাতাস করতেন, ধূপ ও ধূনো জ্বেলে ঘরের মশা মাছি তাড়িয়ে দিতেন। এই ভাবে ধূপ-দীপ-ফুল দিয়ে তিনি বালগোপালের আরতি করতেন। বাগানের শাক সবজী নিয়ে বন্ধুই বামুনকে বিশ্রাম করতে দিয়ে তিনি নিজে রান্না করতেন এবং মনে করতেন বালগোপালের ভোগ দিচ্ছেন। সকাল বেলা সাদা ও রক্ত চন্দন নিজে ঘষে ছেলেদের নাকে, কপালে ও গালে তিলক এঁকে দিতেন, এবং তাঁদের চন্দন-চর্চ্চিত মুখ দেখে মনে করতেন বালগোপাল দর্শন কচ্ছেন। কারও মুখে হাসির রেখা, কেউ 'আমাকে আগে পরিয়ে দিন' বলে গা ঘেঁসে সামনে এসেছে, কেউ 'আমার কাপড় খুলে গেল, পরিয়ে দিন' বলে বালকদাসের হাত ধরেছে, কেউ তিলক প'রে আধ আধ স্বরে গান কচ্ছে ও নাচছে, কেউ বা "আমি লাল চন্দন পরব না, ঐ সাদাটি দিন" ব'লে লাল চন্দনের বাটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। কেউ বালকদাসের দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলছে—'বাবা।

দেখ আমি কেমন একপায় দৌড়িতে পারি”—এই বলে এক পায় ছুটে চল্‌ছে। বালকদাস মৃদু মৃদু হাস্‌ছেন ও ভাব্‌ছেন,“এই হচ্ছে যশোদার আঙ্গিনায় বালগোপালের লীলা, এ লীলার মর্ম্ম শ্যামলেশ আমাকে বুঝিয়ে গিয়েছে।” বিকালে নিজ হাতে অনেকের পা ধুইয়ে, গা মুছিয়ে, সাজিয়ে বাগানে নিয়ে যান, কারু কানে ফুল পরিয়ে দেন—কারু ঘোড়া হয়ে তাকে পিঠে নিয়ে দৌড়িতে থাকেন, কাকেও গাছের ফল পেড়ে দেন, যেন একাই একশ হাতে তাদের সেবা করেন। তারা সবাই তাকে ‘বাবা’ বলে জানে. কেউ তাঁর পিঠের উপরে উঠ্‌ছে, কেউ তার পায়ে লুটোচ্ছে, কেউ বল্‌ছে ‘বাবা তোমার মাথায় চন্দন পরিয়ে দি,” এই বলে একটা খুরি থেকে মাটি নিয়ে জলে গুলে তাঁর কপালে লেপ্‌ছে—তিনি মৃদু মৃদু হাস্‌ছেন।

সকালে দেখা যায়, তিনি ছেলে গুলিকে নিয়ে ছবি আঁকা শিখাচ্ছেন। কেউ উট আঁক্‌ছে, কেউ হাতের মুঠ আঁক্‌ছে—কেউ সোজা ক’রে লাইন টানা শিখ্‌ছে। সকলের ছোট ছেলেটি দুইটি বড় বড় কালির ফোঁটা এঁকে তাদের মধ্যে একটা সোজা টান মেরে বল্‌ছে, “এই ছাখ্, বাবা, কেমন সুন্দর নাক ও চোখ এঁকেছি।” “বাহাবা” বলে বালকদাস তার পিঠে একটা কোমল চড় মেরে হাস্‌ছেন। তিনি তাদের সা, ঋ, গা মা ভেজে গান গাইতে শিখাতে সুরু কল্লেন, এবং নানারূপ উপাখ্যান বলে বই পড়ার জন্য কৌতূহলী কল্লেন, বাবাজি শ্যামলেশকে যে ভাবে শিখিয়েছিলেন, তা তিনি জানতেন। সেই উপায়ে এদের ভেতর বিদ্যার বীজ বপন কল্লেন।

তারা তাঁকে ভিন্ন জানত না, তিনিও তাদের ভিন্ন জান্‌তেন না। তাদের তিনি বলে রেখেছিলেন—“তোদের মা আছে, তিনি আস্‌বেন” তারা রোজ রোজ তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা কর্‌তো, “মা আস্‌বেন কবে

বাবা ?” তিনি বল্‌তেন, “তিনি আস্‌বেন, তিনি তোদের মত একজনকে হারিয়ে পাগল হ'য়ে আছেন, একটু ভাল হ'লে আস্‌বেন।” তুলসীকে তিনি নিজের কোন সন্ধান দেন্ নি। “ভগবান যেদিন মিলিয়ে দেবেন, সেইদিন মিলব, তার পূর্ব্বে হৃদয়ের ব্যাকুলতার জন্য তাকে ডাক্‌ব না, সে আমার ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না, অবশ্য খুঁজে খুঁজে আস্‌বে। নববৃন্দাবন ও শ্যামলেশের শোক দূর হ'লে যখন সে নিত্য বৃন্দাবনে বালগোপালের লীলার আভাস্ পাবে, তখন সে দেখ্‌বে তার হৃদয় যা' চায়, আমি তাই তৈরী ক'রে তার প্রতীক্ষা করছি।'

ছেলেরা বল্লে “আমাদের মা কেমন ?” বালকদাস বল্লেন, “মা আবার কেমন থাকে ? মায়ের মত, ছেলেরা মা পেলে কি আর কাউকে চায় ?”

“আমরা আমাদের বাবাকেও চাব,—মা বাবা দুজনকেই চাব।”

বালকদাস···“দেখিস্ মা পেয়ে বাবাকে ভুলিস্ না যেন।”

শান্তিরাম দাস ৫০০০০৲ টাকা দিয়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন, তারপর ভবতোষ মজুমদার ২০০০০৲ টাকা, এবং কীর্ত্তিপাশার রাজকুমার বাবু ৩০০০০৲ টাকা এই আশ্রমকে দান করেন। দেবেশ নিজে পড়াশুনা কর্‌তে লাগ্‌লেন—কারণ ছেলেদের শিখোতে হ'বে।

যারা সেই আশ্রম দেখ্‌তে আস্‌তেন তারা অবাক হ'য়ে যেতেন; বনস্পতিকে ঘিরে যেমন পুষ্পিত লতাগুলি শোভা পায়, বালকদাস ছেলেদের কাছে সেই বনস্পতির মত ও ছেলেরা বালকদাসের নিকট সেই পুষ্পভারনতা লতার মত। তারা কি সুন্দর রাগিনী ভাঁজে, কি সুন্দর ছবি আঁকে, পৃথিবীর ম্যাপ এঁকে নদ-নদী পর্ব্বত, হ্রদ ও নগরগুলি কেমন সুন্দর ভাবে তার মধ্যে দেখিয়ে দেয়, তারা পুরাণের গল্প বলে সকলকে কাঁদায়, মুক্তার মত অক্ষরে ইংরেজী

বাঙ্গলা, দেবনাগরী লেখে। তারা মাটী দিয়ে কি সুন্দর খেলনা তৈরী করে, তারা দেবেশের কাছে কেমন আনন্দে একশবার ছুটে এসে 'বাবা' বলে ডাকে—ছবি এঁকে, ম্যাপ এঁকে, হাতের লেখা শেষ ক'রে—তারা কেমন আগ্রহে বালকদাসকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে দেখায়।

তা' ছাড়া তারা কে কত উঁচুতে লাফ্ মারতে পারে, কে খুব উঁচু গাছে তাড়াতাড়ি উঠতে পারে—জলে কে কত রকমের সাঁতার কাটতে পারে—এ নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে এবং বাবাকে তাক্ লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বালকদাস কারও কারও কৃতিত্ব দেখে 'বা' 'বা' 'বা' ব'লে যেন তার সত্যই তাক্ লেগেছে এই ভাবে ছেলেদের উৎসাহ বৃদ্ধি কচ্ছেন। একটি ১০ বর্ষীয় বালক এক হাতে তুড়ি মেরে, আর একখানি হাত দিয়ে বইএর উপর তাল ঠুকে এমনই মুখের ভঙ্গী করে সা, ঋ, গা মা সাধ্‌তে লাগল, যে শান্তিরাম দাস তা দেখে হেসে খুন এবং বালককে খুব উৎসাহ দিয়ে আদর করতে লাগলেন।

বালকদাস একজনকে ডিঙ্গিয়ে আর একজনকে পুরস্কার দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না, তারা তাঁর স্নেহ-গুণে আনন্দের সঙ্গে সকলেই কাজ করত—যে যার যথাসাধ্য করত। এদের মধ্যে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব এনে কারু দেমাক্ বাড়িয়ে দিয়ে, কারু মাথা হেঁট করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রত্যেকের মধ্যেই কোন না কোন বিশেষ শক্তি আছে, সেইটি যাতে পুষ্ট হ'তে পারে, তাই করতেন—প্রত্যেকের সেই শক্তি আবিষ্কার করতেন, যে শুধু গাইতে পারে তাকে ছবি আঁকতে দিতেন না।

'কই মা ত এল না!' এই প্রশ্ন দিন রাত বালকদাসকে শুনতে হ'ত। তিনি বলতেন "তোরা কি তপস্যা করেছিস, যে মা পাবি?

মা যে স্নেহের অমৃতে গড়া, ছেলেদের কাছে কি আর মায়ের চেয়ে বেশী কিছু আছে? এমন মায়ের জন্য তোরা কি তপস্যা করেছিস্,—যে বল্লেই তিনি আস্‌বেন?"

"কি কর্‌তে হবে বল—আমরা তাই করব," "সন্ধ্যায় মালা গেঁথে রাখিস্—তাঁর পায়ের নুপুর করে পরাবি, শাঁখ বাজাস্, যেন তিনি এসে অভ্যর্থনা দেখে খুসী হন, ঘরের দোরে মঙ্গল ঘট স্থাপন করিস্, গান গেয়ে তাঁর বন্দনা করিস্, তবে ত তিনি আস্‌বেন।"

সেই দিন হ'তে তারা তাই ক'রে; দীপ জ্বেলে একটা ঘণ্টা তাঁর আসার প্রতীক্ষায় বসে থাকে, ফুল নিয়ে পায়ে পরাবে বলে মালা গেঁথে রাখে, শাঁখ বাজিয়ে বন্দনা গীত গায়, এবং মঙ্গলঘট স্থাপনা ক'রে ঘরের দরজায় আল্‌পনা দিয়ে কার যেন পদাঙ্কের জন্য প্রতীক্ষা ক'রে থাকে।"

একমাস দু'মাস গেল, তিনি এলেন না। বৎসর ঘুরে গেল, তিনি এলেন না। দু বছর যায় যায়,—শারদীয় সন্ধ্যায় একদিন মা সত্যই এলেন, সঙ্গে কানাই বাবাজি। ছেলেরা চোখের জল ফেলে 'মা' 'মা' বলে ডেকে উঠ্‌ল, পায়ে বকুল ফুলের নুপুর পরিয়ে দিলে,—শাঁখ বাজায়ে, দীপ নিয়ে এসে আরতি কল্লে, এবং ছোট ছোট ছেলেরা হাত বাড়িয়ে বল্লে, "মা আমায় আগে কোলে নে।"

একি মায়ের মূর্ত্তি! এলো চুল, কঙ্কাল-সার, কিন্তু মমতার খনি, চোখ-মন-জুড়ানো, প্রাণ-ভুলানো স্নিগ্ধ দৃষ্টি। অনশন কৃশ—সৌন্দর্য্য নাই; কিন্তু স্নেহের লাবণ্য যেন গা হ'তে ঝরে পড়ছে। এই তো মা! ছেলেরা আনন্দে কলরব ক'রে 'মা' 'মা' বলে ডাক্‌তে লাগল। দেবেশ এসে বল্লেন, "তুমি আমার কাছে শ্যামলেশকে চাইবে,—আমি তাই তোমার এক ছেলে গেছে, তার জায়গায় কত ছেলে,

ক

তৈরী করে রেখেছি।" তুলসী আর এ করুণ আনন্দ সাম্‌লাতে পার্‌লেন না, ফুলটি যেমন ঝড়ে নুইয়ে পড়ে, তেমনই করে স্বামীর পায়ে ঢ'লে পড়লেন। এই মিলন দেখে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে কানাই বাবাজি সরে দাঁড়ালেন। এই আশ্রমে বাপ মা তাঁদের শিশু সন্তানগুলির অভাব অভিযোগ ও শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে ব্যস্ত হয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দিলেন—কিন্তু এই পরিবার ঠিক আর আর পরিবারের মত নয়। ত্যাগ ইহার ভিত্তি, সেবা ইহার ব্রত—আসক্তি ইহাদের আঙ্গিনায় পা' দিতে পারে না, -ইহাতে রোগ, শোক, মৃত্যু, আনন্দ হরণ করতে পারে না, তাঁরই লীলার নূতন কোন অঙ্ক দেখিয়ে কিছু দিয়ে যায়,—হরণ করে না।

———

(৩১)

কানাই বাবাজি সিন্দূরতলা পৌঁছে শুনলেন, শ্যামলেশ চারদিনের জ্বরে মারা পড়েছে। তিনি তুলসী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন না---কারণ তুলসী এখন হৃদয়েশের বাড়ীতে। শীঘ্র দেবেশকে সিন্দূরতলায় নিয়ে এসে তুলসীদেবীকে সঙ্গে ক'রে সেই গ্রাম ত্যাগ কর্বেন, এই স্থির করলেন। এর মাঝে একবার তুলসীদেবীর সঙ্গে দেখা না ক'রেই বা কি ক'রে যাবেন? সে এই দারুণ শোক পেয়েছে, তিনি এসেছেন তা সে শুনেছে, এখন দেখা না ক'রে যাওয়া কি উচিত? প্রথমতঃ তিনি শ্যামলেশের মৃত্যুর কথা গোপন করে দেবেশকে চিঠি লিখেছিলেন। শেষে ভাবলেন, আশ্রমের কর্ম্মচারী রঘুপতি চোবের নিকট খবরটা থাক, তারপর শেষে যা করতে হয় করা যাবে। রঘুপতির নিকট যে চিঠি লিখেছিলেন, তা' দৈবাৎ দেবেশের হাতেই পড়ে গেল—এবং দেবেশ সেই সংবাদ পেয়ে আশ্রম ত্যাগ কল্লেন।

দেবেশকে যে রাত্রে তাঁর দাদা মুমূর্ষু অবস্থায় রেখে গৃহে ফিরে যান, সেই রাত্রে দেবেশ ফিরে না আসায় তুলসী বড়ই ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। তাঁর লোক জন কেউ নাই, দুপুর রাতে শ্যামলেশের হাতে লণ্ঠন দিয়ে নিজেই বার হ'য়ে পড়লেন। বাগানে গিয়ে দেখেন কেউ নেই। বাবাজির ঘরে তালা বন্ধ। তিনি তো সুন্দরগঞ্জের হাটে রং কিনতে গেছলেন। আটটার মধ্যেই ত ফেরবার কথা—রাত বারটা বেজে গেছে। এরা দুজনে গেলেন কোথা? তুলসীর হৃদয়টা দুর্ দুর্ ক'রে কেঁপে উঠলো।

দুজনে বাড়ী ফির্‌লেন। শ্যামলেশেরও চোখের ঘুম চ'লে গেছে। তার সঙ্গে বসে বসে তুলসী তাঁর মনের নানারূপ আশঙ্কার কথা বলাবলি কর্‌তে লাগলেন। পাশের কোন বাড়ীতে কুকুর ডেকে উঠে, আর অমনি কথা থামিয়ে কান পেতে শোনেন; শেয়াল কি বেড়াল শুকনো পাতার উপর খস্ খস্ শব্দ ক'রে চ'লে যায়, আর তখনই দোরের কাছে এসে খিল খুলে চারিদিকে চান। নাতিমৃদু-স্বরে "বাবা এসেছ" বলে শ্যামলেশ একটু এগিয়ে পথ দেখ্‌তে থাকে! একটা বেজে গেল—কেউ এল না। তুলসী বল্লেন- "শ্যাম, তুই একবার তোর জ্যাঠা মহাশয়ের বাড়ী যাবি ?"

"তাদের দরোয়ানেরা কি দরজা খুলে দেবে? আমায় ময়লা কাপড়ে সে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেয় না, এত রাত্রে চেঁচিয়ে মর্‌লেও তারা আমল দেবে না। কাপড় জুতো যে দিন থেকে ফিরিয়ে দিয়েছ, সে দিন থেকে জ্যাঠামশায় আমায় মুখ দেখ্‌লে ঘেন্নায় মুখ ফিরান। তিনি কি আমার কোন কথা শোন্‌বেন? তবে যেতে বলছ, গিয়ে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পারি।"

তুলসী ভীত ও ছল্ ছল্ চোখে বল্লেন "থাক্ গিয়ে কাজ নেই, কিন্তু পাথরে শাবল মার্‌লে যেরূপ শব্দ হয়, তার বুকের 'ওঠা পড়ার শব্দটা তেমনই বড় হ'য়ে তার কাণে ঠেকছে, কেন যেন তাঁর মনে তাঁর স্বামীর জন্য একটা ভয় হ'য়েছে, কানাইবাবুজি সঙ্গে আছেন এই যা ভরসা।

শ্যাম বল্লে, "সুন্দরগঞ্জে কানাইদাদা গিয়ে যদি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন ও খবর পাঠিয়ে থাকেন—তবে বাবা হয়ত ছুটে গেছেন, আমাদের ব'লে যাবার সময় পান নি।"

তুলসী একথা অনেকটা সম্ভবপর মনে ক'রে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্লেন, তবে হৃদয়ের উদ্বেগ কিছুতেই কম্‌ল না। সেই নীরব রাত্রিকে অতি

আস্তে উদ্বেগ ও আশঙ্কায় মৃদু কথায় যেন ব্যস্ত ক'রে যখন এই দুটি প্রাণী নানারূপ ভাবনার আশ্রয় নিতেছিল, এমন সময়—রাত তখন প্রায় দুটো—সত্যই বাড়ীর কাছে খুব জোরে পাদক্ষেপ শোনা গেল, আশপাশের সকলগুলি কুকুর ডেকে উঠলো ও শব্দটা দেবেশের বাড়ীর খুব নিকটে এল। মাতা ও পুত্র এই আগন্তুক কে, জানবার জন্য কৌতূহলী হ'য়ে খানিক কথা বন্ধ ক'রে দরজার কাছে দাঁড়ালেন। জুতার শব্দ এসে দোরের কাছে থামল—এবং" মাইজি দরজা খোল্‌নে হ'গা চিঠ্‌ঠি আয়া।" হিন্দুস্থানীর এই আহ্বান শুনে শ্যামলেশ দরজা খুলে দিল। দরোয়ান কিশোর রায়ের চিঠি নিয়ে এসেছিল। শ্যাম ও তার মা খুব ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌বেন, এই আশঙ্কায় কিশোর রায় বাড়ীতে ফিরে এসেই এই চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলেন। চিঠিতে এই লেখা ছিল—

"শ্যামলেশ, তোমার বাবা ও কানাই বাবাজি তীর্থদর্শনে চলে গেছেন, তাঁরা তোমাদের ব'লে যাবার অবকাশ পাননি, শীঘ্র ফেরবার সম্ভাবনা নেই। তোমরা ব্যস্ত হ'য়ো না, দরকার হ'লে আমায় বলে পাঠিও, আমি তোমাদের যা' কিছু ব্যবস্থার দরকার কর্‌ব। কিশোর রায়।

দরোয়ান বিদায় হ'য়ে গেল। তুলসী চিঠিখানি হাতে ক'রে ব'সে রইলেন। তাঁর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। "তীর্থদর্শন" এ কিরূপ? এই আঙ্গিনা যেখানে রাধামাধব আছেন, তার কাছে আবার তীর্থ কোথায়? এই "নব-বৃন্দাবন" যার ফুল রাধামাধবের আরতিতে লাগে, পূজার জন্য তোলা হয়—এর চাইতে আবার বড় তীর্থ তাঁর কাছে কোন্‌টি? তুলসী তাঁর স্বামীকে চিন্‌তেন, কোন তীর্থের প্রতি অনুরাগের কথা তো কোনদিন দেবেশ বলেন নি। এই ১৮ আঠার বছরের মধ্যে একটি রাতও তো তিনি বাড়ী ছাড়া কোথাও থাকেন নি? তবে কি কানাইবাবাজি

তাঁর মাথায় এই খেয়াল দিয়েছেন ? তা'হলেও তো তিনি বলে ক'য়ে যেতেন, কানাইবাবাজি তো তাঁদের সুখের সুখী, দুঃখের দুখী, এমনভাবে না ব'লে ক'য়ে তাঁর স্বামীকে নিয়ে যাবেন ?"

শ্যামলেশ বল্লে—"সে তো হোতেই পারে না। কানাইদা চোরের মতন বাবাকে লুকিয়ে নিয়ে যাবেন, এতো হ'তেই পারে না. আর বাবার তীর্থ যাওয়ার কথাও মিথ্যে, বাবা রাধামাধবের আরতি না ক'রে কোথাও থাকতে পারবেন না : এজন্য এ জায়গা ছেড়ে তাঁর নড়বার যো নেই। নববৃন্দাবনের নূতন মল্লিকার চারায় যে কাল ফুল ফুটবে, তিনি অতি প্রত্যূষে দেখতে যাবেন একথা কাল সন্ধ্যাবেলা আমায় বলেছেন—হঠাৎ তীর্থে যাবেন একথা বিশ্বাস্যই নয়।"

তুলসী মনকে সামলাতে পারলেন না। "তিনি শীঘ্র ফেরবেন না" এর মানে কি ? মাথা ঘুরতে লাগল, বুকের ওঠা-পড়া যন্ত্রণাদায়ক হ'য়ে উঠল। তিনি বল্লেন, "শ্যাম তুই ঘুমিয়ে পড়। সারারাত জাগলে অসুখ করবে। আমি রাধামাধবের মন্দিরে যাই।" এই ব'লে তাড়াতাড়ি এলো-থেলোভাবে তিনি রাধামাধবের ঘরের কুলুপ খুলে—যুগলমূর্ত্তির পায়ের নীচে ধন্না দিয়ে পড়ে রইলেন—"আমার স্বামীকে ভাল রাখ" শুধু এই প্রার্থনা। সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন করজোড়ে একমুখী হ'য়ে এই এক নিবেদন জানাচ্ছে, তুলসীর চক্ষু কর্ণ কিছু দেখছে না, শুনছেনা, সমস্ত মন ব্যাকুল হ'য়ে ডাকছে—"হে রাধামাধব, আমার স্বামীকে ভাল রাখ।" পরদিন দেখা গেল শ্যামলেশও ঘুমোয়নি। তুলসী রাধামাধবের পায়ের কাছে পড়েছিলেন, শ্যাম তার মায়ের পায়ের কাছে বসে বসে রাত কাটিয়ে দিয়েছে।

সকালে 'মা' 'মা' বলে শ্যাম সাড়া পেলে না। তখন বার হ'য়ে চিঠিখানি নিয়ে আস্তে আস্তে হৃদয়েশের বাড়ীতে গেল। আশ্চর্য্যের

বিষয় হৃদয়েশ সেইদিন দোতলার উপর থেকে তাকে আসতে দেখে নিজে নীচে নেমে এসে তার সঙ্গে কথা ক'য়ে তাকে উপরে নিয়ে এল। শ্যাম কিশোর রায়ের চিঠিখানি তাকে দেখাল। চিঠি পড়ে হৃদয়েশ বিস্মিত হ'য়ে পড়্‌ল। কাল সারারাত্রি সে ঘুমোয় নি। ভ্রাতৃহত্যারূপ পাপ, তা কি উৎকট। কত দুশ্চিন্তা, ভয় ও অনুতাপের মধ্য দিয়ে তার রাত কেটে গেছে। সে দেবেশকে খুন করবার সংকল্প করে যায়নি। খুনটা হঠাৎ হ'য়ে গেছে—সুতরাং তার প্রাণে একটা ভয়ানক যন্ত্রণা হয়েছে। চিঠি কিশোর রায়ের নিজ হাতে লেখা—এ লেখা সে খুব চেনে। কত দলিল-পত্রে সে রাঙ্গাবাবুর স্বাক্ষর রোজ রোজ দেখেছে, এ যে কিশোর রায়ের লেখা তাতে সংসয়মাত্র নেই। কাল যে মরে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল, যাকে পুঁতে ফেলান হ'ল, সে তীর্থে গেল কিরূপে? এর মধ্যে কোন ভয়ানক ষড়যন্ত্র আছে, এই ভেবে হৃদয়েশের মুখ শুকিয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ দেবেশের অদর্শন হওয়ায় লোকেরা নানাস্থানে সন্ধান করতে, নানারূপ অনুমান করতে থাকৃত। সে তো এখন দেবেশের শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, সুতরাং অনুমানগুলির মধ্যে তাকেই জড়াম হ'ত। এখন কিশোর রায় স্বয়ং বলছেন, সে কানাইবাবাজির সঙ্গে তীর্থে গিয়েছে, গ্রামের লোকেরা দ্বিরুক্তি না ক'রে এ কথা বিশ্বাস করবে। এই ভাবটা মনে একটু সোয়াস্তি দিল, কিন্তু ব্যাপারটা শুভ কি অশুভ তা' কিছুতেই সে ঠিক করতে পারলে না। কিন্তু যাহ'ক, আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে মনের ভাব গোপন ক'রে হাসিমুখে ভাইপোকে বল্লে, "নববৃন্দাবন" ছেড়ে তোর বাবা বোধ হয় আসল বৃন্দাবনটা দেখতে গেছেন। তা' ভালই হ'য়েছে, —একবারে ঘরে বসে বসে কুয়োর ব্যাং হ'য়ে পড়েছিল, তা একটু বাইরে গিয়ে পৃথিবীটা দেখে আসুক। কিশোর রায় নিশ্চয়ই খরচটা জুগিয়েছেন। যা' তোর মাকে বল্‌গে, এটা ভাল খবর, এতে ভাববার কিছু নেই।"

শ্যামলেশ এই কথা শুনে যেন একটু আশ্বস্ত হ'ল। সে বাড়ী এসে দেখেলে তার মা রাধামাধবের পায়ের তলায় অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছেন। পাড়ার, বিষ্ণু চাটুর্য্যের স্ত্রীকে সে ডেকে নিয়ে এল। মনার মা বুড়ি তার নাতবৌ শশীকলাকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হ'ল; দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরও অনেক লোক সেখানে ভিড় কর্‌ল। তুলসীকে বিষ্ণু চাটুর্য্যের স্ত্রী মাথায় তেলজল দিয়ে হাওয়া করতে লাগ্‌ল। তিনি ধীরে ধীরে চোখ মেল্লেন। শ্যামলেশের দূর সম্পর্কীয় এক বুড় পিসি চীৎকার ক'রে বল্লে, "বউ এ তোমার কেমনধারা? সে তীর্থ করতে গেছে, ব্যাটাছেলেরা কত জায়গায় গিয়ে থাকে। তুমি এমন কান্নাকাটি অমঙ্গল কচ্ছ কেন বল দেখি? দুধের বাছা শ্যাম পাগলের মত এর দোরে ওর দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এ তোমার কি আক্কেল?"

তুলসীর তখন জ্ঞান হ'য়েছে। তিনি ঘোমটাটা টেনে দিয়ে উঠে বস্‌লেন। লোকজন যারা এসেছিলেন, তাঁরা চলে গেলেন। অতি ক্ষীণস্বরে তুলসী বল্লেন, "বাছা শ্যাম, আমি এই রাধামাধবের দোর গোড়ায়ই পড়ে থাক্‌বো—আমার মন কিছুতেই সোয়াস্তি পাচ্ছে না। আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌লে তুই আর সোর-গোল ক'রে একে তাকে ডাকতে যাস্‌নে, আমার মাথায় একটু তেলজল দিয়ে হাওয়া করিস্, তাহ'লেই ভাল হ'ব। মাথাটা চরকার মত ঘুরছে, আমি বস্‌তে পাচ্ছিনা।" এই ব'লে আবার শুয়ে পড়্‌লেন।

শ্যামলেশ চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে রাধামাধবের ভোগ রাঁধলে। নিজে যেরূপ পারে, ভক্তির সহিত তুলসীপাতা দিয়ে যুগলমূর্ত্তিকে নিবেদন করে, মাকে ডাক্‌তে লাগ্‌ল—মা বল্লেন, "আমি মাথা তুল্‌তে পাচ্ছিনা—তুই খা আমি কিছু খাব না।"

"মা একটু দুধ খাও।"

"আমি আজকার দিন ও রাত নিরম্বু উপোস করব, এই সংকল্প করেছি, কাল থেকে খাব। তুই খেয়ে নে,—তোর ঠোঁট দুখানি শুকিয়ে গেছে।"

কাঁদতে কাঁদতে শ্যামলেশ খেতে বসল। যা কিছু মুখে দিয়ে, মায়ের মাথার কাছে বসে তাকে বাতাস করতে লাগল, সন্ধ্যায় ঘরে দীপ জ্বেলে আরতির উদ্যোগ কল্লে; কাঁদতে কাঁদতে বাসন-কোসন মার্জ্জনা করল, ঘর নিকোল। একদিনে মায়ের চোখ বসে গেছল—ঘন ঘন তাঁর জ্ঞান লোপ পাচ্ছিল—তার বাবা কোথায় গেছেন? স্নেহের দুলাল আজ দুঃখের অন্ত না দেখে ভয় পেয়েছে। সে রাতে যা'কিছু জলটল খেয়ে রাধামাধবের ঘরে মায়ের পায়ের কাছে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু শুধু মেজের উপর শোওয়ায়—ও রাত দিন এমন খাটুনি খেটে, দুশ্চিন্তা ক'রে তার শরীর বড়ই খারাপ বোধ করলে। বুকের বেদনায় সে সারারাত হাঁস-ফাঁস করতে লাগল।

(৩২)

শ্যাম চলে যাওয়ার পর হৃদয়েশ দরোয়ান পাঠিয়ে কবুলখাঁ ও রজ্জবালিকে বাড়ী নিয়ে এসে গোপনে জিজ্ঞাসা কল্লে, "কাল তোরা মড়াটা পুঁতে ফেলেছিস্।"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"কোথায় পুঁত্‌লি?"

"ঘোষেদের জঙ্গলে, হুজুর যেরূপ বলেছিলেন।"

"কোন গোলযোগ হয় নি, দেখিস্, ঠিক বল্‌ছিস্ তো?"

"আজ্ঞে কোন গোল হয় নি। ঠিক বল্‌ছি।"

তারা গিয়ে যে মড়া পায়নি, এ কথা গোপন ক'রে গেল। হৃদয়েশ মনে একটু সোয়াস্তি পেয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। তারপর কিশোর রায়কে একখানি চিঠি লিখ্‌লেন : তার ভাইপো নাবালক, ভাই দূরদেশে দীর্ঘকালের জন্য তীর্থ দেখ্‌তে গেছেন। নববৃন্দাবনটা রাজাবাবুর জমিদারীর অন্তর্গত। এখন থেকে হৃদয়েশই হচ্ছেন অভিভাবক। রাজাবাবুর খাতাপত্রে যেন দেবেশের প্রতিনিধি ব'লে তার নামই লেখা হয়।

চিঠির উত্তর এলো—"আপনি নববৃন্দাবনের উপর কোনরূপ অভিভাবকতা করবেন না, তার ব্যবস্থা এখান থেকেই করা হচ্ছে।"

এই উত্তর পেয়ে হৃদয়েশ রাগে জ্বলে উঠ্‌ল। "ব্রহ্মোত্তর জমি, এর উপর জমিদারের কোন অধিকার নেই। দেবেশ ওঁর উপর জমির ভার দিয়ে গেছে—একথা যদি বলেন—তবে সর্ব্বৈব মিথ্যা। কারণ সে তীর্থে যায় নি—মহাপ্রস্থান করেছে। এখন আইনতঃ জমির অভিভাবক আমি, শ্যাম নাবালক। জমিদারী সেরেস্তায় একটা নাম থাকা ভাল, এজন্য

শুধু ভদ্রতা ও সৌজন্যের অনুরোধে আমি চিঠিখানি লিখেছিলেম। কিন্তু উনি উড়ে এসে জমির ব্যবস্থা করবার কে? দেবেশের স্বাক্ষর জাল ক'রে, হয়ত উনি ভার পেয়েছেন এইরূপ একটা মিথ্যা চিঠি উপস্থিত করতে অবশ্যই পারেন। কারণ দেবেশের বাগানটির প্রতি যে ওঁর লোভ আছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই, নিজে সে বাগানে মাঝে মাঝে গেছেন, তা' সকলেই জানে।"

কিন্তু হৃদয়েশের মনের ভিতর পাপ ছিল এবং এই তীর্থ-দর্শনের মিথ্যা সংবাদটি রাজাবাবু কেন প্রচার করছেন, এটি কিসের ষড়যন্ত্র—তা বুঝতে না পেরে—ব্যাপারটা তার কাছে কতকটা ভয়ের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল,—এজন্য এ সম্বন্ধে কি করবেন, তা ঠিক করতে পাল্লেন না।

রতন কবিরাজ বেলা ৩ টার সময় এলে বৈঠক-খানায় বসে বসে কি করবেন, তার পরামর্শ করতে লাগলেন।

কবিরাজ বল্লেন, "দেবেশ তো তীর্থে গেছে। ১০ বছরের মধ্যে যে ফিরবে তার সম্ভাবনা নেই, এখন তুমিই তো হচ্ছ শ্যামের অভিভাবক, বাগানটি দখল ক'রে বস।"

হৃদয়েশ......"তা হবার যো নেই। দেবা কিশোররায়কে তার নাবালক ছেলের অভিভাবক স্থির ক'রে গেছে।"

কবিরাজ......"কি আপদ! এই ছেলেটার জন্যে তোমার এত দিনকার সাধ অপূর্ণ থাকবে—এ হ'তেই পারেনা। এ কাঁটাটাকে সরিয়ে ফেল্লেই ত সুবিধে। তার পর তোমার ভাতৃবধূর কাছ থেকে কিছু টাকা দিয়ে বাগানটা ও বাড়ী ঘর লিখিয়ে নিলেই হবে। তা' হলে কিশোর রায় আর কি করতে পারবেন?"

ছেলেটাকে সরিয়ে ফেলবার কথায় হৃদয়েশ শিউরে উঠলেন। কিন্তু এই সময় রাজনারায়ণ নথীপত্র নিয়ে জরুরী বৈষয়িক কথা বলতে এল—

সুতরাং কব্‌রেজ মহাশয়কে বিদায় দিয়ে হৃদয়েশ জমিদারী কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন।

এর মধ্যে শ্যামলেশের ভয়ানক জ্বর হওয়াতে, হৃদয়েশ নিজে গিয়ে তার মা ও তাকে আপনার বাড়ীতে নিয়ে এসেছেন। দেবেশকে খুন করে তার মনে খুব অনুতাপ হয়েছিল—সুতরাং তাদের আনার মধ্যে কোন ষড়যন্ত্র ছিল না। তুলসী কিছুতেই স্বীকৃত হ'তেন না, কিন্তু পাছে শ্যামের অযত্ন বা চিকিৎসার ত্রুটি হয়, এই ভয়ে স্বীকার পেয়েছেন। শ্যামের অবস্থা যে খুব ভাল, তা মোটেই নয়। তবে বাঁচ্‌বার আশা ছিল। এই অবস্থায় রতন কব্‌রেজ এসে চিকিৎসা সুরু ক'রে দিল। রাতদিন বুকে পুল্টিশ লাগান, নানারূপ মালিস করা চল্‌তে লাগ্‌ল। তজ্জন্য অনেক লোক হৃদয়েশ নিযুক্ত ক'রে দিলেন, সুতরাং তুলসী ছেলেকে দেখ্‌বার সুবিধে মোটেই পেতেন না। কখনও কখনও মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত আতঙ্ক ও স্নেহপূর্ণ দুটি চোখ নিয়ে উঁকি মেরে—তার বড় দুঃখের ধন শ্যামকে দেখ্‌তে যেতেন এবং শ্যামের চোখ দুটিও ঘোর বিকারের মধ্যে দরজার ফাঁকে তার মায়ের সন্ধান কর্‌ত।

রতন কবিরাজ এই অবস্থায় যে সকল ঔষধ দিলেন, তাতে রোগ ভয়ঙ্কর বাড়তির মুখে চল্ল। চার রাত্রি জ্বর ভোগ ক'রে শ্যাম ইহধাম ত্যাগ ক'রে চলে গেল।

হৃদয়েশ এই দুর্ঘটনায় বড়ই শোক পেলেন এবং যখন রতন কব্‌-রেজের মুখে শুন্‌লেন, তাঁর চিকিৎসা কণ্টকটা কাটা সরাবার উদ্দেশ্যেই চলেছিল, তখন অনুতাপে একবারে দগ্ধ হ'তে লাগ্‌লেন। তিনি বল্লেন, "কবরেজ মশায় ক'রেছেন কি? বংশে বাতি দিতে যে কেউ রইলনা, আমি নিঃসন্তান।"

"কেন আপনিই তো ওকে আপনার পথের কাঁটা মনে করেছিলেন,

ওঁকে সরালে যে আপনার মনস্কামনা সিদ্ধি হবে, এতো আমি পূর্ব্বেই বলেছিলেম, এবং আপনি তা' অনুমোদন করেছেন বলেই আমার মনে হ'য়েছিল। ওকে আর ওর মাকে আপনার এ বাড়ীতে আনার উদ্দেশ্যও আমি এইটে ব'লে মনে. ক'রেছিলুম।"

হৃদয়েশ···"ভুল বুঝেছিলেন, কবিরাজ মহাশয়। সে দিন যখন আপনি কাঁটা সরাতে হ'বে বলেছিলেন, তখন আমি ভয়ে আঁৎকে উঠে ছিলেম, কিন্তু তখন রাজনারায়ণ আসাতে আমি আমার মনের ভাব খুলে বল্‌তে পারিনি। আহা বাছার মুখখানি কি সুন্দর! মরবার পর পাড়ার ছেলেরা তাকে ফুল দিয়ে সাজিয়েছিল, ফুলগুলির মধ্যে—মুখ খানি একটি শুক্‌নো ফুলেরই মত দেখাচ্ছিল। ছোট লোকেরা, গয়লা, সদ্গোপ ও তাঁতির ছেলেরা, যারা ওদের বাড়ীতে আরতির সময় নাম গাইত, তাদের যদি কান্না দেখ্‌তেন,—কালিদয়ের জলে কৃষ্ণের অদর্শন হ'লে রাখালেরা হ্রদের পাড়ে বুঝি এম্‌নি ক'রে কাঁদছিল! গালে হাত দিয়ে বসে তারা চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল। একটি বামুনের ছেলে শ্যামের গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছিল, অপর একজন শ্বেত চন্দন দিয়ে তার মুখে অলকা-তিলকা আঁক্‌ছিল ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছিল। তার মা—"আমার শ্যা—"বল্‌তে গিয়ে শ্যাম কথাটি শেষ করতে পারে নাই, অমনই দাঁত কপাটি লেগে চোখ উল্‌টিয়ে মরবার মত হ'য়ে পড়েছিল—এই শোকের ছবি যদি আপনি দেখ্‌তেন। কবরেজ মশায়, আপনি আমাদের বংশের বাতিটি নিবোলেন।"

কবিরাজ······"ভাই আমি যা ক'রেছি, তা তোমার হিতের জন্যই ক'রেছি।"

হৃদয়েশ······"তা ভেবে যে করেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেটি আমার হিতের জন্য হ'য়েছে কিনা বল্‌তে পারিনা।"

কবিরাজ……"নিশ্চয়ই হয়েছে, পরে বুঝ্‌তে পার্‌বেন—এরূপ কাজের এইটিই আমার হাতে-খড়ি নয়; বন্ধুবর্গের বিষয় ও স্বার্থ রক্ষার জন্য মাঝে মাঝে এরূপ আরও ক'রেছি।"

হৃদয়েশ তথাপি অনুতাপের ভাবে সাশ্রু চক্ষু মাটীর দিকে নত ক'রে রইলেন।

রতন কবিরাজ বল্লেন—"বিষয় করতে হ'লে মন এত কোমল রাখ্‌লে চল্‌বে কেন? আর দেখুন, তাঁর কাজ তিনি ক'রেন—আমরা উপলক্ষ্য মাত্র—ওর আয়ু ফুরিয়েছিল। যার আয়ু নেই, তাকে কি কেউ রক্ষা করতে পারে? যদি ওর আয়ু থাকতো, তা হ'লে কি বিষ উদরস্থ হ'ত? কখনই না। হাঁ ভাল কথা, আর একটা বিষয় বল্‌তে ভুলে গেছি, ওর বুকে শ্লেষ্মা যেরূপ চেপে ছিল, তা এমনি ও মারা যেত, খুব চেষ্টায় বাঁচলেও বেচে যেতে পারত, কিন্তু মরবারই ছিল চোদ্দ আনা সম্ভব। ত্রিদোষ নিয়ে জ্বরটা হয়েছিল, এতে শতকরা নব্বইজনই রক্ষা পায়না। উঠুন, আর শোক করবেন না, দেবেশ বাবু যদি ২।৩ বচ্ছর না আসেন, কিম্বা তীর্থে স্বর্গ লাভ করেন, তবে তাঁর স্ত্রীর নিকট হ'তে বিষয় গুলি লেখা পড়া ক'রে নিতে এখন কোন কষ্টই হবেনা। বিষয় ত আপনার পৈত্রিক সম্পত্তি বটে।"

এদিকে কানাই বাবাজি ভাব্‌ছেন, কি ক'রে তুলসী দেবীর সঙ্গে দেখা করবেন—তিনি কুলবধূ, হৃদয়েশের বাড়ীতে থাকেন, হৃদয়েশের ভাব তার উপর ভাল নয়। যদি দেখা সাক্ষাৎ করতে সম্মতি তিনি না দেন। ভেবে ভেবে ঠিক করলেন, "রঘুপতি চোবেকে লিখে দেওয়া যাক্‌, দেবেশকে আস্তে আস্তে সান্ত্বনা দিয়ে ছেলের মৃত্যু খবরটা দিতে; তার পর আমি গিয়ে নিয়ে আসব।" আবার ভাব্‌ছেন, দেবেশের দুর্ব্বল মস্তিষ্ক যদি এই শোক বরদাস্ত করতে না পেরে পুনরায় যদি সে

পীড়িত হ'য়ে পড়ে, এই ভেবে পূর্ব্বকার সিদ্ধান্ত মনে মনে ওল্টে ফেল্লেন।

একদিন তিনি প্রাতে ব'সে গালে হাত দিয়ে ভাব্ছেন। 'নববৃন্দাবনের' সদ্য স্ফুট মল্লিকা সৌরভ ভেসে আস্ছে। এমন সময় একটী বালককে পথে যেতে দেখে তাকে ডাক্লেন; সে দয়া বাড়ির পুত্র, বয়স পনের ষোল, কতকটা হাবা, থেমে থেমে ভাঙ্গা কথা বলে, এক সঙ্গে একটি ছত্র মুখে আসে না। সে এত বড় ছেলে, কিন্তু প্রায়ই নেংটা থাকে,—কখন কখনও নেংটি পরে। তিনি বল্লেন "কেমন আছিস্‌রে দুঃখী? শ্যামের মা কেমন আছে বল্‌তে পারিস?"

নিজের গালদুটি আঙ্গুল দিয়ে ধরে সে বল্লে 'দাঁত'।

"দাঁত কিরে?"

"দাঁত"—তার পর থেমে বল্লে ক-কপাটি" এবং নিজের গালটিপে দাঁত কপাটি লাগ্‌লে যেরূপ হয়, তাই বুঝাতে চেষ্টা পেল।

বাবাজি শুনেছিলেন, তুলসীদেবী প্রায়ই অজ্ঞান হয়ে থাকেন এবং তাঁর দাঁতি লাগে, সুতরাং দুঃখীর কথায় সমস্ত বুঝ্‌তে পারলেন।

দুঃখী বল্লে "শ্যাম" তার পর থেমে নিজের চোখ উল্টাতে লাগ্‌ল, হাত ছুঁড়তে লাগল।

বাবাজি জিজ্ঞাসা কল্লেন, "শ্যাম" ব'লে ওসব কি কচ্ছিস্।"

তখন দুঃখী একটা গাছের পাতা কুড়িয়ে নিয়ে কিছু মাটি তার উপর দিয়ে নিজে হাঁ করে খাবার অভিনয় ক'রে হাত পা ছুঁড়তে লাগল ও গোঁ গোঁ শব্দ কর্‌তে লাগল।

বাবাজি অবাক হ'য়ে বল্লেন "কি কচ্ছিস্?"

দুঃখী ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় বল্লে "রতন কবিরাজ।" আবার থেমে বল্লে "ওষুধ।" তার পর নিজে মাটীর মধ্যে চিৎপাত হয়ে শুয়ে বল্লে,

"শ্যাম" এবং চোখ বুজে হাত পা ছুঁড়ে কি দেখাতে লাগ্‌ল, দুই ঠোঁটের ধার হ'তে আঙ্গুল দিয়ে লালা বার ক'রে বুঝোতে চাইল।

দুঃখী খানিক বাদে চলে গেল। কানাই বাবাজি যেন কি ভেবে চম্‌কে উঠ্‌লেন। তিনি রাত্রি দশটার সময় দয়া বুড়ির কুঁড়ে ঘরের পাশে এসে বল্লেন, "জাগ্‌ছ।"

বুড়ি তাড়াতাড়ি বাবাজিকে দেখে গড় কল্লে এবং বল্লে "এ বড় ভাগ্যির কথা! সাধু বাবা, নিজে আমার বাড়ীতে।"

বাবাজি বেশী আড়ম্বর না ক'রে বল্লেন, "একটা কথা ঠিক্ আমায় বল্‌বে, মিথ্যা বল্‌বে না।"

"সেকি আমি বেতিলার গোঁসাইয়ের শিষ্য, আমার গুরু—" এই বলে হাত যোড় ক'রে পাকা চুলে ঠেকিয়ে বল্লে, "আমার গুরু সাধুবাবাকে গুরুর মত মান্য করেন, আমি আপনার কাছে মিথ্যা বল্‌লে জিভ্ খসে পড়্‌বে যে।"

বাবাজি একবারে কথাটি পেড়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "তুমি কি শুনেছ, রতন কব্‌রেজ বিষ খাইয়ে শ্যামলেশকে মেরেছে?"

সে খানিকটা চুপ্ ক'রে রইল, তারপর বল্লে, "এ কথা ত এখানে কেউ কেউ বল্‌ছে। কিন্তু আমার কাছে শুন্‌লেন এ কথা কাউকে বলবেন না।"

"তা নিশ্চয়ই বল্‌ব না, আর তুমি ত আমায় বল নি, আমি অন্য এক জায়গায় শুনেছি। আচ্ছা শ্যামের মা কি এ কথা শুনেছেন?"

"না, তিনি তার মৃত্যুর সময় সেখানে ছিলেন না, প্রায় ৭।৮ ঘণ্টা আগে থেকে আর এক ঘরে দাঁতি লেগে পড়ে ছিলেন।"

"তুমি বিষ-প্রয়োগের কথা বিশ্বাস কর?"

"আমার সেটা ঠিক বলেই মনে হয়।"

"কেন?"

"ঔষধটা ত গলায় গেল, আর বাছা যেন আগুনে পড়ল। চোখ উল্টে গেল—লালা ভাঙ্গতে লাগল, আর হাত পা ছুড়তে লাগল—তার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব ফুরোল।"

বুড়ি আঁচল দিয়ে চোখ চেপে হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগল।

---

(৩৩)

পরদিন সকাল বেলা বাবাজি হৃদয়েশের বাড়ীতে যেয়ে এক দাসীকে দিয়ে তুলসীদেবীকে খবর দিলেন।

যেমন গোমুখী হ'তে গঙ্গাধারা বের হয়, তেমনই উতলা হ'য়ে তুলসীদেবী বার-বাড়ীতে চলে এলেন—এ পর্য্যন্ত তিনি এমন ভাবে বার হন্ নি।

প্রাতে বৈঠকখানায় বসে হৃদয়েশ রতন কবিরাজের সঙ্গে কথা বল্‌ছিলেন। কবিরাজ প্রাতে বৈষ্ণবদের মত একটা ল্যাজওয়ালা টুপি মাথায় দিয়ে খক্ খক্ করে কাস্‌ছিলেন "সর্দ্দিটা কয়েকদিন হ'য়ে রয়েছে, তালিশাদি চূর্ণতে কাশিটা গেল না দেখ্‌ছি," নস্যাধার হ'তে এক টিপ নস্য নিয়ে একটা চক্ষু কুঞ্চিত করে—হৃদয়েশকে বল্লেন—"এখন তোমার পথটি পরিষ্কার, দেবেশ যদি ফিরে না আসে, তবে বাগানটি আস্তে আস্তে তোমার দখলে আস্‌বেই। তোমার ভ্রাতৃবধূকে বাড়ীতে রাখ্‌তেই হবে। তার কাছ থেকে তার জীবন-স্বত্বটা কিনে নিলে ভাল হয় দেবেশের ফির্‌তে দেরী হ'লে কিম্বা তীর্থে যদি তার মৃত্যু হয়, তবে পত্নীর স্বত্বটা তোমাতে এসে যাবে।"

হৃদয়েশ জান্‌তেন—দেবেশ আর আস্‌বে না। সুতরাং তার স্ত্রীর নিকট হ'তে একটা কবিলা পেলে কনিষ্ঠের বিষয়ের তিনিই মালিক হ'বেন। কিন্তু শ্যামের মৃত্যুর পর হ'তে 'নববৃন্দাবন' পাওয়ার আগ্রহ তার কমে গেছে—ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য তার শোক হ'য়েছে—এবং রাতদিন তিনি অনুতাপ ভোগ কচ্ছেন। বিষয়-সংরক্ষণের জন্য তাঁকে কিন্তু সর্ব্বদাই কবিরাজের পরামর্শ নিতে হয়, সুতরাং তাঁর

কথা একবারে উড়িয়ে না দিয়ে তিনি কতকটা ঔদাস্যের সহিত বল্লেন "তা হবে কব্রেজ মশায়, অত তাড়াতাড়ি কেন ?"

কবিরাজ···"শুভস্য শীঘ্রং—বিশেষ দেবেশকে রেখে ঐ বাবাজি-বেটা ফিরে এসেছে। সে কি মতলবে এসেছে—তা জানি না। শুনেছি দেবেশের স্ত্রী তাকে দেবতার মত ভক্তি করে, বাবাজি যদি তাকে হাত ক'রে ফেলে—তবে জমি-জমার আশা ছেড়ে দিতে হবে। এ জন্য বল্ছি, শীঘ্র একটা দলিল লিখে ফেল···রেজেষ্টারীতে আমি, রাজ-নারায়ণ ও আর দু-একটি সাক্ষীর দস্তখত থাক্বে।"

"বাবাজি দেবেশের বউকে হাত করবে কি ক'রে? তার বউ যদি নিজ বাড়ীতে থাক্তো, তবে অবশ্য তার বাবাজির পরামর্শ মত কাজ কর্বার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু এখন দেবেশের স্ত্রীর সঙ্গে তার দেখা হবারই সম্ভাবনা নাই।"

ঠিক এই সময়ে এক ভৃত্য এসে বল্লে "ছোট মা বাহিরে এসে কানাই বাবাজির সঙ্গে কথা বল্ছেন। বড় মা বল্ছেন এটা কি ভাল ? তুই কর্ত্তাবাবুকে বলে আয়।"

কবিরাজ বল্লেন—"এই দেখ্ছ, বড় বউমার যে বুদ্ধি শুদ্ধি আছে, তোমার দেখ্ছি তাও নেই। এখন যা উচিত মনে কর, অবিলম্বে কর, মোট কথা এরূপটি হওয়া ঠিক নয়।"

হৃদয়েশের রাগ হ'য়েছিল। কানাইবাবাজির এত সাহস যে তার ঘর থেকে একটি বউকে রাস্তায় বার ক'রে নিয়ে পরামর্শ দেওয়া। "আমার কাছে কিছু বলা কওয়া নেই!"

মুখ হ'তে সোনার মুখনলটা ফেলে দিয়ে ক্রুদ্ধ ভাবে হৃদয়েশ বার হ'লেন, পেছনে কব্রেজ মশায় খক্ খক্ ক'রে কাস্তে কাস্তে চল্তে লাগ্লেন। বাইরে এসে দেখেন, তার বৈঠকখানা সংলগ্ন

চাকরদের থাকবার ঘরের দেওয়ালে ঠেশ দিয়ে বাবাজি দাঁড়িয়ে আছেন, এবং লালপেড়ে মলিন সাড়ীর ঘোম্‌টা টেনে মৃদুস্বরে চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে দেবেশের স্ত্রী তাঁকে কি বলে যাচ্ছে। বাবাজির ভ্রূকুঞ্চিত, মুখ বিষন্ন এবং করুণ। হৃদয়েশ তাদের কাছে এসে বাবাজির দিকে চেয়ে বল্লেন—"এ বাড়ী যে আমার—এটা দেবেশের বাড়ী নয়, এবং এখানে আমার ঘরের কোন কুলবধুর সঙ্গে কথা বার্ত্তা বল্‌তে হ'লে যে আমার অনুমতির দরকার, বাবাজি বোধ হয় সেটা ভূলে গেছেন।"

বাবাজি দৃঢ় ভাবে বল্লেন, "আমি দেবেশের কাছ থেকে তার সংবাদ নিয়ে এসেছি, সুতরাং দেবেশের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বল্‌বার আমার অধিকার আছে, এইটি মনে ক'রেছি।"

হৃদয়েশ..."মনে কর্‌লেই তো হ'বে না, যদি আমি বলি, আপনি ওর সঙ্গে কথা বল্‌তে পার্‌বেন না, তবে কি আমার বাড়ীতে এসে আমার উপর জুলুম কর্‌বেন? আইন-সঙ্গত ভাবে কি আপনি তা' করতে পারেন?"

হৃদয়েশ ভাব্‌লেন, দেবেশের কাছ থেকে এসেছে—এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কব্‌রেজ মশায় যে ভয় দেখিয়েছিলেন তাই এখন তাঁর মনে হ'ল। দেবেশ তো মরেছে, এখন তার নাম ক'রে ফাঁকি দিয়ে ছোট বৌমাকে কোন একটা বিপদে ফেল্‌বে।

বাবাজি..."তোমার ছোট বউমা নিতান্ত খুকি নন—আইন এখন তাঁকে অনেক বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি এখানে এসে এঁকে দাসীর দ্বারা সংবাদ দেওয়াতে ইনি আপনার ইচ্ছায় এসে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌ছেন। এতে আমার বে-আইনি কিছুই হয় নাই। তা' আমার কথা কিছু মাত্র গোপনীয় নয়। আমি এঁকে নিয়ে যেতে এসেছি, দেবেশের সঙ্গে এঁর দেখা করার দরকার, কারণ উভয়েই পুত্রশোকে কাতর।"

হৃদয়েশ এ কথাগুলি মিথ্যে মনে কর্‌লেন এবং বল্লেন, "সে হ'তেই পারে না।"

"তা আপনার ভ্রাতৃবধূকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি যেতে ইচ্ছা কর্‌লে আপনি কিছুতেই আট্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বেন না।"

একজন পরিচারিকা কাছেই ছিল—বাবাজি বল্লেন, "ওঁকে জিজ্ঞাসা কর, উনি আমার সঙ্গে ওঁর স্বামীর কাছে যাবেন, না এই খানে থাক্‌বেন?"

মৃদু কিন্তু দৃঢ়স্বরে তুলসীদেবী বল্লেন "আমি যাব।" দাসীর বল্‌বার পূর্ব্বেই সকলে সে কথা শুন্‌তে পেলেন।

হৃদয়েশ ক্রুদ্ধস্বরে বল্লেন, "তোমার রাধামাধবের সেবা কাকে দিয়ে যাবে?"

"রাধামাধব আপনার পৈত্রিক বিগ্রহ—এ সেবা আপনারই থাক্‌বে।" তুলসীর এই কথা পরিচারিকা জানালে।

"তুমি না রাধামাধবকে বড় ভক্তি কর, এই কি সেই ভক্তির পরিচয়?"

দাসী মুখে তুলসীদেবীর উত্তর "আমার স্বামীর মধ্যেই আমি রাধামাধবকে পেয়েছিলেম—তাঁকে ছাড়া আমি রাধামাধবকে চাই না।" এই বল্‌তে গিয়ে তুলসীর গৌরবর্ণ মুখখানিতে একটু লজ্জার লাল আভা পড়্‌ল, তিনি অধোমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

হৃদয়েশ···"তোমাদের নববৃন্দাবন?"

তুলসী···তাঁর স্বত্ব আমি লিখে পড়ে আপনাদিগকে দিয়ে যাচ্ছি—আপনাকে দাম দিতে হ'বে না। আমি আমার স্বামীকে বল্‌ব, তিনি যেন দান প্রত্যাহার না করেন—আমার কথা তিনি অবশ্যই পালন কর্‌বেন।"

রতন কবিরাজের ইঙ্গিতে রাজনারায়ণবাবু একখানি আট আনা ষ্ট্যাম্পের যুক্ত রেফ কাগজ নিয়ে এলেন, কবিরাজের এই সমস্ত পাঠ এক বারে মুখস্থ ছিল, তিনি তখনই একজন দপ্তরের কেরাণীকে দিয়ে দলিল লিখিয়ে নিলেন। এটা ঠিক দান পত্র নয়। তুলসীদেবীর নামে এই লেখা হ'ল "রাধামাধব সেবার জন্য এই বাগান আমি আমার ভাসুর শ্রীযুক্ত হৃদয়েশ ভট্টাচার্য্যকে দিলেম।" তুলসীদেবী তখনই স্বাক্ষর করলেন, এবং অপরাপর সাক্ষীর সঙ্গে বাবাজীও তাতে দস্তখত করাতে ইতস্ততঃ করলেন না। হৃদয়েশ টেলিফোঁ করলেন, আর ২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকার সবরেজেষ্টার সেই বাড়ীতে এসে দলিল রেজেষ্ট্রী ক'রে দিয়ে গেলেন।

এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এরূপ একটা কাজ হ'য়ে গেল, তাতে কবিরাজ অত্যন্ত বিস্মিত হ'লেন।

কিন্তু হৃদয়েশের এই ব্যাপারটি ভাল লাগ্‌লনা, "দেবেশ ম'রেছে, অথচ দেবেশের সঙ্গে দেখা করাবে ব'লে ছোট বৌমাকে নিয়ে যাচ্ছে, এই প্রতারণার উদ্দেশ্য কি? যা হোক্ এই শঠতা স্পষ্ট দেখে আমি কিছুতেই ওঁকে এর সঙ্গে যেতে দেব না।" এই সংকল্প মনে মনে স্থির করে হৃদয়েশ বল্লেন—

"ছোট বউমা, তুমি বুঝছ না, শেষকালে ইহকাল-পরকাল খেয়ে শেষে বুঝবে। এই ভণ্ড বাবাজি তোমাকে স্বামী-সঙ্গ ঘোটনা ক'রে দেবে ব'লে ভরসা দিচ্ছে। আমি জানি এই ভরসা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তুমি স্বামীর নাম শুনেই অন্ধ ভাবে এঁকে বিশ্বাস ক'র না।"

তুলসীদেবী আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি একটি পরিচারিকাকে বল্লেন "ভাসুর ঠাকুরকে বল তিনি যেন ওঁর নিন্দা আমার সাম্‌নে আর না করেন, আমি ওঁর সঙ্গে যাব—এতে কোন বাধা মান্‌ব না।"

এমন সময়ে অন্দরমহলের দোর গোড়া অবধি হেঁটে এসে, এলো চুলগুলি বাঁ হাত দিয়ে ধ'রে, মাথায় একটা ঝুঁটির মত বেঁধে, উগ্র ভাবে হৃদয়েশের স্ত্রী সুমতি-দেবী ঝঙ্কার করে বল্লেন—"ছোট বউয়ের সাহস দেখ্‌ছ? আমরা ওঁর কথার প্রতিবাদ করতে সাহস পাই না—ধন্য বুকের পাটা, সুলি, ওঁকে ধরে নিয়ে আয়, বাড়ীর ভেতর পুরে রাখি।"

সুলি (সুলক্ষণার অপভ্রংশ)—সম্বন্ধে হৃদয়েশের ছোট বোন, বিধবা, তখন একটা বাল্‌তিতে ক'রে হ'বিনা ঘরের কোণ হ'তে একটা লাউয়ের চারা উঠেছিল—তার গোড়ায় জল দিচ্ছিল—সে বল্লে—"ছোট বউ অপমানের ভয় রাখত চলে এস।"

বাবাজির দিকে চেয়ে তুলসীদেবী কাতর ভাবে বল্লেন—"আমি শোকে কাতর—এই অত্যাচার সহ্য করতে পাচ্ছি না, বাবা আমায় নিন, আমি আপনার সঙ্গে যাব। আমি এখানে থাকলে প্রাণ দেব, যে বাড়ীতে আমার স্বামীকে নিয়ে এত নিন্দা, আপনার প্রতি এত অপমান, সে বাড়ীর জল আমি স্পর্শ করব না।"

বাবাজি হৃদয়েশের কাছে সরে এসে অতি মৃদুস্বরে বল্লেন—"এঁকে এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনি আট্‌কে রাখতে পারেন না" এই সময় কবিরাজ উচ্চৈঃস্বরে বল্লে, "এই ভণ্ডটাকে দরোয়ান দিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দিলেই তো সকল আপদ চুকে যায়—বাড়ীর মেয়েদের কথায় কান দেওয়ার দরকার কি?"

এদিকে সুমতি দেবী এসে ক্রোধের সহিত তুলসীদেবীর হাত ধরে টান্‌ছেন, সুলি এসে সহকারিতা করবার জন্য তার পাশে দাঁড়িয়েছে। তুলসীদেবী হাত দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে অন্দরের দিকে এগুচ্ছেন, কিন্তু কাতর ভাবে বাবাজির দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌ছেন "আমায়

রক্ষা কর।" তাঁর চোখ দুটি জলে ভেসে যাচ্ছে ও চুলগুলি মুখের উপর ঝুঁকে পড়েছে, মাটীতে দিন রাত পড়ে থাকার দরুণ চোখের জলের সঙ্গে ধূলি মিশে মুখের এক এক জায়গায় দাগ হয়ে আছে—অনাহারে মুখখানি শুকিয়ে গেছে—শরীরে বল নাই, এই জীবন্ত শোক-দুঃখের প্রতিমার প্রতি দৃষ্টি করে বাবাজি আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি বল্লেন "আপনারা আমার সঙ্গে একটু নিরালা জায়গায় আসুন, দুটো কথা বল্‌ব, তারপর গল-ধাক্কার ব্যবস্থা করতে হয়, করবেন।" তাদেরে তিনি গোপনে বল্লেন "এই বিশ পঁচিশদিন যা কিছু হয়েছে—তা' আমি সকলই জানি, কিশোররায়ও জানেন, হৃদয়েশবাবু, আর ঘাঁটাবেন না, কেলেঙ্কারী বের হয়ে পড়বে, আপনি ত 'নববৃন্দাবন' চেয়েছিলেন, তা ত আমার পরামর্শে দেবেশের স্ত্রী লিখে পড়ে দিয়েছেন, আর কত অত্যাচার করবেন? ওঁকে ছেড়ে দিন, নতুবা বিপদে পড়বেন। আমার এ কথা বলবার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু এতটা বাড়াবাড়ি কচ্ছেন, যে না বলে পাল্লুম না।"

কেউটে সাপের মাথায় রোজা গাছের মূল দিয়ে ছুঁলে সে যেরূপ ঘাড় হেঁট করে—এই কথায় হৃদয়েশের তাই হ'ল। তিনি অতিশয় ভীত হ'লেন। কদুলখাঁ ও রঙ্গবাসি তবে কিশোররায়কে সব বলে ফেলেছে। হয়ত মৃতদেহটা পোঁতেনি, ডাক্তার দিয়ে শবচ্ছেদ করেছে—হত্যা প্রমাণের জন্য। এক মুহূর্তে হৃদয়েশের বক্ষের স্পন্দন বন্ধ হ'য়ে মুখ শুকিয়ে গেল। কবিরাজ এসকল কিছুই জানেন না, তিনি বল্লেন "বেশ দাও, বাবাজি তোমার ভণ্ডামি, এই বেলা সরে পড়, নতুবা লক্ষ্মণ-সিংহের হাতে ঘাড় টিপুনি খেয়ে সদর দরজার বাইরে যেতে হ'বে।" কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে বাবাজি বল্লেন—"কবিরাজ, ভগবান তোমার মধ্যে পুতনা-বৃত্তি দিয়েছেন, যেমন কেউটে সাপের বিষ দিয়েছেন—অনেকে তা জানে। তুমি কি

নিরাপদ ?" কবিরাজ দর্প ক'রে কথা বলতে গিয়ে হাঁ করেছিলেন সেই হাঁই রয়ে গেল, আর মুখে বাক্‌স্ফুরণ হ'ল না। কিন্তু বাবাজি অতি ধীর ও করুণ কণ্ঠে বল্লেন "যে যত গর্হিত কাজই করুক না কেন, তিনি পেছন পেছন ঘুরছেন তাকে শোধরাবার জন্য। তোমরা তাঁর শরণ নেও, পাপের ভরা আর বাড়িওনা, নিজেদের কীট পতঙ্গের মত হেয় করো না। এইবার মনটা সাফ করতে লেগে যাও, সেটাময় যে কাঁটাবন হ'য়ে গেছে।" শিশুকে যেরূপ পিতা তাড়না করেন,—তা পরিপূর্ণ স্নেহ ও সহানুভূতির দরুণ কঠোর হয়েও মিষ্ট—বাবাজির কথা তাদের কানে তেমনই মিষ্ট বোধ হ'ল। হৃদয়েশ অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন। বাবাজি তাকে অভয় দিয়ে বল্লেন, "কিশোর বাবু বা আমি তোমাদের কোন অনিষ্টই করব না, যদি না তোমরা নিজেরা একটা গোল বাধিয়ে নিজেদের অনিষ্ট টেনে না আন।"

হৃদয়েশ উঠে অন্দরে গিয়ে সুমতিকে বুঝিয়ে তুলসীদেবীকে নিয়ে এসে বাবাজির হাতে দিলেন এবং বল্লেন "ইনি যখন যেতে চাচ্ছেন, তখন আটকে রাখা যায় না। কিন্তু বাবাজি এর জন্য আপনিই দায়ী রইলেন।"

বাবাজি শিবিকার ব্যবস্থা করেছিলেন—দেবেশের স্ত্রী শিবিকায় চল্লেন, বাবাজি বাহকদেরে ধীরে ধীরে চলার আদেশ ক'রে স্বয়ং শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনের দিকে রওনা হ'লেন।

রেলে তুলসীদেবী বাবাজির সঙ্গে অতি অল্প কথাই কয়েছেন। শোকে তাঁর হৃদয় দগ্ধ হচ্ছিল, কেবল স্বামীর সঙ্গে দেখা হবার আশাটা মনের ঘোর নৈরাশ্য ঠেকিয়ে রেখেছিল। একবার মাত্র তুলসী দেবী বাবাজিকে বল্লেন, "রতন কবিরাজ কি বিষ খাইয়ে আমার শ্যামকে মেরেছে ?"

বাবাজি দুঃখের স্বরে বল্লেন "এ কথা কে বল্লে ?"

"কেউনা বাবা, আমার মন বলছে, আমি তখন অজ্ঞান অবস্থায় পাশের ঘরটায় ছিলেম, তখন যেন মনে হ'ল, শ্যামের গা জ্বলে যাচ্ছে—সে তখন আর মা বলে ডাকতে পাচ্ছেনা; স্বরটা গলায় বেধে গেল" এই বলে তিনি চোখের জল মুছতে লাগলেন, বাবাজি কিছু বল্লেন না।

আর একবার তিনি বাবাজিকে বল্লেন, "হরিদ্বারের আশ্রমে গিয়ে যদি তাঁর সঙ্গে দেখা না হয়—তবে কি করব?"

বাবাজি একটু চিন্তাকুল ভাবে বল্লেন—"সেই আশ্রমেই ত তাকে রেখে এসেছি, তবে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব, একথা দেবেশ জানেনা। কি জানি যদি আশ্রম ছেড়ে কোথাও যায়! খুব সম্ভব গিয়ে তাকে পাব।"

প্রকৃত তুলসীদেবীকে যে তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন, এ কথা তাঁর মনেই ছিলনা। কেবল শ্যামলেশের শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনে আর সেখানে তুলসীকে রাখা সঙ্গত মনে করেন নাই; এজন্য তাড়াতাড়ি তাঁকে নিয়ে চলেছেন।

---

(৩৪)

আশ্রমে গিয়ে দেবেশের সঙ্গে দেখা হ'লনা। দেবেশ চ'লে যাওয়ার পর, তার বিছানায় বাবাজি রঘুপতি চোবের নিকট যে চিঠিটা লিখেছিলেন, সেটি খোলা অবস্থায় পাওয়া যায়। সকলেই বুঝতে পারলেন, যে শ্যামালেশের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তিনি আশ্রম ছেড়ে গেছেন।

সমস্ত খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল। দেবেশ তার দু-একটি দেখেছিলেন; কিন্তু কোন সাড়া দিলেন না। "তুলসী যখন বাবাজির কাছে আছে—তখন তাঁর কাছে থেকে যে সান্ত্বনা পাবে, আমার কাছে থেকে তা' পাবে না। আমি মনকে এখনও শান্ত করতে পারিনি, সে এলে উভয়ের মনেই শোকের বহ্নি জ্বলে উঠ্‌বে। আর নিজের কামনার প্রশ্রয় দেব না—যদি কোন দিন শ্যামের জায়গায় কিছু দিতে পারি—তবে সে দিন যেন মিলন হয়।"

দেবেশের কোন সংবাদ বাবাজি পেলেন না। শ্রীগোপাল পাড়ে লোক পাঠিয়ে সমস্ত বাঙ্গালা দেশটা খুঁজ্‌লেন। বৃন্দাবন, মথুরা, পুরী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে সন্ধান করলেন, কোথাও কোন খোজ পাওয়া গেল না।

তথাপি তুলসী দেবী আশা ছাড়েন নাই। স্বামীর চিন্তা ধ্রুব নক্ষত্র করে সেই দিকে হৃদয়ের সমস্ত আগ্রহ প্রবাহিত ক'রে দিলেন।

বাবাজি তাঁকে বল্লেন—"সাধ্বীরা চিরদিন এই কষ্ট পেয়ে এসেছেন মা; স্বামী তাঁদের কাছে সুলভ হন নি। সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতি আদর্শ সতীরা স্বামীর জন্য অনেক তপস্যা করেছেন, পুরাণে লেখা আছে, গৌরী মহাদেবের জন্য তপস্যা ক'রেছিলেন। যা বিনা তপস্যায় পাওয়া যায়

তা' মণিমানিক্যের মত বহু মূল্য হ'লেও কতকদিন পরে অনাদৃত হয়। মা, তুমি তার জন্য তপস্যা কর।"

"তুলসী…"কি ক'রে করব বাবা? আমি দিনরাত তো তাঁর কথাই ভাব্ছি।"

বাবাজি…"আগে মনটা তৈরী ক'রে নাও। ভগবানকে না ডাকলে সেটি হবার যো নেই, নাম জপ কর।"

তুলসী…"কৃষ্ণনাম জপ করতে করতে আমি তাঁরই লীলা প্রত্যক্ষ করেছি—নাম কোথায় পড়ে রয়েছে! সিন্দূরতলায় রাধামাধবের আঙ্গিনায় যে তিনি কত লীলা করেছেন সেই চিন্তায় মন ভেসে চলে গেছে। তার পর মনের মধ্যে বিষম জ্বালা উৎপন্ন ক'রে শ্যামের কচি মুখখানি আমার সেই জপের মধ্যে দিন রাত উঁকি মেরেছে, তখন যেন বক্ষের স্পন্দন বন্ধ হ'য়ে গেছে।"

বাবাজি……"আর ও ভাবে জপ ক'রনা। জপের সময় অপর কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণের লীলার কথা পর্য্যন্ত ভেবনা, কোন কথাই ভেবনা,—শুধু দ্বি-অক্ষর কৃষ্ণনাম স্মরণ কর—কৃষ্ণের লীলা, তাঁর দয়া প্রভৃতি চিন্তা করার সময় এখন নয়। সমস্ত চিন্তা ঠেকিয়ে রেখে মনটাকে শুধু কৃষ্ণনামের উপর আবদ্ধ কর।"

তুলসী…"এ কথাত বাবাজি আর একবার বলেছিলেন—কিন্তু খানিকটা চেষ্টা করতে গিয়ে দেখি, তাঁর কথা ও শ্যামের কথাই বেশী করে ভাব্ছি।"

বাবাজি…"এ জন্যই চেষ্টা করে তপস্যা করতে হবে যাতে ক'রে সে সকল চিন্তা না আস্তে পারে। কেবল যেন দ্বি অক্ষর কৃষ্ণনামে মন বাঁধা থাকে। এ হচ্ছে যেমন বাগানে কোন বীজ রোপন করার পূর্ব্বে মালী আগাছা সাফ্ করে তেমনই। অভ্যাস করে মনকে যদি কৃষ্ণনামে বেঁধে

রাখ্‌তে পার এবং যখন তখন সমস্ত চিন্তা ছেড়ে তাতে আশ্রয় নিতে পার, তবে বুঝবে মন পরিষ্কার হ'য়েছে।”

“এই অবস্থায় কৃষ্ণ নাম শোনা মাত্র চোখ দিয়ে জল পড়্‌বে এবং তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর আস্‌বে—তখন ব'ল “হে কৃষ্ণ আমার স্বামিকে দিন” —সে কথা তিনি তখন শুন্‌বেন। তাঁকে আমাদের কথা শুনাতে হ'লে তপস্যা করে শুনাতে হবে।”

তুলসী তদবধি ফুলবাগানে যেয়ে জোড়হাত করে ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলে ডাকেন, মন বিগড়িয়ে গেলে কেঁদে আবার তাঁরই নামের পেছন পেছন ছোটেন। এই ভাবে দেড় বছর কেটে গেল—দিনরাত এই চেষ্টায় মন শান্ত হ'য়ে এল এবং শোক অনেকটা দূর হ'ল।

এদিকে বাবাজি নিজে অনেকবার দেবেশের সন্ধানে নানাস্থানে ঘুরে এসেছেন। হরিদ্বারের আশ্রমে কয়েকটি পরিচারিকা রেখে বৃদ্ধ রঘুপতি চোবের উপর তুলসীর ভার দিয়ে যেতেন।

একদিন তিনি শুন্‌তে পেলেন, হুগলী জেলায় একটা পাগল এসেছে। সে দেখ্‌তে সুন্দর এবং তার ৩০।৩১ বছর বয়েস। তার মাথায় ছোট ছোট চুল, জটা বেঁধে কালো কালো শামুকের মত দেখাচ্ছে। সে কখনও ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলে চীৎকার করে,—কখনও কখনও “শ্যাম” “শ্যাম” বলে ডাকতে থাকে। কারু কথার কোন জবাব দেয় না, সম্প্রতি বদনগঞ্জের নিকট গঙ্গার ধারে আছে।

অনেকবার অনেক ভুল হ'য়েছে, কিন্তু এবার বাবাজি বল্লেন, “এ দেবেশ না হয়েই যায় না। ভয়ানক শোকে ক্ষেপে গেছে। যা' হোক একবার তাকে পেলে হয়, আমি তাকে আরাম করে ফেল্‌ব।”

এই ভেবে তিনি নলিন পাণ্ডাকে খবর দিয়ে এনে তার সঙ্গে বাঙ্গালা দেশে রওনা হয়ে গেলেন।

ওপারের আলো

থার্ড ক্লাসে যাচ্ছেন, বিস্তর ভিড়, এর মধ্যে দুটি লোক তর্ক করছে। একজন বলছে, দৌলতখায় বানের মত এমন অসম্ভব ঘটনা কখনও ঘটে নাই। আর একজন বলছে, বর্দ্ধমান দামোদরের বন্যায় যা হয়েছে, দৌলতখায় তার শিকি ও হয় নি। লোকেরা ঘর বাড়ী সমেত জলে পড়ে কিরূপ ভাবে মরেছে—তার ইতিহাস চলতে লাগল। দুই জনের প্রত্যেকে তাদের কাহিনী রোমহর্ষণ করবার উদ্দেশ্যে খুব বাড়িয়ে বলছেন। একজন বল্লেন "স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে একজন যে অদ্ভুত কাণ্ড করেছে, তা' জানিস্? সে কুম্ভক করে একটা ছেলেকে জাম গাছের উপরে নিয়ে বাঁচায়। খড়ের চালের উপর ভাস্তে ভাস্তে একজন গর্ভবতী স্ত্রী যাচ্ছিল। তার প্রসব-বেদনা ওঠে, প্রসব করেই সে ম'রে যায়। সেই স্বেচ্ছা সেবকটি মন্ত্রবলে মরা ছেলেটাকে বাঁচায়, স্ত্রীলোকটির কথা বলে যে ওকে বাঁচিয়ে লাভ নেই, ওর আয়ু ফুরিয়েছে। আমি বাঁচালেও সে আবার মরবে।" তাঁর সম্বন্ধে সেই লোকটি এরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলতে লাগলেন যে সকলেরই কৌতূহল হ'ল, সে লোকটি কে 'কোথায় আছেন তা' জানবার জন্য। তার প্রতিপক্ষীয় বন্ধু তাকে বল্লেন, "তুমি তাকে নিজ চক্ষে দেখেছ?"

"দেখি নাই? কতবার দেখেছি। কখনও একটা বাঁশের চোঙ্গাতে ফুঁ দিলেন, আর অমনি শূন্য চোঙ্গা হ'তে বালি বের হ'তে লাগল। আর একটি শিশুকে কোলে নিয়ে সেই বালি জ্বাল দিয়ে খাইয়ে দিতে লাগলেন। সে জ্বাল দেওয়াও হাবার অদ্ভুত রকমের। কতকগুলি শুকনো পাতাতে ফুঁ দিলেন আর অমনই আগুন ধরে গেল।"

"তাঁর চেহারাটা কি রকম?"

প্রথম···"বেশ ফুটফুটে গৌরবর্ণ, ৩০।৩২ বছর বয়স হ'বে, একখানি

ময়লা কাপড় পরা, তার চওড়া লালপাড়, কাপড়খানি খাট। এখন একটা আশ্রম করেছেন, বরিশাল জেলার ঝালকাঠির কাছে। বড় ফুলের চারা পুঁততে ভালবাসেন, সকাল সন্ধ্যায় একটা নিড়ুনি হাতে করে বাগানে ব'সে আছেন, চারদিকে ছেলের দল।"

বাবাজি কথাগুলি কান পেতে শুনছিলেন। নানা অতিরঞ্জন সত্বেও যেন কেন তার এই বর্ণনাটি ঠিক দেবেশের মূর্ত্তিটি চোখের সামনে এনে দাঁড় করালে।

সেই লোকটি বল্‌তে লাগল "অজস্র টাকা আসছে, তার আশ্রমে কত ছেলে জুটেছে—কে টাকা দিয়ে যাচ্ছে—তার ঠিকানা নেই। এক এক জন এক একটা বড় বড় টাকার থলে নিয়ে আসছে, আর দিয়ে যাচ্ছে,—নাম কি জিজ্ঞাসা কল্লে বলে, "সাধুর আশ্রমে দাতার নাম কল্লে পূণ্য কমে যাবে।"

"সাধুটি কি চমৎকারই ছবি আঁকতে পারেন। সকলগুলিই কৃষ্ণ-লীলার ছবি। শুকনো তুলি কাগজ বা কাপড়ের উপর টেনে গেলেই আপনা আপনি রং হয়। আশ্রমের ছেলেরা সকলেই ছবি আঁকা শিখেছে।"

এবার কানাইবাবা নিজে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—

"সে সাধুর নাম কি ?"

"আজ্ঞে নাম বালকদাস বাবা।"

তার ঠিকানা জেনে নিয়ে তিনি নলিন পাণ্ডাকে বরিশাল জেলায় বালকদাসের আশ্রমে পাঠালেন, এবং নিজে সেই রূপের সন্ধানে হুগলী জেলার বদনগঞ্জের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

কয়েকদিন পরে বাবাজি ফিরে এসেছেন। তুলসীদেবী কত আশা করে প্রতি বারই তাঁর পথের দিকে চেয়ে থাকেন—দূর হতে তাঁর

মুখ দেখেই তুলসী বুঝ্‌তে পারেন—যে তাঁর যাত্রা বিফল হ'য়েছে। এবারও তাঁকে দেখে—নিজের ঘরটিতে এসে চুপ্‌টি ক'রে বসে কাঁদতে লাগ্‌লেন। কখনও স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করতে তাঁর সাহসে কুলোয় নি।

সেই দিন রাত্রিকালে তুলসী জপ করতে করতে একেবারে তন্ময় হ'য়ে গেছেন। "হে কৃষ্ণ তুমি যা' দেবার দাও, যা' পাবার নয়, তার উপর আমার লোভ রেখ না।" এই প্রার্থনা জানাচ্ছেন ও চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছে। "তাঁকে আর পাবনা—শ্যাম ও গেছে—তিনিও কোথায় গেছেন। আমি না পেলুম—আমি চাই না-হে কৃষ্ণ তাঁকে ভাল রেখ। তিনি যেখানে থাকেন—তুমি তাঁকে সান্ত্বনা দিও। আমি এ পর্য্যন্ত যা' চেয়েছি; আজ হ'তে আর তা' চাব না। বোধ হয় তা পেলে আমার মনে গর্ব্বের ভাব আস্‌তো,—তোমার উপর নির্ভর চলে যেত—এজন্য তুমি দাওনি। রুগ্ন ছেলে যা, চায় মা তাতো তাকে দেন না। আমার যা ভাল তুমিই তা জান, আমি নিজে তা' জানি না। আজ থেকে কিছু চাইব না, তোমার নামে প্রীতি হোক,—আমার মনকে শান্ত কর।" এই বলে তুলসী জোড়হাত করে ভগবানকে প্রণাম কল্লেন, চোখের দুধারে জল পড়্‌ছে। তাঁর মনের ভার যেন হাল্কা হ'য়ে গেল, তিনি চিত্তে অভূতপূর্ব্ব প্রসন্নতা অনুভব কল্লেন—তাঁর স্বামীর রূপ তিনি মেঘের গায় অঙ্কিত দেখ্‌তে পেলেন; প্রফুল্ল কুন্দ-ফুলে শ্যামের স্মিত মুখের দশন পংক্তির ছটা যেন দেখ্‌তে পেলেন। চারদিকে যে মৃদু বায়ু বইছে, তার মধ্যে শিশু শ্যামের ঘুমন্ত নিশ্বাস-সুরভি অনুভব কর্‌লেন। তাঁর চোখ দিয়ে কেবলই জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। সেই অশ্রু যেন তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ব্যথা, সমস্ত ক্ষোভ ও হারানো রত্নের জন্য শোক

ধুয়ে নিল। তিনি কৃষ্ণ নাম জপ কর্‌তে কর্‌তে হৃদয়ের পূর্ণতা বোধ কর্‌লেন—কোন অভাব কোন অভিযোগের কথা মনে এল না—কি এক অপূর্ব্ব আনন্দের ভাব মনে জাগ্রত হ'ল। তখন রাত্রি দশটা, জোড়হাত ক'রে তুলসী একখানি আসনে ব'সে আছেন, এমন সময় হঠাৎ "মা, দেবেশকে পাওয়া গেছে," বাবাজির অকম্পিত উচ্চ কণ্ঠের সুর শুনে তুলসী দরজা খুলে দাঁড়ালেন—তাঁর মুখে প্রসন্নতা—ব্যস্ততার লেশ মাত্র নাই।

নলিন পাণ্ডা ফিরে এসে জানিয়েছে, বালকদাস বাবাই দেবেশ, সে তাকে দেখেছে, কিন্তু সাক্ষাৎ করে নি। দেবেশ যে ঝালকাঠির কাছে রূপগ্রামে আশ্রয় করে আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অতঃপর তুলসীদেবীকে নিয়ে কানাইবাবা সেই আশ্রমে গেলেন, সে কথা পূর্ব্বেই লিখিত হয়েছে।

---

(৩৫)

হৃদয়েশের মনে হল, তিনি একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়েছেন, সেটা কি, ভেবে ভেবে কিছুতেই কুল কিনারা করতে পারলেন না। কবুল খাঁ ও রজ্জব কথাটা কিশোর রায়কে বলেছে, কিশোর রায় বাবাজিকে বলেছেন—কি একটা মতলব এঁরা পাকাচ্ছেন, তা' ভাবতে হৃদয়েশের মুখ শুকিয়ে গেল। দেবেশের স্ত্রীকেই বা মিথ্যে আশা দিয়ে নিয়ে যাবার কারণ কি? একমাত্র উদ্দেশ্য হ'তে পারত, দেবেশের জমিজমা দখল করা। তা' দেবেশের স্ত্রী ত লিখে পড়ে দিয়ে গেল। বাবাজি নিশ্চয়ই দেবেশের মৃত্যুর সংবাদ জানেন, এ অবস্থায় তাঁর স্ত্রীর দেওয়া এই দলিলই চূড়ান্ত দলিল, এর মূল্য খুব বেশী—এ সকল জেনে শুনেও বাবাজি দ্বিধা মাত্র না ক'রে এতে সাক্ষী হ'লেন কেন?

হৃদয়েশের মাথা ঘুরতে লাগল, ভয়ে তিনি আড়ষ্ট হয়ে পড়লেন। এ যে কি ব্যাপার তা কিছুই বুঝতে পারলেন না—কিন্তু এর মধ্যে তাঁকে কোনরূপ জড়াবার চেষ্টা যে হ'তে পারে—যে কোন মুহূর্ত্তে যে তিনি হত্যাকারী ব'লে ধৃত হ'তে পারেন, তাই ভেবে তিনি শিউরে উঠতেন, রাত দিন আধ ঘণ্টাকাল চোখ বুজতে পারতেন না। অথচ কাউকে তিনি এ সকল কথা ব'লে মনের ভার হাল্কা করবার সুবিধা দেখলেন না। কতকদিন হ'তে মনে মনে তিনি রতন কবিরাজকে ঘৃণা কচ্ছিলেন, শ্যামকে বিষ দিয়ে মারা যে কি ভীষণ নিষ্ঠুরতা—তা তিনি উপলব্ধি ক'রেছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারটা তাঁরই গৃহে হ'য়েছিল, এবং তাঁরই হিত কামনা ছাড়া

ইহাতে কবিরাজের অন্য স্বার্থ ছিল না—এ বুঝে তিনি চুপ ক'রে ছিলেন, বিশেষ যখন পথের কাঁটা সরাবার কথা হ'য়েছিল—তখন তিনি কথাটা যে তাঁর নিতান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধ, তা' কবিরাজকে বল্‌বার অবকাশ পান নি, সুতরাং কবিরাজ তাঁর সম্মতি পেয়েছেন, এটা মনে করা সম্ভব। কবিরাজের পরামর্শ নিয়ে তিনি প্রজা-পীড়ন ও খাজনা আদায়ের নানা উপায় উদ্ভাবন করেছেন। বৃদ্ধ তাঁর সম্বন্ধে সকল খবরই রাখেন, এজন্য তিনি যাতে বিরক্ত হ'তে পারেন এমন কার্য্য করতে হৃদয়েশের সাহসে কুলা'ত না। কিন্তু কুকাজের সঙ্গীর সঙ্গে ঠিক বন্ধুত্ব হয় না, কোন একটা জায়গায় বাধে, বিশেষ যদি এক পক্ষের মন রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় পাপ চিন্তা হ'তে একটু একটু মুক্তি পাবার পথ খুঁজে বেড়ায়। হৃদয়েশের মনের সেই অবস্থা হয়েছিল—সুতরাং ভেতরে ভেতরে কবিরাজের প্রতি তাঁর ঘৃণার ভাব পুষ্ট হ'তেছিল। দেবেশের হত্যা সম্বন্ধে একমাত্র কবিরাজকেই তিনি সকল কথা নির্ভয়ে ব'লে মনের ভারটা লঘু করতে পারতেন। কিন্তু দেবেশ তার ছোট ভাই, হত্যাটা হঠাৎ হ'য়ে গেছে, তিনি তাকে মেরে ফেল্‌বার ইচ্ছা কোন কালেই মনে পোষণ করেন নাই। এ সকল কথা কবিরাজকে বল্‌তে তার প্রবৃত্তি হ'ল না।

কবুলখাঁকে ডেকে এনে হৃদয়েশ অনেক রকম কায়দা ক'রে আসল কথাটা বার কর্‌বার চেষ্টা কল্লেন, কিন্তু সে কিছুই বল্লে না—তার সেই একই কথা, রজাকে নিয়ে সাবল দিয়ে খোয়েদের জঙ্গলে গর্ত্ত করে মৃত দেহটা তারা দু ভাই পুঁতে ফেলেছে। আর জন প্রাণী তা জান্‌তে পারে নাই।

কোনো দিক দিয়ে হৃদয়েশ এই ঘটনাটার কোন অর্থ করতে পারলেন না। কিন্তু একটা কথায় তাঁর মনে কতকটা সোয়াস্তি এল।

বাবাজি বলেছেন, রাজাবাবু অথবা তিনি এমন কোন কাজ করবেন না, যাতে তাঁর অনিষ্ট হয়। "তুমি নিজে যদি এ ব্যাপারটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে নিজের অনিষ্ট সাধন না কর, তবে আমাদের দ্বারা কোন অনিষ্ট হবে না।" বাবাজি তো মিথ্যে স্তোক-বাক্য বল্‌বার লোক নন্। তিনি সাধু পুরুষ, কেউত এমন কথা কখনও বলে নাই, যে বাবাজি কারু অনিষ্ট করেছেন। বিষয়টা যাই হ'ক, এর ভেতরের কথা কিছু দুর্ব্বোধ্য থাকুক, তাতে কিছু আসে যায় না তাঁকে কোন বিপদে ফেল্‌বার মতলব এঁদের নেই।

এই ভাবটা মনে হওয়াতে হৃদয়েশ কতকটা সোয়াস্তি বোধ কর্‌তে লাগলেন। এর মধ্যে হঠাৎ কবুল খাঁ একদিন এসে তার বৈঠক খানার দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁকে সেলাম করলে।

"কিরে মতলবটা কি ?" ব'লে হৃদয়েশ নিজে দরজার কাছে এসে তার কাছে দাঁড়ালেন।

"গোলাম বড় ভয় পেয়েছে।" এই শুনে হৃদয়েশ বৈঠকখানা সংলগ্ন নিরালা একটা কোঠায় তাকে নিয়ে বস্‌লেন, একখানি ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে কবুল খাঁকে সামনের জল চৌকি খানায় বস্‌তে বল্লেন।

"কি বল্‌ব কর্ত্তা, আমার গা কাঁপ্‌ছে।"

"কি হ'য়েছে ব'লে ফ্যাল্।"

"কাল রাত্রি দশটার সময় আমি ও রজ্জা বাজার থেকে ফির্‌ছি, দিনের বেলা দেওয়ানজি খাজনা আদায়ে পাঠিয়েছিলেন, অবসর পাই নি, সন্ধার পর এসে দুটো ভাত মুখে দিয়ে রাজকে বল্লুম, "শীগ্‌গির ভাত খেয়ে নে। একমন চাউল না হ'লে কাল খাবি কি ? চাষের ধানের চাল আজই সাবাড় হ'ল, তুই লণ্ঠনের চেরাগটা জ্বাল, আর বড় থলেটা আর

ধামাটা নিয়ে আমার সঙ্গে চ। বড় বউ বল্‌ছে মুড়ির ধান কিনে আন্‌তে, একটা খেজুরে গুড়ের হাঁড়ি ৷৹ আনা পড়বে—এখনত হাতে টাকা নেই। মুদির কাছে কিছু বাকি থাক্‌বে।"

"দুই ভাই এই বলে বাজার চলে গেলুম, সেখানে নালু সেখের সাথে মোলাকাং হ'ল। তার আড়তে বসে তামাক খেতে দেরী হ'য়ে গেল। তখন জিনিষ পত্র নিয়ে দু ভাই আস্‌ছি, জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড় উঠে মেঘটা উড়িয়ে নিয়ে চল্ল ; সেই জায়গাটায়—

"কোন জায়গাটায় ?"

"যেখানে ছোট বাবুর দেহটা হুজুর আর মুঁই ধরাধরি করে সরিয়ে রেখে ছিলেম।"

"সেখানে কি ?"

"সেখানে যে বড় চাল্‌তা গাছ আছে, তার উপর থেকে ছোট বাবু নাকীসুরে এমনই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন—যে আমরা দে-ছুট,—খেজুরে গুড়ের হাঁড়িটা রজার মাথার উপর থেকে ভুঁয়ে পড়ে গেল। আমি চোখ মুখ বুজে গুড়ের হাঁড়ির টুক্‌রা গুলি গামছায় বেঁধে ছুটে এসে বাড়ীতে পৌছুলুম্। কর্ত্তা, রজাকে পুছ্ কর্‌লেই সবই জান্‌তে পারেন, সে তো ভয়ে কাঁপ্‌ছে।

"ছোটবাবু যে কাঁদ্‌ছিল তোকে কে বল্লে ?"

"আজ্ঞে রজাকে পুছ করুন, ছোট বাবু হাত ছড়িয়ে বিলাপ করে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, আমরা দুজনেই দেখেছি। এই দেখুন, হুজুর, আমার গায় কাঁটা দিচ্ছে।"

আসল কথা, সেই চাল্‌তা গাছে একটা প্যাঁচা ও একটা প্যাঁচী অনেকদিন ধরে বাস কর্‌ত। প্যাঁচীটা মরে যায়, তখন প্যাঁচাটা সে গাছ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। কিন্তু পাঁচ সাত দিন পরে এক একবার

রাত্রে সে গাছের উপব ব'সে এমনই একটা রব করত, যে তা ঠিক নাকী-সুরের কান্নার মত শোনায়। এক ঘণ্টা আধ ঘণ্টা প্যাঁচাটা ঐরূপ আওয়াজ করে, সে গাছ ছেড়ে চলে যেত। এখন কবুল খাঁ সে দিন সাবল নিয়ে এসে যখন মৃত দেহটা দেখ্‌তে পেলেনা, তখন নিশ্চয়ই ঠাওরাল মড়াটা ভূত হ'য়ে গেছে। ঐ পথে আস্‌তে রজার ও তার গা যেন ছম্ ছম্ করত। মনের যখন এই অবস্থা, তখন প্যাঁচার কান্নাটা ছোটবাবুর কান্না মনে করা তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক হ'য়েছিল, বিশেষ প্যাঁচ টার সুরটা অতি বিকট ছিল এবং তাতে "হুম্ হুম্" একটা শব্দ কান্নার পেছন পেছন শোনা যেত, যেন কেউ সেই উৎকট কান্নার সঙ্গে লয় ক'রে তাল ঠুক্‌ছে, এমনই মনে হ'ত। গাছের দুটো ডাল সেই সময় ঝড়ের বেগে উঠ্‌ছিল, পড়্‌ছিল; কবুল খাঁ ও রজ্জবালির কল্পনা-শক্তি সেই দুটো ডাল দিয়ে ছোট বাবুর হাত পায়ের সৃষ্টি ক'রেছিল। হৃদয়েশ কবুল খাঁকে একবারে অগ্রাহ্য ক'রে বিদায় দিলেন, বল্লেন "তুই চিরকালের ভীরু, আমি বিলক্ষণ জানি—দেহটা যে আন্দাজ লম্বা চওড়া করেছিস্—সেই পরিমাণ যদি মনের জোর থাক্‌তো, তবে ভাবনা কি ছিল? তুই তার দেহ'টা যে কি করেছিস্ তা আমি এখনও ঠিক করতে পারি নাই। যা' বাড়ী গিয়ে তুই রজার কাছে আর তোর বউয়ের কাছে এসকল গল্প বল্‌গে, তারা তোর কথা বিশ্বাস করবে।"

কবুল খাঁ ক্ষিপ্তের মত উত্তেজিত ভাবে ডান হাতটা ভুঁয়ে ঠেকিয়ে সেলাম করতে করতে বল্লে—"কর্ত্তা আপনি হচ্ছেন মা বাপ, আমি যদি স্বচক্ষে তানাকে না দেখে থাকি, নিজের কানে যদি তার কান্না না শুনে থাকি, তবে আমি আক্রমালিসেখের ব্যাটাই নই।"

আরও নানারূপ শপথ উচ্চারণ করে কবুল খাঁ চলে গেল।

হৃদয়েশের মনে দুই একটিবার এই চিন্তাটা হ'ল—যদি দেবেশ ভূত

হ'য়ে কানাই বাবাজি বা কিশোর রায়কে সব কথা বলে গিয়ে থাকে,—হ'তেও পারে, তাই লৌকির প্রমাণ অভাবে মোকর্দ্দমা আদালতে দাঁড়াতে পারবে না। তাঁরা কিছু কল্লেন না, কিন্তু দেবেশের স্ত্রীকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিলেন।

এইটিই দেবেশ সম্ভব পর মনে ক'রে ভূতের কথাটা আর উড়িয়ে দিতে পার্‌লেন না। তার উত্তেজিত মস্তিষ্ক এই কথাটি নিয়ে আরও উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌ল। এইরূপ অপমৃত্যু যাদের হয়, তারাইত ভূত হয়। শাস্ত্রেও ভূতযোনির কথা আছে, কবুলখাঁ যেরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে কথা-গুলি বলে গেল, তাতে স্পষ্টই বোধ হ'চ্ছে সে কিছু দেখেছে।

দেবেশের নাম না ক'রে কবুলখাঁ ও রজ্জন রটিয়ে দিল যে বাজারের পথে চাল্‌তা গাছের উপর কোন কোন রাতে ভূতের কান্না শুনতে পাওয়া যায়। সেই প্যাঁচাটার কান্না আরও দুচার জন লোক শুন্‌লে। সুতরাং হৃদয়েশের নিকট আরও কয়েক জন লোক বল্লে যে তারা স্বকর্ণে ভূতের কান্না শুন্‌তে পেয়েছে।

হৃদয়েশের মনে সত্যই ভয় হ'ল। ভূতটা হয়ত একদিন না একদিন তাকে ধরিয়ে দেবে—নতুবা হয়ত কবিরাজের বাড়ী থেকে সন্ধ্যা কালে আস্‌বার মুখে ঘাড় মট্‌কে দেবে।

সে তার আড্ডা থেকে যখন রোজ আসে, তখন ৪৷৫ জন পাইক সঙ্গে থাকে, তথাপি চাল্‌তা-তলার কাছে এলে সে নিজের হৃদ্‌পিণ্ডের দুপ্‌ দাপ্‌ শব্দ শুন্‌তে পায়—ভয়ে মুখ শুকিয়ে যায়। একদিন তার মাথার উপর একটা শুকনো পাতা পড়েছিল, অমনি সে ভয়ানক চেঁচিয়ে উঠ্‌ল ও পাইকগণ এসে চার দিকে খোঁজ ক'রে দেখ্‌তে লাগল।

ক্রমে তার শরীর আবার ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। রাত্রে

অতি অল্প সময়ই ঘুম হয়, যেটুকু হয়, তাতেও নানারূপ বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখতে থাকে। একদিন দেখলে, যেন দেবেশ তার গলায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে একটা গলার হাড় হাতে করে তাঁকে ধরতে এসেছে। সে পালাতে গিয়ে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেল, তখন বাঁ হাতের কঙ্কাল দিয়ে গালবাদ্য করতে করতে দেবেশ দৌড়িয়ে এসে তাকে ধরে ফেল্লে। ঘুম ভেঙ্গে হৃদয়েশ চীৎকার করে উঠে বসে রইলেন, আবার পাছে ঐরূপ স্বপ্ন দেখেন এই ভয়ে হৃদয়েশ একটা তাকিয়ার উপর ঠেশ দিয়ে বাকী রাতটা ব'সে রইলেন—চোখ বুজলেন না।

আর একদিন স্বপ্নে দেখলেন, যেন ছেঁড়া তালি দেওয়া কাপড় পরে শ্যাম এসে তার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের গলায় হাত দিয়ে বলছে; "জ্যোঠাবাবু, কবিরাজের ওষুধ খেয়ে এই দেখ আমার গলাটা জ্বলে যাচ্ছে!"

যখন হৃদয়েশের অবস্থা এইরূপ, তখন দুইটি ঘটনা ঘটল—যাতে তাঁর ভাবান্তর হ'ল।

———

দেবেশের সিন্দূরতলা ছাড়ার পর প্রায় দুই বৎসর অতীত হ'য়ে গেছে, এই সময় অপ্রত্যাশিত ভাবে হৃদয়েশের গৃহে একটি পুত্র সন্তান লাভ হ'ল। যে দিন পুত্রটি জন্ম গ্রহণ করল, ঠিক তার দুদিন পরে—হৃদয়েশ এক খানি চিঠি পেলেন। খামের উপরকার লেখাটা পরিচিত বলে বোধ হ'ল—তা এইরূপ।

শ্রীহরি

বরিশাল, ঝালকাটি পোঃ, রূপগা।

শ্রীচরণেষু,

দাদা, তুমি হঠাৎ রেগে গিয়ে আমার গলা টিপে ধরেছিলে—তোমার আমাকে খুন করার ইচ্ছা ছিলনা, আমি কিন্তু প্রায় মরবার মত হ'য়ে ছিলাম; আমার গল-নালির উপরকার হাড় খানি ভেঙ্গে যায়,—শ্বাসরোধ হওয়াতে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। তুমি ছেড়ে গেলে কানাই বাবাজি আমাকে তদবস্থায় আবিষ্কার করেন এবং হরিদ্বারে একরূপ লতা আছে যাতে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে, তা' দিয়ে আমার চিকিৎসা করবার উদ্দেশ্যে কিশোর রায় মহাশয়ের সাহায্যে আমাকে হরিদ্বারে ত্রিস্রোতার ধারে একটি আশ্রমে আনেন।

বাবাজির চেষ্টায় আমি মৃত্যুর দরজা হ'তে এই ভাবে ফিরে আসি। তারপর শুনলেম, শ্যামলেশ মারা গেছে। এই শুনে বৈরাগী হ'য়ে আশ্রম ছেড়ে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াই। অনেক অবস্থা পরিবর্ত্তনের পর আমি রূপগায়ে একটি অনাথ-আশ্রম খুলেছি। যাঁরা টাকা দিয়ে এই আশ্রম রক্ষা কচ্ছেন, তাঁরা আমার উপর আশ্রমের ভার দিয়েছেন।

সম্প্রতি কানাই বাবাজি শ্যামের মাকে এইখানে দিয়ে গেছেন। বাকী জীবন আমরা এইখানেই কাটাব, মনে করেছি। বাবাজি তাঁর বৃন্দাবনের মঠে চলে গেছেন।

"আমরা সিন্দূর তলায় আর যাবনা। তুমি রাধামাধবের সেবা যত্নপূর্ব্বক ক'রো। এঁরা আমাদের পুরুষানুক্রমে গৃহ-দেবতা।

"আমার যা কিছু বিষয় আছে, তা সকলই তোমাকে দিলাম। কেবল মথুর মণ্ডলের পত্তনির বাৎসরিক ৩০০৲ টাকা আমাদের এই অনাথ আশ্রমে দেওয়ার ব্যবস্থাটি রাজাবাবু ক'রে রেখেছেন।"

"নববৃন্দাবন অত শক্ত ক'রে ধ'রে রাখার চেষ্টা না করলেই আমার পক্ষে ভাল ছিল। এই ক'রে তোমার স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হ'য়েছিলেম। বাবাজি আমাকে বাগানটি তোমার কাছে বিক্রয় করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। তাঁকে তোমার গুপ্তচর মনে করে—পাপিষ্ঠ আমি—তাঁকে সন্দেহ ক'রে কষ্ট দিয়েছি।

"যা হো'ক, নববৃন্দাবন প্রভৃতি সকলই তোমাকে দিলাম। শ্যামের মা একবার দিয়ে এসেছেন, আমি সেই দান এই পত্রদ্বারা অনুমোদন করলেম।

"দাদা, আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা ক'র। শিশুকালে আমার গায় কাঁটার আঁচড় লাগলে তোমার বুকে বাজ্‌ত, আমি কর্ম্মদোষে সেই অগাধ স্নেহ হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে আছি। দাদা, তোমাকে আমি কি উপদেশ দেব, আমি ছোট ভাই। একটি কথা আব্দার করে বলে যাচ্ছি, দাদা, তুমি কবিরাজের সঙ্গে মি'শ না। তোমার ভেতরটা ভাল, ঐ লোকটার পরামর্শে তুমি নিজের প্রকৃতি ভুলে যাচ্ছ। বৌদিদিকে আমার প্রণাম দিও। আমরা এখানে বেশ ভাল আছি। প্রণত

শ্রীদেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

পত্রখানি প'ড়ে হৃদয়েশের মুখখানি অশ্রুতে ভাস্‌তে লাগল। ভাতৃ-স্নেহ বহুকাল নিদ্রিত ছিল,তা পূর্ণ জোরে জেগে উঠ্‌ল। হৃদয়েশ ভাব্‌লেন, "এখনই রূপগাঁয়ে গিয়ে আমার সমস্ত বিষয়ের অর্দ্ধেক দেবেশকে লিখে পড়ে দিয়ে আসি, আমার এত দিনের বাঞ্ছিত পুত্রও যেরূপ, দেবেশ ও ঠিক সেইরূপ —শুধু আমার স্নেহের নহে, আমার বিষয়েও তার তুল্যাধিকার।"

সেইদিন কবুলখাঁ এল, হৃদয়েশের মন সে দিন অত্যন্ত উদার হ'য়েছিল তিনি দেবেশের চিঠি তাকে প'ড়ে শুনালেন। হাতে হাত ধরা পড়ে কবুল-খাঁকে সে দিন স্বীকার কর্‌তে হ'ল, সে এবং রজা সেদিন ছোটবাবুর দেহ সেখানে পায় নি। চাল্‌তা তলার ভূতের সম্বন্ধে সে বল্লে, ছোটবাবু যখন বেঁচে আছেন, তখন এ ভূত অপর কারু হ'বে। কিন্তু সেই জায়গায় যে ভূত আছে, তা সে হলপ্ করে একশবার বল্‌বে।

হৃদয়েশ কবুলখাঁকে বল্লেন, "আমি দেবেশের নানা দিক দিয়ে সর্ব্বনাশ করেছি। এখন তাঁর কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইব ও আমার সকল বিষয়ের অর্দ্ধেক তাকে লিখে পড়ে দিয়ে আস্‌ব।"

কবুলখাঁ ঘাড় নেড়ে বল্লে, "না কর্ত্তা, এমন কাজ কর্‌বেন না, আপনি তাকে খুন করতে চেয়েছিলেন। তারপর শ্যামলেশ বাবুর মৃত্যু নিয়ে ও নানা লোকে নানা কথা কইবে। আপনি সেখানে গেলে মনের ব্যগ্রতার নানা কথা বল্‌তে পারেন, ছোটবাবুর ও মুখ দিয়ে হয়ত নানা কথা বেরুতে পারে। সেখানে অনেক লোক থাকবেন, অনেক কথা তারা জান্‌তে পারবেন,পুলিশের কানে কথাটা উঠ্‌তে পারে। আপনারা বড়লোক, আমি কিন্তু পুঁটি মাছ, ছোটবাবুর দেহটার কাছেত আমিও ছিলাম! পুলিশ এসে জোর জুলুমটা আমার উপরই খাটাবে। হুজুর যে চিঠি পেয়েছেন, বাক্সের ভিতর চাবি বন্ধ করে রেখে দিন, এর কোন উত্তর দেওয়ার দরকার দেখ্‌ছি না। সেখানে গেলে কি বিপদ হবে, কে জানে?"

হৃদয়েশ খুনী হউন, জালিয়াৎ হউন, কিন্তু মনটা ছিল তার অতি ভীত। কবুলখাঁ যা বল্লে,ঠিক গিয়ে তাঁর মনে লাগ্‌ল। ভাতৃস্নেহ ঠেকিয়ে রেখে ভয় তাঁর মনটাকে একবারে দখল করে ফেল্‌ল। তিনি রূপগাঁয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছাড়্‌লেন, এমন কি দেবেশকে একটা চিঠির উত্তর পর্য্যন্ত দিলেন না। কিন্তু ভুতের ভয় তাঁর তদবধি দূর হ'য়ে গেল।

---

(৩৭)

এদিকে হৃদয়েশের ছেলেটি বেশ বড় হয়ে উঠ্‌ল, তার নাম হ'ল, রমেশ।

সেই ছোট ছেলেটিকে ভগবান একটা বিশেষত্ব দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন, তা, তার অদ্ভুত পিতৃস্নেহ। পাঁচ বছরের ছেলে যেন বাপকে চোখে হারাত। হৃদয়েশ যেখানে যাবেন, সে সেখানে যাবেই! সুতরাং কুস্তির আড্ডায়, কবিরাজের বৈঠক খানায় সর্ব্বত্র সে ছায়ার মত বাপের পাছে পাছে যেত। দিনের বেলায় হৃদয়েশ ঘুমোচ্ছেন, ছেলেটী দিনে ঘুমোত না, সে দেরাজ থেকে একটা উড্‌ পেন্‌সিল বার করে একটা খাতায় নানারূপ লিখে যেত। নিঃশব্দে দুই ঘণ্টা একাদিক্রমে লেখা চল্‌ত, তার জন্য দপ্তরী সপ্তাহে একখানি খাতা তৈরী ক'রে এনে দিত। অবশ্য তার লেখা এ পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিত পড়ে উঠ্‌তে পারেন নাই। হৃদয়েশ এই লেখাগুলি রমেশ বাবুর 'রায়' (judgment) নাম দিয়েছিলেন?

মাঝে মাঝে পাড়ার ছেলেরা এলে রমেশ তাদের সঙ্গে বাইরের আঙ্গিনায় ছুটো ছুটি করে খেল্‌ত। একদিন হৃদয়েশ বল্লেন, "বাবা, যার তার সঙ্গে খেলা কর্‌তে নাই। ওদের কেমন ছেঁড়া ময়লা কাপড়, কারু কারু পায়ে জুতা নাই, ওরা গরীব, ওদের সঙ্গে কি মিশ্‌তে আছে।"

এ শুনে একদিন রমেশ কাঁদ কাঁদ হয়ে বল্লে, "বাবা, ওই যার কাপড় খুব ময়লা, চুলগুলি জটার মতন—ও বড্ড ভাল ছেলে, বড় সুন্দর স্বভাব, আমায় বড্ড ভালবাসে, বাবা। হরিদাসদের বাড়ীতে যে বড় বড় নারকেলী

কুল আছে, তা কত কষ্ট ক'রে পেড়ে এনে আমায় দেয়! কাঁটায় পিটে আঁচড় লেগেছে,কিন্তু তবু হাসিমুখে বড় বড় কুলগুলি আমায় দিয়ে যায়। ওই যে বেণী,সে তো খুব ভাল পোষাক প'রে আসে,তার বাপ হচ্ছেন জজ,কিন্তু সে আমায় ঐরূপ ভালবাসুক তো ?—ইস্। বেণী ভারী রাগী, তার বাপ সদর ওয়ালা, এই বড়াই সে সর্ব্বদা করে। আর ঐ ছেলেটি যে জুতো পরে না,—ও এমনই কাঁদ কাঁদ সুরে ওর মা-বাবার যে পয়সা নেই, রোজ দুসন্ধ্যে খেতে পায় না,তা বলে,যে ওর কথা শুনলে ওকে বড্ড ভালবাস্তে ইচ্ছা হয়,বাবা। আমি একদিন বল্লুম-"তুই এত রোগা কেন ? পেট ভ'রে দুধ খেতে পারিস্ না, খুব জোর হবে।" তা শুনে বল্লে কি "ভাতই পাই না, আর দুধ পাব কোথায় ?" তাই শুনে আমার এত দুঃখ হ'ল যে কাল হতে দুধ খাওয়ার সময় আমার কান্না পেয়েছে। বেণীটা বল্লে কিনা,-"যা তুই চলে যা, আমাদের সঙ্গে খেল্তে পাবিনা।" এই বলে তার কাঁধের কাছটা ধরে তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিল। আমি তাকে আদর করে ধরে নিয়ে এলাম।"

এই সকল শুনে হৃদয়েশ অবাক্ হয়ে গেলেন। ছেলেকে কি বল্‌বেন, ঠিক করতে পারলেন না। অবশেষে যেন জোর করে ভাঙ্গা গলায় বল্লেন,-"ও গরিবদের সঙ্গে যেতে নাই, লোকে দেখ্‌লে কি বল্‌বে। ছেঁড়া কাপড় পরা, জুতো নাই, রাস্তার কুড়নো ছেলেগুলির সঙ্গে খেলা করা ভাল নয়।" "তবে কি বেণীর সঙ্গে খেল্‌ব ? ওর সঙ্গে থাক্‌লে যে আমি খারাপ হ'য়ে যাব। ও তার বড় ভাইয়ের বাক্স থেকে হ্যাভেনা চুরুট এনে আমাদের বল্‌ছিল "তোরা খাবি ?" মা তো চুরুটখেকো ছেলে দেখ্‌লে আমায় কখনই তার কাছে যেতে দেন না। বাবা, তুমিত ওদের কাপড় জুতো কিনে দিলেই পার, তবেই ত আর ওরা ময়লা কাপড় প'রে মলিন মুখ ক'রে আস্‌বে না। ভাল কাপড় জুতো পরে এলে তো তোমার কোন আপত্তি

হবে না। তাতে বা কতই খরচ হবে? তোমার তো কতদিকে কত খরচ!" এই বলে রমেশ তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে আব্দার করতে লাগ্‌ল, এবং পুনরায় বল্লে "বাবা, যদি ঐ রোগা ছেলেটা দুধ না খেয়ে মরে, যায়, তবে দুধ আমার বিষের মত লাগ্‌বে, আমার তা খেতে গিয়ে কেবলই চোখ দিয়ে জল পড়্‌বে।"

বালকের আবদারে হৃদয়েশের মন কতকটা গ'লে গেল। ঠিক সেই সময়ে একখানি মলিন মুখ, ও তার ছেঁড়া তালি দেওয়া কাপড়ের কথা মনে পড়্‌ল। সেও তো বাড়ীর ছেলে ছিল, তাঁর আদেশে কতদিন দরোয়ানেরা তাকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেয়নি, ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরাই হচ্ছে তার অপরাধ; তার মৃত্যুর কথা মনে পড়ল। হৃদয়েশ পুত্রের মুখে চুমো খেয়ে বল্লেন "আচ্ছা বাবা, কাল ওদের খাবার নিমন্ত্রণ করে এস, তার পর ওদের সকলকেই এক রকম কাপড় পরে খেতে হবে, এই বলে জল খাবারের ঘরে চাকরের হাতে কাপড়গুলি রেখে দিয়ে এস। তার পরে তোমরা একত্র খেও এবং যদি তারা যাবার সময় তাদের কাপড় পরে যেতে চায়, তবে নিধিরাম চাকরটাকে ব'ল সেগুলি তাদের বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিতে। "এ কাপড় ভাই আমার উপহার" এই বলে তাদের গ্রহণ করতে অনুরোধ কোর। তা না হলে হঠাৎ কাপড় পাঠিয়ে দিলে তারা যদি না নেন্‌—তারা গরীব হলেও ভদ্রলোক, আমাদের দেওয়া কাপড় চোপড় নেবেন কেন? রোগা ছেলেটা বাড়ী এলে তুমি তাকে ধরে রেখ এবং তোমার জলখাবার সময় তাকেও খাইয়ে দিও। দুধ রোজ ক'রে দিতে গেলে তার বাবা সম্মত নাও হতে পারেন।"

রমেশ কথাগুলি শুনে যে কত খুসী হ'ল তা বলবার নয়। সে কলরব করে, গান গেয়ে বৈঠকখানা ঘরখানি আনন্দময় করে তুল্‌লে।

একদিন রমেশ বিকেল বেলা ছেলেদের সঙ্গে খেলা করে বাড়ী

ফিরছে—এমন সময় দপ্তরখানার পাশে একটি আধ বয়সী ভদ্রঘরের মেয়ে ও একটি বৃদ্ধ বামুনকে দেখ্‌তে পেল। বুড় অতি বিমর্ষ, পায়ে তালতলার ছেঁড়া চটি, একখানি খাটো ময়লা ধুতি, তা জানুর উপরে, হাতে একগাছা লাঠি। স্ত্রীলোকটি মোটা একখানি কালো পেড়ে শাড়ী পরে—ঘোম্‌টা টেনে দোরের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় পাইক-সর্দ্দার সঙ্গে ক'রে রাজনারায়ণবাবু এলেন। তাঁকে দেখে স্ত্রীলোকটি ঘোমটায় মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগ্‌লেন—"আর চারিটি দিন আমায় থাক্‌তে দিন, বড় ছেলেটি ১৯ দিন জ্বরে ভুগ্‌ছে—তার জ্বরটা ছাড়্‌লে যাব, এ অবস্থায় তাকে কি ক'রে বাড়ীর বার করব—আর কোথায়ই বা যাব?" বুড় বামুন বল্লেন, "নায়েব-বাবু আপনি কায়েত, আপনার পায়ে ধরলে অকল্যাণে হ'বে—নতুবা ধরতুম। সাত পুরুষের ভিটে, ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় যাই—তা যখন যেতে হবে, যাব। বড় ছেলে জ্বরে পড়ে আছে—শুধু হাড় কখানি আছে—একটু ভাল হ'লে যাব। পরেশ ডাক্তার বলেছেন, বুধবার ২১ দিন, সেই দিন জ্বর ছাড়বে। অমনি দেখে, আমরা ভিজিট দিতে পারি না।" কোঁচার খুঁট খুলে বুড় চক্ষু মুছ্‌লেন।

রাজনারায়ণবাবু ভুরু দুটি উর্দ্ধদিকে টেনে, কপাল কুঁচ্‌কে—বিরক্তির সুরে বল্লেন, "কালই সকালে বাড়ী ছাড়্‌তে হবে, ও সকল কথা শুন্‌লে আর কাজ চলে না। কাল প্যায়দারা যাবে—তাদের হাতে অপমান হয়ে বেরুতে হবে, ভাল চাও তো আজ রাত্রে ছেলে পিলে নিয়ে সরে যাও। কেন বাবু, তোমার এক ভাই তো চুঁচড়ো কালেক্টরিতে মুহুরীগিরি কর্ম্ম করে—তার ওখানে চলে যাও না।" বুড় বল্লেন, "তা যদি সে স্থান দিত, তবে আপনার কাছে আস্‌তুম না, শ্যালকেরা ও তার এক খুড়-শ্বাশুড়ী তাকে ঘিরে রেখেছে—সেখানে আমাদের যাবার উপায় নেই।"

বুড় রাজনারায়ণ বাবুর হাত ধরতে গেলেন—পাইকদের একজন তাঁকে হাঁকিয়ে দিল। নায়েববাবু বল্লেন, "জ্বালাতন করলে আর কি? কেন বাড়ী বন্দক দেওয়ার সময় মনে ছিল না?" এই বলে আর উত্তর শোন্‌বার প্রতীক্ষা না করে তিনি দপ্তরখানায় চলে গেলেন। বুড় ও তাঁর স্ত্রী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ীর দিকে রওনা হ'লেন। পুকুরের পাড়ে গিয়ে ব্রাহ্মণী আর চল্‌তে পারেন না, তিনি বসে পড়ে কপালে হাত দিয়ে মৃদুস্বরে কেঁদে কেঁদে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমি মরা ছেলেটাকে কি ক'রে নে যাব? প্যায়দারা এসে যে দিন প্রথম ঢোল বাজায়, সেই ঢোলের শব্দ শুনেই ত বাছার ভয়ে জ্বর হ'য়েছে—তার বুড় মা বাপ কোথায় দাঁড়াবে—এই ভয়ে ত সে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিল। আজ বাবা ১৯ দিন ভাত খায় নি, একটু বার্লি কিনে দিচ্ছি, কাল বার্লিও নেই, কোথায় তাকে নিয়ে যাব?"

বুড় তার স্ত্রীর বিলাপ শুনে পাগলের মত এ দিক ওদিক চাইতে লাগ্‌লেন, তার বড় দুটি চোখ জলে ভেসে যেতে লাগ্‌ল।

রমেশ এই দৃশ্য দেখে ছুটে যেয়ে বাবার কাছে উপস্থিত। সে বল্লে "বাবা, তুমি রাম-চাটুর্য্যেকে ভিটে ছাড়া করাচ্ছ? ওর ছেলে সুধানাথই তো ময়লা কাপড় পরে—আমার সঙ্গে খেলতে আসে, বাড়ী ছাড়্‌লে ওরা যাবে কোথা?"

হৃদয়েশবাবু বিরক্তির সুরে বল্লেন "আচ্ছা রেমো, তুই কি সকল কথার মধ্যেই থাক্‌বি? জমিজমা বিষয়-সংক্রান্ত কথা, ছেলে মানুষ তুই—তোর থাকার দরকার কি? টাকা ধার নিয়েছে, দিতে পারে নাই, বন্দকী জমি ডিক্রী করে নেওয়া ছাড়া আর কি করে টাকা আদায় হয়, বল্। যা বাড়ীর ভেতর যেয়ে জলটল খাবি খাগে। সব কথার মধ্যে থাকিস্ না।"

রমেশ তার বাবার দিকে ছল্ ছল্ চক্ষে একবার চেয়ে চলে গেল। তার প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে, হৃদয়েশ বাহির বাড়ী থেকে অন্দর-মহলে যাচ্ছিলেন। রমেশের প্রাণে যে খুব আঘাত লেগেছে, এটি তিনি বুঝ্তে পেরে দুঃখিত হ'য়ে ছিলেন। হৃদয়েশের হৃদয়ে মায়া মমতা ছিল—এ পর্যান্ত তা গুপ্ত ছিল, কিন্তু রমেশ শিশু হ'লেও তার অপরিসীম স্নেহগুণে তা জাগিয়ে তুলেছে। এ পর্য্যন্ত কত লোককেই ত তিনি ভিটে ছাড়া করেছেন, নিজের সহোদর দেবেশও বাদ পড়ে নি, কিন্তু আজ রমেশকে অগ্রাহ্য করে—সে চলে যাওয়ার পর—তাঁর মনে হ'ল শিশুর প্রাণে লেগেছে!—কাঁদ কাঁদ হ'য়ে চ'লে গেল!"

তার মনটা অনেকটা কোমল হ'য়েছে—এমন সময় অন্দরের পথে লাইব্রেরীর ঘরে তিনি দেখ্তে পেলেন, অতি দুঃখিত হ'য়ে রমেশ ব'সে আছে—সে সেই অবধি আর ভেতর বাড়ীতে যায় নাই, জল-খাবারের সময় চলে গেছে—তার মুখখানি শুক্নো, নিশ্চয়ই কিছু খায় নি। চোখ দুটি লাল—খুব কেঁদেছে, তিনি বুঝ্তে পার্লেন।

তাকে ডেকে আদর করে কাছে আন্লেন, দেবেশকে যে তিনি ভিটে ছাড়া করেছেন—এই মনে পড়ে বড় কষ্ট হ'ল। তিনি রমেশের হাত ধরে পুনরায় বার ঘরে এসে রাজনারায়ণকে ডেকে পাঠালেন। তাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"রাম চাটুর্য্যের দেনা কত?"

"আজ্ঞে ২৫০৲ নিয়ে ছিল এখন, সুদ শুদ্ধ হয়েছে সাতশত একুশ টাকা চার আনা, তারপর মামলা ও ডিক্রিজারীর খরচ ৫১৲ টাকা —মোট ৭৭২।০।"

"সে কত দিতে পারে?"

"আজ্ঞে মাত্র তিনশ দশ টাকা জোগাড় করে এনে ছিল, তার

এক আফিসে কাজ করত অতুল কর্ম্মকার—সে বলেছে যদি তার বাপ দাদার আমলের ভিটে বজায় থাকে তবে ৩১০৲ টাকা অবধি সে তাঁকে দিতে পারে—তা এত কিছুই নয়।"

"তুমি ঐ তিনশ দশ টাকা নিয়ে খতখানি ছিঁড়ে ফেল।"

"এরূপ হ'লে ত আর কয়েকটি ডিক্রি আছে—কেউতো টাকা দেবেনা, ঘর বাড়ীও ছাড়বে না, সরকারের বিস্তর ক্ষতি হবে।"

"তা হয় হোক, আমি রমেশের মনে কষ্ট দেব না।"

রমেশ হাস্‌তে হাস্‌তে বাপের হাত ধরে অন্দরের দিকে চলে গেল। অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে ধীরে ধীরে পা ফেলে রাজনারায়ণ দপ্তর-খানার দিকে রওনা হ'ল।

একদিন রমেশ তার বাবাকে বল্লে, "বাবা, তুমি ঐ বুড় কবিরাজের সঙ্গে কোথাও যেও না, ওকে দেখ্‌লে আমার বড্‌ড ভয় হয়।"

"কেন বাবা? কব্‌রেজ মশায় ত তোমায় বড্‌ড ভালবাসেন।"

"ও ভালবাসা কেবল মুখের, ওকে দেখে কই আমার তো একটু ভাল লাগে না, লোকে বলে এই বুড় তোমাকে যত খারাপ বুদ্ধি দেয়।"

"তোর ওঁকে ভাল লাগে না কেন, বল্‌ দেখি?"

"তুমি তো বাবা মনু পালকে চেন—আমাকে কত খেল্‌না তৈরী করে দিয়ে যায়। কি সুন্দর বাঘ বানায়, তা'র লেজ কত মোটা! সে দিন আমাকে একটা চুপড়ী ভ'রে পুতুল দিয়ে গেছ্‌ল,—তার মধ্যে গনেশ. রামসীতা, আদুরে বুড়ী, বেড়াল, টিয়েপাখী আর কত কি ছিল। আমি সেগুলি বাড়ীতে আমার বস্‌বার ঘরে নিধেকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেম। মাকে গিয়ে বল্লুম, "মনু অনেক খেল্‌না এনেছে, ওকে খাবার পাঠিয়ে দাও।"

মা ভাল খাবার পাঠিয়ে দিলেন। মনু হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লে, "মনিব বাড়ীর পেসাদ, পাবার আশায় ও ছোটবাবু তোমায় দেখ্‌বার লোভেই ত এখানে আসি। তোমার কথা আমাদের বাড়ীর সব্বাই জানে। আমরা তোমার জন্য পুতুল গড়ি, আর তোমার সম্বন্ধে কত কথা বলি।" এই বলে সে একটা গ্লাসের জলে হাত ধুয়ে আসন খানিতে বসে থালায় হাত দিয়েছে, এমন সময় তোমার কব্‌রেজ এলেন, এসেই চোখ রাঙ্গিয়ে বল্লেন—"রাজনারায়ণ বল্‌ছে, ছোটবাবুকে দুটো পুতুল দিয়ে যাস্—আর দুই বছরের খাজনা বাকি ফেলেছিস্—আজ বাপু আক্কেল পাবি, আমি ঠিক করে এসেছি।"

"মনু পাল খাবার থেকে হাত তুলে হাত জোড় করে বল্লে, "কবিরাজ মশাই, ছোটবাবুকে খেলানা দি, আমার মনের আনন্দে, কোন মতলব এর মধ্যে নাই। গেল বছর আমাদের সিন্দূরতলার ক্ষেতে একেবারে ধান হয় নি, সময় মত বৃষ্টি হ'ল না, চারাগুলি জ্বলে গেল,—তা হুজুর জানেন—বৃহৎ পরিবার কুলিয়ে উঠ্‌তে পারি নি, তা এবার শ্রাবণ মাসে সব খাজনা শোধ করে দেব—এটা জ্যৈষ্ঠ মাস, এ কটা দিন স'য়ে নিন।"

"কবিরাজ সে কথায় কান দিলে না, কত যে গাল মন্দ দিলে। ভ্রু দুটো টেনে চোখ লাল ক'রে ভয় দেখাতে লাগ্‌ল, "তোকে কুৎখানায় নিয়ে মেরে হাড় গুঁড়ো কর্‌ব"—এই বলে পাইক ডাক্‌তে গেল।

"আমি কত রকম করে মনুকে আর খাবার খাওয়াতে পাল্লুম না, সে ডান হাতে বাঁ হাতে চোখের জল মুছ্‌তে মুছ্‌তে বাড়ী চলে গেল।

"বাবা ওই কবিরাজের সঙ্গে আর মিশ না। ওকে কি তুমি জমিদারীর ভার দিয়েছ? উনি প্রজাদের উপর এমন করেন কেন?"

"বাবা, উনি আমার হিতৈষী, তাই বলেই করেন, নতুবা ওঁর ত আর কোন স্বার্থ নেই।"

"না বাবা, উনি তোমার হিতৈষী নন্।"

কবিরাজের প্রতি হৃদয়েশের মনে একটা বিরক্তির ভাব এসেছিল, শিশুর মুখে এই শুনে—সেটা বেড়ে গেল! হৃদয়েশ এখন প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকেন। রমেশ যতটুকু কাছে থাকে—ততটুকুই তার মনে আনন্দ থাকে—দেবেশের কথা মনে হয়ে সর্ব্বদা যন্ত্রণা হয়—'নববৃন্দাবন' একটা বড় জঙ্গলে পরিণত হ'য়েছে,—তিনি তা' পেয়ে একবারও সেটি পরিষ্কার করেন নি। ঐ বাগানটি চোখের কাছে পড়্লেই তাঁর ছোট ভাইটির কথা মনে পড়্ত—অমনই তাড়াতাড়ি সেখান হ'তে সরে পড়্তেন।

এদিকে রতন কবিরাজের প্রতি লোকের বিদ্বেষ বদ্ধমূল হয়ে গেছে—তারা ওর নামে জ্বলে যায়। অনেকের জমিই কবিরাজ মহাশয় হাত করেছেন—তারা ওর মত আদালতে ঘোরাঘুরি কর্‌তে পারে না, ওর মত অনেকের টাকা নেই,—এজন্য তারা সয়ে গেছে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওর প্রতি অভিসম্পাৎ রোজ রোজই হচ্ছে।

তবে, তা সত্বেও পসারটা তার বজায় আছে। কারণ অনেকে পৈত্রিক কিংবা স্বকৃত পাপ-জনিত ব্যাধিতে পড়ে লজ্জায় যার তার কাছে বল্‌তে পারে না। রতন কবিরাজ তাদের বন্ধু ও উপদেষ্টা। অনেক জাল উইলের ইনি সাক্ষী। এ ছাড়া প্যাচা যেমন আঁধারে উড়ে বেড়ায়, সেইরূপ কোন কলঙ্কিত জীবনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নির্ম্মম চিকিৎসার দরকার হ'লে তিনি যাতায়াত ক'রে থাকেন।

সম্প্রতি এক ঘর কায়স্থ সিন্দুরতলায় এসে বসবাস কচ্ছেন—তাঁদের বাড়ীর পশ্চিম দিকে রতন কবিরাজের কতকটা জমি ছিল। কায়স্থ-

পরিবারের একজন ডাক্তার, আর দুইজন দূরে বিষয় কর্ম্ম করেন। অনেক সময়েই বাড়ীতে শুধু মেয়েরা ও চাকর-বাকরেরা থাকে। ডাক্তার কর্ম্মস্থল হ'তে সপ্তাহে দুবার বাড়ীতে যাতায়াত করেন। একবার তিন ভাই একত্র হ'য়ে বাড়ী এসেছেন, তাঁরা বাড়ীর বাগানটা ঘুরতে ঘুরতে দেখ্তে পেলেন্ পশ্চিম দিকের কয়েকটা পিল্লে নূতন। ডাক্তার বল্লেন, "তিন বছর হ'ল পিল্লে করা হ'য়েছিল এ যে ঠিক নূতনের মত আছে।" দ্বিতীয় ভাই বল্লেন, "২।৩ বছরে কি পিল্লে পুরাণা হয়? ইট সুরকীর কাজ, ১০।১২ বছর পরে পুরানা দেখায়।" ইনি অনেক দিন স্কুল মাষ্টারি করেছিলেন, সুতরাং এর সাংসারিক বুদ্ধিশুদ্ধি ততটা সূক্ষ্ম ছিল না। ডাক্তার বাবু পিল্লের একখানি ইট খুলে বল্লেন, "এ পিল্লে আমাদের সে পিল্লে নয়, আমার শোবার ঘরের দেওয়াল মেরামত করার জন্য যে ইট আনা হ'য়েছিল, সে ইটের কতকগুলি অবশিষ্ট ছিল, তা দিয়ে এধারের ৬টা পিল্লে হয়েছিল। সেই ইটে 'এস্, বি' মার্কা ছিল। এই ইটের উপর দেখ্ছি 'টি, এম' মার্কা। এ কখনই আমাদের পিল্লে নয়।" তখন নক্সা বের ক'রে দেখালেন, এই নূতন পিল্লের জোরে রতন কবিরাজ জমির পূর্ব্বদিকে অনেকটা এগিয়ে এসে কায়স্থদের প্রায় আড়াই কাঠা জমি গ্রাস করেছেন। তাঁরা কিছু বল্লেন না। পিল্লে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল, কিন্তু ডাক্তার অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন।

এই ঘটনার এক মাস পরে রাত্রি ১০ টার সময় কবিরাজ শয়ন করতে যাবেন, এমন সময় একটি বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁর কাছে এলেন, তাঁর হাতে দিব্যি এক খানি হাতীর দাঁতের ছড়ি, সোনার চেনের ডগায় একটি হীরা জ্বল্‌ছে, সিল্কের রুমালে এসেন্স মাখা, বয়স ২৮।৩০ হবে। দেহ বলিষ্ঠ ও সুগঠিত, ফ্রেঞ্চ কাট গোঁপ দাড়ী,—বাবুয়ানা ফ্যাসানের। তিনি রতন কবিরাজের কাছে এসে বল্লেন, "কব্রেজ ম'শয়, বড়

বিপদে পড়ে এসেছি, আমার ৯ বছরের ছেলেটির কলেরা, আপনাকে এখুনি যেতে হবে।"

"আপনি কোত্থেকে এসেছেন ও আমার কোথায় যেতে হবে?"

"আমি এসেছি গড়পাড় থেকে—পাঁচক্রোশ দূরে, কিন্তু আমার ভাল রবার টায়ারের গাড়ী আছে, দু'ঘণ্টার মধ্যে যাওয়া যেতে পারবে। রাস-বিহারী বাবুর কাছে আপনার হাত যশের কথা শুনেছি, তাঁদের বাড়ীতে আপনি কলেরা চিকিৎসা ক'রেছেন।"

বাস্তবিক রামপুরবাসী রাসবিহারী দত্তের বাড়ীতে দু'বছর আগে তিনি কলেরার চিকিৎসা ক'রে একটি রোগীকে আরাম করেছিলেন। কবিরাজ বল্লেন,—"তাইত অনেকটা দূর যেতে হবে—রাত্রিকাল, আপনাদের দেওয়া থোওয়াটা কিরূপ হবে সেটি আগেই জানার দরকার। পূর্ব্বেই সকল কথা স্থির হয়ে থাকা ভাল।"

"তা হবে, আমরা বিপদে পড়েছি,—এসময় টাকা পয়সা নিয়ে কোন গোল যোগ হবে না। আজ রাত্রিটা সেই খানেই থাক্‌বেন—১০০৲ টাকা দেব। ছেলেকে ভাল করতে পারলে আমরা সাধ্যানুসারে পুরস্কার দেব। তা হ'লে দেরি ক'র্‌বেন না, আমার মানসিক অবস্থা যে কি, তা আপনি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্ছেন।"

কবিরাজ তাড়াতাড়ি পেছনের চুল কয়েকগাছা আঁচ্‌ড়িয়ে, আর্‌সীর কাছে মুখ বেঁকিয়ে ঠোঁটের কোণে পানের একটা ময়লা দাগ পড়েছিল, তা' রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেলে সাদা কোঁচানো কাপড় পরে, বেনিয়ান গায় দিয়ে, লক্কাদার চটী পরে, এক খানি সাদা উড়্‌নী কাঁধে ফেলে বাবুটির সঙ্গে বার হ'য়ে গাড়ীতে উঠ্‌লেন।

তখন জোছনাটা বেশ ছিল,—কিন্তু আধ ক্রোশ রাস্তা যাবার পরেই শুক্লা সপ্তমীর জোছনার অধিকার ফুরিয়ে গেল। কবিরাজ ব'সে ব'সে

ঝিমুচ্ছেন, এবং তিনু সেকের নিকট প্রাপ্য টাকার সুদের হিসাবটা নিয়ে তন্দ্রার অবকাশের মধ্যে নাড়া চাড়া কচ্ছেন। এই সময় গাড়ীখানি একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল—সেই জঙ্গলের মাঝে সের সার আমলের একটা বড় রাস্তা আছে, তা'. অনেক জায়গায় ভেঙ্গে চুরে গেছে—গাড়ী সেই জায়গা গিয়ে একবার উঁচুতে উঠে ধপাৎ করে নীচে পড়্তে লাগল। সেই ওঠা-পড়ার শব্দে কবিরাজের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি জেগে উঠে দেখেন, বাবুটি গাড়ীতে নেই। তখন চীৎকার ক'রে কোচওয়ানকে বল্লেন, "বাবু কোথায় ?" গাড়োয়ান বল্লে "বাবু একটু বাইরে গেছেন, এক্ষুণি আস্‌বেন।"

বাস্তবিক বাবুটি জঙ্গল হ'তে শীঘ্র এসে পড়্‌লেন। তিনি তাঁর কৃত্রিম গোঁপ ও দাড়ী ফেলে দিয়েছেন—সিল্কের জামা আর গায়ে নাই। ধুতি ছেড়েছেন, কটিতটে একটা ল্যাঙ্গট্ পরা আছে, হাতে একখানি লাঠি। তিনি এখন আর বাবু নন্—একটি বড় গুণ্ডা, তার সঙ্গে আরও চারজন গুণ্ডা এসে চীৎকারকারী কবিরাজের মুখ কাপড়ে বেঁধে ফেল্লে, এবং একজন নাড়ী ধ'রে তাঁর নাকে ক্লোরাফারম্ দিয়ে তাঁকে অজ্ঞান কল্লে, চারজনে হাত পা খুব শক্ত ক'রে ধরে ছিল, সুতরাং তিনি নড়্‌তে চড়্‌তে পাল্লেন না। যে ক্লোরাফরম্ কচ্ছিল সে যখন দেখ্‌লে কবিরাজ অজ্ঞান হ'য়েছে, তখন একটা ডাক্তারি কেজ বার করে ল্যান্সেট দিয়ে তার কাণ দুটি ও নাকের ডগাটি কেটে ক্ষতমূলে ঔষধ লাগিয়ে দিয়ে ভাল করে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধ্‌লে। তারপর গাড়ীতে তাঁকে তুলে নিয়ে জঙ্গলের পথ ছেড়ে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা পরে পরিচিত সদর রাস্তায় নিয়ে এল, সেখানে ঘড়ী খুলে দেখ্‌ল পাঁচটা বেজেছে। তখন কবিরাজের একটু একটু জ্ঞান হচ্ছিল—তাকে রাস্তার একধারে শুইয়ে রেখে গুণ্ডারা গাড়ীতে উঠ্‌ল ও গাড়োয়ান গাড়ী ছেড়ে দিল—তারা কোথায় গেল কেউ তা জান্‌লে না।

কবিরাজকে ভোরের বেলা তদবস্থায় দেখে লোক জনেরা গাড়ী করে নিয়ে এল—পাকা হাতের ব্যাণ্ডেজ, দুই সপ্তাহের মধ্যে ঘা শুকিয়ে গেল। তিনি বড় একটা পাগড়ী মাথায় পরে কাটা কাণ দুটো ঢেকে রাখ্‌তেন, কিন্তু ফুলশূন্য বোঁটার মত ডগাহীন নাকের বাকীটা লোক দৃষ্টির বিষয়ীভূত হ'য়ে থাকত। বালকেরা তাকে দেখে ছড়া বেঁধে গাইত :—

"পাগড়ীতে তো কাটা কাণ ঢাকা বেশ হ'ল।
রাগ হ'লে বউ তোমার মল্‌বে কি তাই বল ?
কি মল্‌বে হে কব্‌রেজ ? নাকটি তোমার কাটা।
রাগ হ'লে বউ তোমার পিঠে মারবে ঝাঁটা।"

নাক কাটার পর কবিরাজের সুরটা একটু অনুনাসিক হ'য়েছিল, তিনি সেই সুরে ছোঁড়াগুলিকে গাল দিতে থাক্‌তেন। কিন্তু এত বড় মামলাবাজ লোক কোনরূপেই তাঁর এই দুর্গতিকারীদের সন্ধান করতে পার্‌লেন না। সন্দেহ করে পুলিসকে যার উপর খুসী লেলিয়ে দেন, পুলিস কোন প্রমাণ না পেয়ে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তখন "আমার বোধ হচ্ছে, সেই গাড়ীতে ঐ লোকটাই বাবু সেজে বসেছিল" নাকীসুরে এই বলে আর কোন লোকের নাম করেন। পুলিস এই ভাবে হায়রান হয়ে গেল। একদিন আবার "বোধ হচ্ছে" বলাতে ইনেস্পেকটর উপেন ঘোষ রেগে উঠে বল্লে "বোঁধ হঁচ্ছে টঁচ্ছে' বল্লে আমরা আর ধর্‌ব না, প্রমাণ চাই, কব্‌রেজ ম'শয়।"

যে দিন কবিরাজ সেই উৎকট অবস্থায় বাড়ী ফিরেছিলেন, সেই দিন কায়স্থ পরিবারের ডাক্তার-বাবু মিস্ত্রী লাগিয়ে পিল্লে হঠাইয়া দিতে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁকে বাধা দেওয়ার কেউ তখন ছিল না। কবিরাজ আর দুটি বছর মাত্র জীবিত ছিলেন।

---

(৩৮)

এর মধ্যে একদিন রমেশ দেখ্‌লে, তাদের বাড়ীর কুৎখানায় একটা লোককে ধরে পাইক তিনজন খুব প্রহার দিচ্ছে। লোকটা খাজনা দিতে পারে নাই, তাকে চিৎকরে শুইয়ে একটা পাইক বুকের উপর বসেছে, আর একজনে তার আঙ্গুলে ছুঁচ ফুটোচ্ছে, অনাহারের দরুণ তার উদরটা খোলের মত প'ড়ে আছে। সে কথা বল্‌তে পাচ্ছে না, গোঁ গোঁ কচ্ছে, তার চোখের নীচটায় মারের দাগ নীল হয়ে আছে, একটা নেংটি পরে আছে। রমেশ দেখ্‌লে লোকটা মারা যাবে।

তার মাথাটা ঘুরে গেল, সে ছুটে যেয়ে তার বাবার পায়ে পড়ে চীৎকার করে বল্লে, "বাবা রক্ষা কর, রক্ষা কর" আর কিছু বল্‌তে পার্‌লে না, তার কচি হাত দুখানি হৃদয়েশের পায়ের উপর রেখে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল। "কি হয়েছে, হয়েছে কি" বলে হৃদয়েশ ও উপস্থিত ব্যক্তিরা ব্যগ্র হ'য়ে জিজ্ঞাসা করাতে তারা জান্‌তে পার্‌লেন, কুৎখানার সদরালি প্রজাকে পাইকেরা মার্‌ছে, রমেশ তাই দেখে এসেছে। হৃদয়েশ তখনই পাইকগুলিকে তাকে ছেড়ে দিতে আদেশ দিয়ে ছেলের শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করলেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে চৈতন্য হ'ল না দেখে সিন্দুর-তলার রামহরি ডাক্তারকে ডাক্‌তে পাঠালেন, এবং চূঁচড়ার ফ্রান্সিস সাহেব সিবিল সার্জ্জনকে তার কল্লেন। রামহরি ডাক্তার এম, ডি, তিনি পরীক্ষা করে বল্লেন "খুব জ্বর হ'য়েছে, জ্ঞান হয়নি, brain fever হ'য়েছে বলে মনে হয়, কোথাও কি ভয় পেয়েছিল? যা হ'ক, ডাক্তার সাহেব আসুন, তাঁর সঙ্গে একত্র হ'য়ে চিকিৎসা কর্‌ব।" মাথায় Ice bag লাগিয়ে ফিডিং কাপ্‌ দিয়ে মাঝে মাঝে হরলিক খাওয়ার ব্যবস্থা করে তিনি চলে গেলেন।

রমেশ বাড়ীর ভেতর শুয়ে আছে, পাশে মা সুমতি দেবী বসে আঁচলে চোখ মুছেন! পা টিপে আস্তে হৃদয়েশ এসে রোগীর পার্শ্বে বস্‌লেন। সুমতি দেবী বল্লেন "এই ছেলের আশা ছেড়ে দাও, বিকারে যা বল্‌ছে, তাতে আর আমার আশা নেই।"

ভয়ে ভয়ে হৃদয়েশ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বল্‌ছে?" সুমতি দেবী আস্তে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন, বল্‌ছে "মা দাদার কাপড় কেন এত ময়লা, তালি দেওয়া? জ্বরে পড়ে দাদার মুখ শুকিয়ে গেছে। দাদা বল্‌ছে 'আমার গলা জ্বলে গেল, তুই আর, ও বাড়ীতে থাকিস্ না, ও বাড়ী থেকে এরা আমার দূর করে দেছে।"

এ শুনে হৃদয়েশের বুকটা দুর দুর করে কেঁপে উঠ্‌ল। রমেশ চোখ বুজে পড়ে আছে। খানিক পরে চোখ খুল্ল। চোখ দুটি যেন জবাফুল, টক্ টকে লাল, সে চীৎকার করে যেন ভয়ে কাঁপতে লাগল এবং বল্লে "আর মের না, দুটি পায়ে পড়ি। ওই যে কবিরাজ এসেছে, বাবা ওকে আস্‌তে দিওনা, বড্ড ভয় হচ্ছে।"

ডাক্তার সাহেব এলেন, জীবনের আশা নাই। রামহরি ডাক্তারও তাই বল্লেন। কলিকাতা হতে ষ্টিফেন সাহেবকে আনা হ'ল। বহু চেষ্টা হ'ল, গায়ে ১৫।২০টা জায়গা ফুঁড়ে ইঞ্জেক্‌সন করা হ'ল। বুধবার জ্বর হয়েঝিল, শনিবার দিন প্রভাতে যে পথ দিয়ে শ্যামলেশ এ বাড়ী ছেড়ে চলে গেছ্‌ল, সেই পথ দিয়ে রমেশ চিরদিনের জন্য বাহির হ'য়ে গেল। ভট্টাচার্য্যিদের প্রকাণ্ড বাড়ীর, বলাকা-শুভ্র শ্বেত কান্তি যেন কালীময় হ'য়ে গেল।

রমেশকে যখন শশ্মানে নিয়ে যায়, তখন হৃদয়েশ মাথায় দুটি হাত দিয়ে তাঁর ঘরের বারাণ্ডায় বসেছিলেন। নিতাই চাকরটা তাঁর ঘর ঝাড় দেওয়ার জন্য এসে দাঁড়াল, কিন্তু কর্ত্তাবাবু না সরলে ত

আর ভেতরে যেতে পারে না, এজন্য জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হৃদয়েশ মুখ উঁচু করে তাকে দেখে বল্লেন—"তুই বেটা রমেশকে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিস্?" এই বলে সেখানে একটা কাঁসার বাটী পড়ে ছিল, তাই ছুঁড়ে মার্‌লেন। দৈবাৎ সেটা তার চোখে লাগে নি, কিন্তু বাটীটা সন্ সন্ ক'রে চোখের কাছ দিয়ে গিয়ে নীচেকার মার্বেলের মেজোতে ঝনাৎ ক'রে প'ড়ে দু টুকরা হ'য়ে গেল।

চীৎকার শুনে অনেকে সেখানে ছুটে এল, তখন হৃদয়েশ একবারে ক্ষেপে গেছেন। কারুকে মার্‌তে যান, কারু কাছে কেঁদে মিনতি জানান, একটা ছোঁড়া চাকরের গলা টিপে ধরেছিলেন—মাঝে মাঝে শ্যামলেশ ও রমেশ সম্বন্ধে নানারূপ অসংলগ্ন কথা বলেন। ডাক্তারেরা এসে নানারূপ ঔষধ ক'রে কিছুই কর্‌তে পার্‌লেন না। তবে গৌড়-বিদ্যার নমঃশূদ্র কবিরাজ এসে যে সকল ঔষধ দিলে—তাতে যেন কয়েকটা দিন রোগী একটু উপশম বোধ কল্লেন—তদবস্থায় একদিন তিনি সুমতিদেবীর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "রমেশ আমায় ভাল কর্‌বার মুখে এনে ছেড়ে গেলে!"—আর একদিন বলেছিলেন, "কানাই বাবাজিকে আমি চিনি নাই। তিনি আমাকে গাল দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন, কিন্তু দেবেশকে বাগান বিক্রয় কর্‌তে উপদেশ দিলেন।" এর পরেই আবার অসংলগ্ন নানা কথা।

তেবোলের কালীর বালা, ইউ রায়ের স্পেসিফিক্ দ্বারা একটু একটু উপকার হ'য়েছিল, কিন্তু শেষে চেষ্টা বিফল হ'ল, তবে রোগীর সেই দুর্দ্দান্ত ভাবটা গিয়ে শেষে এই দাঁড়াল, যে তিনি আর কথা বল্‌তেন না। রমেশের বিশ্রাম প্রকোষ্ঠটায় তার একখানি মূল্যবান জরিপেড়ে ঢাকাই ধুতি ছিল, তিনি সারাদিন সেই ধুতিখানি কোলে ক'রে ব'সে থাক্‌তেন, কখনও কখনও সাবান দিয়ে ধুতিখানি খুব যত্নের সহিত কেচে ঘরের

দেওয়ালে শুকোতে দিতেন, এবং যতক্ষণ না শুকোত, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা শুকোল কি না পরীক্ষা করতেন। ঐ ধুতিখানিই তাঁর সর্ব্বস্ব হ'য়ে দাঁড়াল,—কোর্ট অব্ ওয়ার্ড্সের হাতে তাঁর জমিদারী চলে গেল,—কিন্তু রমেশের ধুতি নিয়ে তিনি ব্যস্ত—তাঁর অন্য দিকে লাভ-লোকসানের কোন খেয়াল ছিল না।

কিশোর রায়ের পিতা রাজীব রায় সরকার হ'তে 'রাজা' উপাধিও পেয়েছিলেন। রাজা রাজীব-রায়ের যখন সাত বছর বয়স, তখন পিতৃহারা হন। সেই সময়ে যিনি দেওয়ান ছিলেন, তিনি রাজীব রায়ের লেখাপড়ার নামমাত্র ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, রাজীব যদি মূর্খ হ'য়ে থাকেন, তবে প্রকাণ্ড জমিদারীটা তিনি চিরকালই শাসন ও ভোগ করতে পারবেন। রাজীব যখন যৌবনে পদার্পণ করেন, তখন তাঁর ভোগ-বিলাসের নানারূপ ব্যবস্থা করে দিয়ে দেওয়ানজি বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। সেই সকল যৌবনের প্রলোভনের মধ্যে পড়ে রাজীব তার ষ্টেট্ সম্বন্ধে চিরকালই অজ্ঞ রয়ে যাবেন—এ সম্বন্ধে দেওয়ানজির সংশয়-মাত্র ছিল না।

কিন্তু একজনের মাথা খেতে গেলেই যে অবিরোধে সেটি সর্ব্বদা সম্ভবপর হয় তা' নয়। ভগবান তাঁর জীবগুলির উপর মাঝে মাঝে মুখ তুলে চান। এবং দুষ্ট লোকেও পরের রুটি প্রায় ঠোঁটের কাছে আন্‌তে পার্‌লেও তা' আবার সময় সময় পড়ে যেতেও দেখা যায়।

কুড়ি বাইশ বছর নানারূপ ভোগ-বিলাসে কাটিয়ে সহসা রাজীব রায়ের সুবুদ্ধি হ'ল। ষ্টেটের একজন কর্ম্মচারী তাঁকে দেওয়ানজীর প্রজা-নিপীড়ন, অর্থ-শোষণ ও তাঁর লেখাপড়ার অন্তরায় হওয়া সংক্রান্ত সকল বিষয় ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন।

যিনি মদে ভাঙ্গে চোখ লাল ক'রে বসে থাক্‌তেন, হঠাৎ তিনি নেশা ছেড়ে দিলেন। নিজে চেষ্টা ক'রে বাঙ্গলাটি বেশ ভাল ক'রে

শিখ্‌লেন এবং কয়েকজন কর্ম্মচারীর দ্বারা গোপনে ষ্টেট্‌ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হ'লেন। তারপর হঠাৎ একদিন দেওয়ানজিকে কার্য্য হ'তে জবাব দিয়ে শাসনভার নিজে গ্রহণ কর্‌লেন। তিনি প্রখর বুদ্ধি-সম্পন্ন ছিলেন, সুতরাং জমিদারী কার্য্য অতি বিচক্ষণতার সহিত সম্পাদন কর্‌তে লাগ্‌লেন। শিক্ষার উন্নতি কল্পে তিনি অনেক টাকা সরকারে দিয়েছিলেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। এই সময় তাঁর পত্নী কমলাদেবী একটি মাত্র পুত্র রেখে স্বর্গারোহণ করেন। রাজীব রায় আর বিবাহ করেন নাই।

রাজার মনে একটি দুঃখ ছিল, তিনি ইংরেজী শিখ্‌বার সুযোগ পান নাই। এজন্য ছেলের লেখাপড়া সম্বন্ধে তিনি বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন। কিশোর রায় অল্প বয়সে প্রেসিডেন্সী কলেজ হ'তে এম, এ পরীক্ষায় প্রথম হ'য়ে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। এই সময় নওয়াপাড়া গ্রামের প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিত ভরত তর্করত্নের কন্যা জ্ঞান-দায়িনী দেবীর সঙ্গে রাজা বাহাদুর পুত্রের বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করেন।

জ্ঞানদায়িনী দেবীর দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়। রাজাবাহাদুর তাঁকে নানারূপ সঙ্গীত বিদ্যা—বিশেষ কীর্ত্তন গান শিক্ষা দেন। ইংরেজী বাঙ্গলা ও সংস্কৃতেও তাঁর সাধারণ মত শিক্ষা লাভ হ'য়েছিল। জ্ঞানদায়িনী অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন। তিনি যখন বীণা বাজাতেন তখন তাঁকে বীণাপাণির মত দেখাত; তিনি যখন ঝাঁপিটি হাতে ক'রে এ ঘর হ'তে ও ঘরে যেতেন, তখন ঠিক লক্ষ্মী ঠাকুরুণের শ্রী তাঁর গায়ে খেলত; যখন রাজাবাহাদুরকে সোনার রেকাবে জল-খাবার এনে দিতেন—তখন মনে হ'ত যেন সাক্ষাৎ ভগবতী।

কিশোর রায় পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত—তিনি তখনও তাঁর স্ত্রীর কোন খোঁজ খবর নেন্‌ নি। যে বছর এম, এ পরীক্ষায় স্বর্ণ পদক লাভ

কর্‌লেন, সেই বছরই তাঁর পিতৃবিয়োগ হ'ল। কিশোর রায়ের স্বাস্থ্য খুব ভাল ছিল না, তিনি স্ত্রীকে নিয়ে হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য ওয়াল-টার, ডিহিরি অন সোন, মধুপুর এবং রাঁচী প্রভৃতি স্থানে ঘুর্‌তে লাগ্‌লেন।

পিতৃবিয়োগে কিশোর রায় প্রায় ছয় মাস কাল অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ছিলেন। এই দুঃখের সময়ে হঠাৎ জ্ঞানদা তাঁর মনে একা অপূর্ব্ব আনন্দ নিয়ে এল।

নির্জ্জন প্রবাসে সারাদিনই স্বামী স্ত্রী একত্র থাক্‌তেন। কিশোর পত্নীর কুঞ্চিত কালো চুলগুলি নিয়ে নাড়া চাড়া কর্‌তেন, সেগুলি দীর্ঘ ও সুগন্ধ; তাঁর মনে হ'ত এমন হাল্‌কা, এমন কোমল চুলের সম্পদ্‌ তিনি কখনও দেখেন নি। জ্ঞানদা যখন ভুরু টেনে কৌতুক ক'রে কথা কইত, তখন মনে হত এমন সুন্দর ভুরুর ভঙ্গী তিনি কোথাও দেখেন নি। কিশোরের কাছে প্রথম প্রথম জ্ঞানদায়িনী গান কর্‌তে লজ্জা বোধ কর্‌তেন। স্বামীর বহু বিনয়ে শেষে তিনি অনেকটা লজ্জা সংবরণ করে গাইতেন। ঠিক ফুলের কুঁড়িটি যেমন করে ফোটে, তেমনই ক'রে তার মিষ্ট স্বর আস্তে আস্তে ফুট্‌তো। তাঁর মুখের প্রথম গান যেটি কিশোর রায় শুন্‌লেন, সেটি রবিবাবুর সেই পরিচিত—

"তোমারি রাগিণী জীবন কুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো
তোমারি আসন হৃদয়-পদ্মে রাজে যেন সদা রাজে গো
তব নন্দন-গন্ধ মোদিত হেরি সুন্দর ভুবনে
তব চরণ-রেণু মাগি লয়ে এ তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো।"

কি সুন্দর সুর! কিশোর ছবির মত চুপটি হয়ে শুন্‌লেন, পিয়ানোর

সুরের সঙ্গে তাঁর সুর যেন মিশে গেল। গানটি শেষ হ'লেও তাঁর ঝঙ্কার মনের বীণার তারে অনেকক্ষণ ধরে বাজ্‌তে লাগ্‌ল। কিশোর সেই দিন জ্ঞানদাকে একটি কীর্ত্তন গাইতে অনুরোধ কর্‌লেন—জ্ঞানদা একটা হাসির চাউনিতে স্বামীকে মুগ্ধ ক'রে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে গাইলেন—"মন্দ মুরলী রব কোন সুরেন্দ্র হ'রে নিল।" "মন্দ মুরলী রব" কথাটি যে তাঁর মুখ হ'তে কি মিষ্ট শুনালে—তা' আর কি বল্‌ব! কিশোরের দিকে দুটি ডাগর চোখ যেন সজল ক'রে গায়িকা গাইলেন—"বাঁশী কোথা বাজে আর কেবা শোনে—আমার নামে সাধা বাঁশী" সেই সজল দুটি কৃষ্ণ চোখের চাউনিই মিষ্ট, না কণ্ঠস্বর মিষ্ট? কান দিয়ে শুন্‌বেন—কি চোখ দিয়ে দেখ্‌বেন, কিশোর যেন গোলকধাঁধায় পড়ে যেতেন।

বাঁশী এখন বৃন্দাবনে বাজে না—সেই মিষ্ট সুর এখন কোন্ অজানা রাজ্যে বাজ্‌ছে। যে শোনে সে কি আমার মত প্রাণ দিয়ে তা শুন্‌ছে, সেই সুর শুনে সে কি কুল শীল ছেড়েছে?

গানের ইঙ্গিতে এই অর্থ অতি স্পষ্ট করে জ্ঞানদা গাইলেন ;—

নন্দকুল চন্দ্রমা কোন্ গগনে উদয় হ'ল।
মন্দ মুরলী রব কোন্ সুরেন্দ্র হ'রে নিল।
বাঁশী কোথা বাজে, আর কেবা শোনে।"

সমস্ত গানটি গাওয়ার সময় জ্ঞানদায়িনী কতবার স্বামীর প্রতি লজ্জানত চাউনি দিলেন, কতবার তাঁর ওষ্ঠে চাপা হাসি ফুটে উঠ্‌ল। সেই গান ও ভাবুকতায় কিশোরের মন একবারে ভুলে গেল। তার পর গান সমাপ্তি ক'রে যখন তিনি স্বামীর কণ্ঠ-লগ্ন হ'য়ে তাঁর দিকে

চেয়ে হাস্‌তে লাগ্‌লেন, তখন কিশোরের মনে হ'ল "আমার এম, এ পাশের স্বর্ণ পদক কি এর কাছে লাগে?" এই ভাবে দিন রাত গান ও কথা চল্‌ত। বস্তুতঃ তাঁর মুখের কথা ও গান শুনবার পূর্ব্বে তিনি জান্‌তেন না বাঙ্গালা ভাষা কত কোমল ও মিষ্ট।

---

(৪০)

এই সুখ কিশোর রায়কে বেশী দিন ভোগ করতে হ'ল না,—পত্নীর সঙ্গ তাঁর কাছে এতই অমূল্য বোধ হ'ত, যে কোন্ দিন তাঁ খুইয়ে ফেলেন, সর্ব্বদা এই আশঙ্কা তাঁর মনে হ'ত। তখনও তার শরীর অসুস্থ ছিল। প্রথম মিলনের উত্তেজনায় শরীরটা যে ক্রমে আরও খারাপের দিকে চল্‌ছে, তা তাঁর জ্ঞানই ছিল না। কাশি ত লেগেই ছিল, তার সঙ্গে সন্ধ্যার পর একটু একটু জ্বর হতে সুরু করে দিল।

জ্বরটা যখন ক্রমে বেড়ে চল্ল, তখন পত্নী সহ কিশোর রায় সিন্দুর-তলায় ফিরে এলেন। কলিকাতার বড় বড় সাহেব ডাক্তার ও কবি-রাজ এসে একবাক্যে বল্লেন—যক্ষ্মা হয়েছে, তবে খুব খারাপ রকমের নয়, এখনও সার্‌বার আশা আছে। তাঁরা উপদেশ দিলেন, অন্ততঃ দু বছরের জন্য পত্নীকে বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার! তাঁরা বল্লেন "এ বাড়ীতে রেখে ইনি যদি বিদেশে যান, সেটিও ঠিক হবে না, মাঝে মাঝে দেশে আস্‌তে হবে! একবারে ছাড়াছাড়ি থাকা দরকার।" কিশোর রায়ের দিদিমা ছিলেন, তিনি বল্লেন "শীগ্‌-গির একটা ভাল দিন দেখে বউমাকে নওয়াপাড়ায় পাঠাতেই হবে। এর বাপ ভরত তর্করত্ন আজ তিন বছর মারা গেছেন—সে বাড়ীতে কতকগুলি বিধবা আছেন, তা যা' হোক, এখান থেকে লোকজন পাঠিয়ে সেখানে যাতে আমাদের সম্মান রেখে থাক্‌তে পারেন, তার ব্যবস্থা কর্‌তেই হ'বে।" দেওয়ান শ্যামসুন্দর ঘোষ তদ্রূপ ব্যবস্থা কর্‌তে আদিষ্ট হলেন।

এই সংবাদ কিশোর রায়ের কানের কাছে তীরের মত চলে গেল এবং প্রাণটাকে যেন এ পার ও পার বিঁধে ফেল্লে।

বিদায়ের সময় জ্ঞানদার তুটি সজল চোখের যে চাউনি দিয়ে গিয়েছিল তা' স্মৃতির সম্বল ক'রে, তাঁর বাড়ী ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর রায় ঔষধপত্র নিয়ে কাশীতে রওনা হ'য়ে গেলেন।

রোজ দশাশ্বমেধ ঘাটের কাছে সন্ধ্যা বেলা এসে বসতেন। সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে বণিক যেমন ক্ষিপ্তের মত ঘুরে বেড়ায় তাঁর দশা তেমনই হ'ল। জ্ঞানদার চিঠি পাওয়াই এখন তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হ'য়ে দাঁড়াল। সারাদিন তার কাছে চিঠি লিখতে কেটে যায়!

প্রথম প্রথম জ্ঞানদার উত্তরগুলিও স্বামীর চিঠির মত দীর্ঘ হ'ত, কিন্তু শেষে আট পাতার উত্তরে তিনি আট ছত্র পেয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বিছানায় শুয়ে পড়্তেন। তারপর জ্ঞানদা তুখানি চিঠি পেয়ে অতি সংক্ষেপে একখানি চিঠিতে উত্তর দিতেন; একখানি চিঠিতে লিখ্লেন "তোমার শরীর খারাপ, এরূপ লম্বা চিঠি লিখ্লে পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়্বে।"

কিশোর রায় ভাব্লেন, "তোমার অদর্শনের তুঃখ চিঠি লিখ্লে কমে যায়—সেইটুকু যেন মিলনের আনন্দে কেটে যায়, চিঠিতে সেগুলি না লিখ্লে যে তা আমার মনকে অভিভূত ক'রে ফেলে।" জ্ঞানদার ঔদাসীন্য কিশোর রায়ের পীড়া বাড়িয়ে ফেল্লে, এখন তাঁর জ্বর রোজই হয়। বিকালের দিকে জ্বর খুব বাড়ে এবং শেষ রাত্রে যে ঘাম হয়, তা'তে মনে হয় যেন শরীরের রক্ত হিম হ'য়ে যাচ্ছে। ডাক্তারেরা বল্লেন "এঁর এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া কঠিন।"

এই সময় কাশীতে এক সাধু তিল-ভাণ্ডেশ্বরের গলি ছাড়িয়ে খোলা মাঠে একটি অন্নসত্র খুল্লেন—বহু গরীব তুঃখী সেখানে খাবার পেতে লাগ্ল।

শুধু গরীবকে খাইয়ে সাধু ক্ষান্ত রইলেন না, তিনি অকাতরে অভাব-গ্রস্ত লোকদের অর্থ সাহায্য ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। একদিন দুপুর বেলা কিশোর রায় বিজ্বর হ'য়েছেন। তিনি সাধুর কথা এত শুনেছেন যে সেদিন তাঁকে দেখ্‌তে নিজে চলে গেলেন—গিয়ে দেখ্‌লেন শ্যামবর্ণ প্রৌঢ় বয়স্ক সাধু অতি দীন ভাবে বসেছেন, মোটা ময়লা একখানি ধুতি পরা—নিজের কোন আস্‌বাব্‌ নাই, একটা সতরঞ্চির উপর ব'সে আছেন, তার তলা হাত্‌ড়িয়ে যা' পাচ্ছেন, তা' বিলিয়ে দিচ্ছেন। কারু ভাগ্যে একখানি গিনি জুটছে, কেউ একটা আধুলি পাচ্ছে।

কিশোর রায় সেই দান-প্রার্থীদের সঙ্গে এক কোণে বস্‌লেন। সাধু তাঁর দিকে চেয়ে বল্লেন—"আপনার পীড়াটা বড্‌ড খারাপ হ'য়েছে দেখ্‌ছি।" কিশোর রায়ের চেহারা দেখে, এটি যে সে আবিষ্কার ক'র্‌তে পার্‌ত, সুতরাং সাধুর এ কথা শুনে কিশোর আশ্চর্য্য হ'লেন না। অনেকক্ষণ তাঁর অজস্র দান দেখে বিস্মিত হ'য়ে কিশোর রায় সাধুকে বল্লেন, "বাবা আপনি খুব মস্ত সাধু, কোন সাধুকে এ ভাবে টাকা বিলুতে আমি দেখি নাই।"

সাধু বল্লেন, "পীঁপড়ার জন্য কণা পরিমিত এবং হাতীর জন্য মণ-পরিমিত খাদ্য তাঁর ভাণ্ডারে আছে, এই দানে গৌরব কর্‌বার আমার কিছুই নেই; বিশেষ এ টাকা আমার নয়, আমি ফকির।"

"এ কার টাকা?"

"এ মঠের টাকা, এই টাকা দীন দুঃখীদের বিলোবার জন্য আমি মঠ হ'তে নিযুক্ত হ'য়েছি।"

এর মধ্যে এক বৈষ্ণব এল, তাঁর ধব্‌ধবে সাদা ধুতি কোঁচান, সাদা ধব্‌ধবে উত্তরীয়টি কোঁচান, কাঁধে ঝুল্‌ছে—রংটা সাদা ধব্‌ধবে। সাদা ধব্‌ধবে চন্দনের তিলক অতি সন্তর্পণে অতি যত্নে, নাকে ও কপালে আঁকা

হ’য়েছে। কেশ সজ্জাও অতিশয় যত্নের পরিচয় দিচ্ছে, সেগুলি ভেজা অবস্থায় হাতে টিপে ঢেউয়ের কায়দা ক’রে সিঁথির দুই ধারে বিন্যাস করা হ’য়েছে। বেশ তেল চক্‌চকে একটি টিকিতে অতি সূক্ষ্ম ভাবের একটা গেরো আছে, তার সঙ্গে একটি কচি তুলসী পাতা জড়ানো।

বৈষ্ণব চূড়ামণি বল্লেন, “বাবা আমার প্রতি কৃপা কি হবে না ?”

সাধু বল্লেন, “আর কি চান ?”

“যা চাই, তা’তো বুঝ্‌তেই পারেন ?”

“আপনাকে আর আমার কিছু দেবার নাই, আপনি কি পেয়েছেন বলুন দেখি ?”

“কাল প্রসাদী লুচি মাল্‌পো, আমার আখড়ার ১২ জন শিষ্যের মত পেয়েছিলেম, আর আমি দু’ টাকা ও শিষ্যেরা এক এক টাকা পেয়েছিল।”

“এর উপরে আর কি আশা ক’র্‌তে পারেন ?”

“ঐ গরীব কাণাটা একটা মোহর নিয়ে গেল, আর আমার উপর এই বিচার হ’ল ?”

“বিচার ভালই হ’য়েছে—আপনি আর কিছু পাবেন না, যান।”

তথাপি বৈষ্ণব উঠ্‌বেন না, তাঁর সেখানে আরও কিছু প্রত্যাশা আছে, এই ভাবটি জানিয়ে বল্লেন—‘হরি হরি’।

সেইখানে সাদা উড়ুনী ও কাপড়ের একটা স্তূপ ছিল, সাধু বিরক্তির সহিত তা’ থেকে তাকে একখানি কাপড় ও একখানি উড়ুনী দিয়ে বল্লেন, “এর উপর আর কিছু হ’বেনা।” তাঁর দৃঢ় স্বরে বৈষ্ণব বুঝ্‌তে পারলে—আর বেশী আশা করা বৃথা—তখন আস্তে আস্তে উঠে চলে গেলেন।

সন্ধ্যা হ’য়ে এল, কিশোর রায়ের জ্বর এল। সাধু তাঁকে উঠিয়ে

একটা ঘরে নিয়ে বল্লেন, "হরিদ্বার থেকে মানস সরোবরে যাবার সময় আমাকে একজন সন্ন্যাসী যক্ষ্মা রোগের একটা ওষুধ শিখিয়ে ছিলেন, তা' যা'কে দিয়েছি, সেই আরাম হ'য়েছে—আপনি চান কি ?"

"আমার এখন জীবন মরণ তুল্য মনে হ'চ্ছে, তবে দিন্, একবার ঔষধ খেয়ে যদি ছু'টি দিনের জন্যও"—কিশোর এই ব'লে কেঁদে ফেল্লেন।

"বুঝেছি বাড়ী গিয়ে আপনার যাঁরা—তাঁদের দেখ্‌বেন। তা' চোখের জল ফেল্‌বেন না—আমি ঔষধ দিচ্ছি, আপনি ভাল হ'য়ে যাবেন, আপনি কি অর্থাভাবগ্রস্ত ? ব'ল্‌তে লজ্জা বোধ ক'র্‌বেন না, মঠের টাকা দরিদ্রের জন্য।"

কিশোর রায় হেসে বল্লেন,—"অর্থের দরকার নেই, ঔষধটি দিন।" সাধু একটা থলে থেকে একটা শেকড় বা'র ক'রে বল্লেন, "এইটি তিন ভাগ ক'রে কেটে নিয়ে এক এক ভাগ প্রাতে শিশিরের জলে মেড়ে খাবেন। তিন দিন খেলে আরাম হ'য়ে যাবেন।"

ঔষধ নিয়ে কিশোর রায় উঠ্‌লেন, এবং সাধু দেখ্‌লেন, সাচ্চা জরোয়া পোষাক পরা, খাঁটি রূপার লাঠি হাতে ৪জন সেপাই এই রুগ্ন ব্যক্তিটিকে ধরে একটা বড় মটর গাড়ীতে তুলে নিল। গাড়ীখানা একটু দূরে অপেক্ষা কচ্ছিল। নিজে ময়লা কাপড় প'রে উস্কু খুস্কু মুখে দীন ভাবে সাধুর কাছে এসেছিলেন—সুতরাং সাধু এঁকে দরিদ্র বলে মনে করেছিলেন।

কিশোর রায় সাধুর ঔষধ খাবেন কি না—এটি নিয়ে খানিকটা চিন্তা ক'রলেন। একবার ভাব্‌লেন "ঔষধ মেডিকেল কলেজে রাসায়নিক বিশ্লেষণের জন্য পাঠিয়ে দি," আবার ভাব্‌লেন, "সুরুতেই যদি সাধুকে অবিশ্বাস কর্‌লুম, তবে তাঁর ঔষধ আনলুম কেন?" সেই রাত্রে বড় জ্বর হ'ল। পরদিন যখন ডাক পিয়ন নানা পত্র ও জমিদারী সংক্রান্ত দলিলপত্র, যা' তাঁর দস্তখতের জন্য সিন্দূরতলা হ'তে দেওয়ানজী পাঠিয়ে ছিলেন, সেইগুলি দিয়ে চলে যায়, তখন তিনি "আর কিছু আছে?" ব'লে হাঁ ক'রে প্রতীক্ষার ভাবে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু "আর কিছু নেই" ব'লে পিয়ন চলে গেল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভাব্‌লেন—"মরি মরব, তাতে কার কি হবে? বাবা ত' নেই।" এই ভেবে সেই ঔষধটি বার কল্লেন—এবং তা' তিন ভাগে বিভক্ত ক'রে নিকটবর্ত্তী ভৃত্যকে বল্লেন—"কাল সকালে ঐ ছোট বাটীটার অর্দ্ধেকটা শিশিরে ভরে রাখিস্।"

পরদিন প্রভাতে উঠে সেই শিশিরে বাটা শেকড়টুকু খেয়ে মনে ভাব্‌লেন, "যদি এটা বিষ হয়—তবে একঘণ্টার মধ্যেই টের পাব। কিন্তু এত বড় সাধু কেন আমায় বিষ দেবেন?"

একঘণ্টার মধ্যে শরীরটা বেশ হাল্কা হ'য়ে গেল, এবং সে দিন অপরাহ্নে জ্বর এল না।

তিন দিন ঔষধ খেয়ে কিশোর রায় বেশ সুস্থ হ'য়েছেন—সাধুর সঙ্গে তিনি গোপনে দেখা ক'রে পরিচয় দিলেন—এবং "আপনি আমার জীবন-দাতা" বলে তাঁর পায়ে লুঠিয়ে পড়ে বল্লেন—"আপনার মঠের জন্য কি কিছু অর্থ সাহায্য আমি ক'র্‌তে পারি?"

"অনেকগুলি টাকা নিয়ে কি ক'র্‌ব? মঠের আয় সাড়ে তিন লাখ টাকা। দরকার হ'লে তোমার কাছে চাইব। আমি বৃন্দাবনে ফিরে চল্লুম। তুমি এখন বাড়ী ফিরে যাও, দরকার হ'লে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।

বলা নিষ্প্রয়োজন এই সাধুই হচ্ছেন কানাই বাবা।

প্রায় দু'টি বছর পরে সিন্দুরতলায় ফিরে এসে কিশোর রায় জ্ঞানদায়িনীকে চিঠি লিখ্‌লেন—তাঁকে আন্‌তে পাঠাবেন কি না?

উত্তরে তিনি লিখ্‌লেন, তাঁর এক সম্পর্কে পিস্‌তুত ভাইয়ের বিয়ে মাঘ মাসের শেষে, সুতরাং এই দেড়মাস কাল তাঁকে পিত্রালয়ে থাকৃতে দিলে তিনি বড় সুখী হন।

পত্রখানি পড়ে কিশোর রায়ের চোখে জল এল। "এই দুই বছর সারারাত্রি কেঁদে কেঁদে যাকে দেখ্‌বার জন্য লালায়িত হ'য়ে আছি, যাকে দেখবার জন্য আমি পৃথিবীর আর সমস্ত সুখ ছেড়ে দিতে পারি, দূর সম্পর্কীয় পিস্‌তুত ভাইয়ের বিয়ের জন্য দু'মাস সে আমায় দেখা দেবে না, এই দুই মাস যে আমার কাছে দু'টি বছরের মত দীর্ঘ হ'বে।"

জ্ঞানদার চিঠিগুলি এখন প্রায়ই শুক্‌নো, যেন দায়ে পড়ে লেখা—কিশোর রায় কত আগ্রহে চিঠি লিখেন, আর তার উত্তরগুলি যেন বরফের রাজ্য হ'তে ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে। তথাপি কিশোর তাতে যতটা রস আরোপ করে অর্থ স্নেহ-সূচক ক'র্‌তে পারেন—তা' করেন।

দু'টি মাস কিশোর রায়ের বুকে দাগা দিয়ে চলে গেল, তারপর আন্‌বার প্রস্তাব ক'রে চিঠি লেখা হ'ল। এবার জ্ঞানদার মাতা লিখ্‌লেন, "জ্ঞানদার শরীরটা তত ভাল নয়, দুটো দিন আরও মায়ের কাছে রাখ্‌লে ক্ষতি কি?"

কিশোর রায়ের দিদিমা ভারি চ'টে গেলেন, তিনি বল্লেন—"এ বউয়ের কেমন ধারা! এই জন্যই বাপের বাড়ীতে বৌ বেশীদিনের জন্য পাঠান ঠিক নয়।" তিনি আর কোন কথা শুন্‌লেন না, একেবারে লোকজন পাঠিয়ে দিয়ে জ্ঞানদার মাতা প্রাণদা দেবীকে লিখ্‌লেন, "ছেলে এতদিন পরে বাড়ী এসেছে, সে মুখখানি বিষন্ন ক'রে থাকে—আমাদের তা' ভাল লাগ্‌ছে না—বউকে পাঠিয়ে দেবেন, তার অসুখ হ'লে এখানে ভাল চিকিৎসা করা যাবে।"

এই পত্রের বিষয় অবগত হ'য়ে কিশোর অত্যন্ত অপরাধীর মত সলজ্জ হ'য়ে স্ত্রীর আগমন প্রতীক্ষা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন।

———

যাঁকে দেখ্‌বার এত সাধ, যাঁর জন্য দিনে সোয়াস্তি নাই, রাতে চোখে ঘুম নাই—তিনি এসেছেন। কিশোরের আজ কত আনন্দ! কিশোর মনে ভাব্‌ছেন, যদি লোকে ঠাট্টা না ক'র্‌ত, তবে আজ বাড়ীতে নহবৎ তুলে দিতেন।

জ্ঞানদা এসেছেন,—যে জ্ঞানদার জন্য দু'টি বছর পাগলের মত পথের দিকে চেয়ে ছিলেন—সেই জ্ঞানদাকে পেয়েছেন, সারারাত কিশোর ঘুমোলেন না। ঘুমন্ত-প্রতিমাকে যতবার দেখেন ততবার চোখে আনন্দাশ্রু আসে। এ যেন পুরোহিত আরতির সময় দেববিগ্রহ দেখ্‌ছেন।

আনন্দের আবেশ ক'মে গেলে দেখা গেল জ্ঞানদার কাছ্‌ থেকে যেন তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ব্যবহার পান না। একদণ্ড জ্ঞানদা তাঁর কাছে বস্‌তে চান না। তাঁকে পেয়ে জ্ঞানদা যে কোনরূপ সুখী হ'য়েছেন, তা' আভাসে তিনি বুঝান না। জ্ঞানদা যে তাঁর নিতান্ত আপন, তাঁর প্রাণের প্রাণ—সে জ্ঞানদা যেন একবারে পর হ'য়ে গেছেন। কখনও কখনও দেখিতে পান, জ্ঞানদা গালে হাত দিয়ে বসে কি ভাব্‌ছেন। এ সময় কিশোর রায় ঘরে ঢুক্‌লে তিনি হঠাৎ বিরক্তির সহিত দাঁড়িয়ে ঘরের বাইরে চলে যান। কিশোরের মনে যেন শেলের মত কি কষ্ট বিঁধ্‌তে থাকে। তিনি যক্ষ্মা রোগ থেকে রক্ষা পেয়েছেন, কই জ্ঞানদা ত' সে বিষয়ে একটি কথাও বল্লে না! তিনি যখন খেতে বসেন, পরিচারিকা এসে তখন তাঁকে ব্যজন ক'রে—তিনি যখন নিজ প্রকোষ্ঠে পরিশ্রান্ত হ'য়ে এসে বিশ্রাম কর্‌তে যান, তখন জ্ঞানদা পরিচারিকা পাঠিয়ে দেয়—সে জিজ্ঞাসা ক'রে "রাজাবাবুর কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কি না?"

ওপারের আলো

কিশোর রায় যখন কলেজে পড়্‌তেন, তখন অনেক সহপাঠী বন্ধুদের সহিত তাঁদের স্ত্রীদের ব্যবহারের বিষয় জেনেছিলেন। একজনের নিকট শুনেছিলেন,—কলেজের ছুটি ফুরোবার সময় হ'লে স্ত্রী বিমর্ষ হ'য়ে থাক্‌তেন; দু একটা দিন বেশী থাক্‌তে অনুরোধ ক'রে স্বামীর হাতে ধ'রে তা' নয়নাসারে সিক্ত করতেন, কত আদর ক'রে পান সেজে স্বামীর মুখে দিয়ে প্রসাদ প্রার্থী হ'য়ে কাছে ঘেঁসে আস্‌তেন; নিজ হাতে খাবার নিয়ে স্বামীর কাছে দাঁড়িয়ে থাক্‌তেন, অপরে নিয়ে এলে অসন্তুষ্ট হ'তেন। তাঁদের একজনের কপালের সিন্দূরের একটি রেখা একটা ছেলে মুছে ফেলেছিল, তাতে তিনি সারা দিনটা কেঁদে কাটিয়ে ছিলেন। স্বামী পড়্‌তে বস্‌লে তাঁর চেয়ারের উপর ঝুঁকে পড়ে আদরের সহিত দুই একটা কথা ব'লে "এখন তোমার পড়া নষ্ট করব না —এই দুটি ঘণ্টা বুক বেঁধে থাক্‌ব" বলে হেসে চলে যেতেন। কত বার মুখ ফিরিয়ে স্বামীকে দেখে মুচ্‌কে হাস্‌তে হাস্‌তে চলে যেতেন। "দোহাই তোমার—আমায় আমার নামটা ইংরেজীতে লিখ্‌তে শেখাও" এই বলার ছলে স্বামীর করকমল স্পর্শ ক'রে, সেই হাত খানিতে কলম দিয়ে, প্রিয় শিক্ষকটিকে ছাত্রীর প্রতি মনোযোগী হ'তে অনুরোধ করতেন; অনুরোধ রক্ষিত না হ'লে কত ভাবে বিরক্ত ক'রে হয়রাণ ক'রে ছাড়্‌তেন; কোন সময় লিখবার মুখে কলমটি নিয়ে ছুটে পালাতেন, কোন সময়ে প্রয়োজনীয় খাতার চারদিকে আঁচড় কাটতে থাক্‌তেন, কোন দিন ফুল ছুঁড়ে মুখে মার্‌তেন, কোন দিন নিজের সিন্দূর-কৌটা থেকে সিন্দুর নিয়ে স্বামীর পায়ে পরিয়ে সেই পায় কপাল ঠেকিয়ে কপালটি সিন্দুর-ময় ক'রে ছাড়্‌তেন; পড়ায় বাধা দিতেন না—কিন্তু যখন স্বামী বই খুলে ঘুমের ঘোরে চক্ষু বুজে ঢুল্‌তে থাক্‌তেন, তখন আস্তে বই খানি নিয়ে এসে বিছানায় ব'সে পরীক্ষার্থী ছাত্রের ন্যায় বড় বড় সুরে

উচ্চারণ ক'রে বই পড়ার অভিনয় করতে থাকতেন—স্বামী সেই স্বরে জেগে উঠে বই খুঁজতে গিয়ে স্ত্রীর কাছে হার মেনে ক্ষমা চাইতেন—তখন স্ত্রী তাঁকে, "আর আজ পড়তে দিব না" ব'লে কত কি আব্দার করতেন। এক বন্ধুর স্ত্রী তাঁর তিরাশী টাকা দামের ঢাকাই শাড়ীর ফুলদার আঁচল দিয়ে স্বামীর ১৷৷০ টাকার চটী মুছেছিলেন—স্বামী হেসে বলেছিলেন, "টাকাটা আমার উপার্জ্জিত কি না, তাই শাড়ী খানা ঘর নিকোবার নেকড়া হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।" স্ত্রী সজল চক্ষে চেয়ে বলেছিলেন, "ও শাড়ীর যতই মূল্য হউক, তোমার পায়ের চটী আমার কাছে অমূল্য, ওর যে কি দাম তা তুমি বুঝবে কি?"

সেই সহধ্যায়ী গণের কত কথা তিনি জানতেন, আজ তাঁর এক একটি কথা মনে হ'ল, আর তাঁর অলক্ষিত ভাবে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ল

জ্ঞানদায়িনীর পিতার মৃত্যুর পর সে বাড়ীতে অভিভাবক কেউ ছিল না। তাঁর মা প্রাণদা দেবীর বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল না। তিনি পাড়ার যত ছেলেকে ডেকে এনে জ্ঞানদা দেবীর পিয়ানো বাজানো হ'তে সুরু ক'রে কীর্ত্তন গান পর্য্যন্ত সকলই শুনিয়ে দিতেন। ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাকে তিনি এখনও সেই খুকিটি ব'লে মনে কর্‌তেন, এবং পাড়ার ছেলেরা, যাদের গোঁপ বেশ শিখি পুচ্ছের আকারে অগ্রভাগ কোঁকড়ান হ'য়ে গোল হ'য়ে উঠেছে, কিম্বা দাড়ী ফ্রেঞ্চ ধরণে সূক্ষ্মাগ্র হ'য়ে পাখীর ছোট কালো চঞ্চুটির মত দেখাচ্ছে—এ সকল যুবক তাঁর চক্ষে শিশু। এরা তো সেদিনও তাঁর উঠোনে হামাগুড়ি দিয়েছে। এদের সাম্‌নে তার খুকি গান গাবে, এতে কি লজ্জার বিষয় হ'তে পারে? সেই সকল যুবাপুরুষের মায়েরা উপস্থিত থাক্‌তেন—তাঁদের কাছে ছেলেরা 'খোকা'—সুতরাং তাঁরাও প্রাণদা দেবীর কথাগুলি অতি ঠিক ব'লে মনে কর্‌তেন! প্রথম প্রথম জ্ঞানদা দেবী একবারে বিগড়িয়ে গিয়াছিলেন—তাদের কাছে পিয়ানো বাজানো, গান গাওয়া ত' দূরের কথা, ছেলেবেলার পরিচয় থাকা সত্বেও তিনি তাদের সাম্‌নে বার হ'তেও দ্বিধা বোধ ক'র্‌তেন। যিনি প্রথম প্রথম নিজের স্বামীর কাছেই গাইতে চাইতেন না—তিনি সহজে অপরের কাছে তাঁর সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চা ক'র্‌তে কিছুতেই সম্মত হন নাই!

কিন্তু নদীর পাড়ের ভঙ্গুনির মত স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতা একবার ভাঙ্গলে কোথায় গিয়ে থাম্‌বে, তা কেউ ব'ল্‌তে পারে না। জ্ঞানদায়িনীর রূপ যুবকদলের লক্ষ্যের বিষয় হ'য়ে দাঁড়াল—জগতে রূপসীর অতি কঠোর

পরীক্ষা, কারণ বহুলোকের এটি অভিপ্সীত। জ্ঞানদায়িনী পরীক্ষায় নিজেকে রক্ষা ক'র্‌তে পারলেন না, স্ত্রীলোকের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হারিয়ে ফেল্লেন।

প্রথম প্রথম স্বামীর প্রতি একটা অনুরাগের ফলে—তিনি অনুতপ্ত হ'য়েছিলেন। কিন্তু ক্রমে তাঁর স্বামী তাঁর নিকট প্রিয় বস্তু না হ'য়ে ভয়ের সামগ্রী হ'য় দাঁড়ালেন। এই জন্য কিশোর রায় হ'তে তিনি দূরে দূরে থেকে সোয়াস্তি বোধ ক'র্‌তেন। কিশোর রায় তাঁর চরিত্রে কখনই সন্দেহ করেন নাই—তাঁকে যে স্ত্রী ভালবাসেন না এ সত্য এতটা জাজ্বল্যমান ছিল যে তিনি সেটি অবশ্যই বুঝে ছিলেন এবং তদ্দরুণ সর্ব্বদা অসহ্য কষ্ট অনুভব ক'র্‌তেন।

ইতিমধ্যে ভুলক্রমে তাঁর স্ত্রীর বালিসের নীচে রক্ষিত একখানি খোলা চিঠি পড়ে তাঁর হৃদয়ে ঝটিকা উপস্থিত হ'ল। চিঠিটার অক্ষর জলে কতকটা মুছে গেছে—তাতে মনে হয়, যিনি লিখেছেন কিম্বা পড়েছেন, তাঁর অজস্র অশ্রু ছত্রগুলির উপর বর্ষিত হ'য়েছে।

বনে যেমন আগুন লাগে, মনেও সেইরূপ আগুন লাগ্‌তে পারে। চিঠিখানি প'ড়ে কিশোর রায়ের প্রথম সত্যই বিশ্বাস হ'তে পারল না যে, জ্ঞানদায়িনী এমন হ'তে পারেন। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল তিনি চিঠিখানি ধ'রে বসে রইলেন, তার প্রতিটি অক্ষর তাঁর চক্ষে যেন ছুঁচ বিঁধুতে লাগ্‌ল।

তিনি পিতার মৃত্যুর পর নিজেকে নিঃসহায় ভাবে সহধর্ম্মিনীর হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন—জ্ঞানদা ভিন্ন তাঁর জগতে কে আছে? এমন নয়ন জুড়ান ধন হারিয়ে তিনি কি ক'রে সংসারে থাকবেন? তাঁর চক্ষু হ'তে অজস্র জল পড়তে লাগ্‌ল, তার পর চক্ষের জল শুকিয়ে গেলে মনে ভীষণ প্রদাহ সুরু হ'ল।

এই ভাবে অনেকক্ষণ বসেছিলেন, রাত্রি ৮টার পর জ্ঞানদা একবার স্বামীর ঘরে এসে তাঁর এই ধ্যানশীল মূর্ত্তি দেখে চমকে উঠ্‌লেন—পর মুহূর্ত্তেই তাঁর বিস্ময় দূর হ'ল, তিনি তাঁর স্বামীর হাতে সেই চিঠিখানি দেখ্‌তে পেলেন, তখন অস্ফুট চীৎকার ক'রে চিঠিখানি নিয়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন, এবং কাঁদতে কাদতে তাঁর স্বামীর পায়ের উপর প'ড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে অশ্রুজলে তার পা দুখানি অভিষিক্ত কর্‌লেন।

কিশোর রায় আস্তে অথচ দৃঢ় ভাবে তার হাত দুখানি সরিয়ে দিয়ে সেই ঘর হ'তে বার হয়ে গেলেন। জ্ঞানদায়িনী অসম্বৃত অবস্থায় মেজেতে লুটোপুটি ক'রে কাঁদতে লাগ্‌লেন।

রাত্রে রাজাবাবু নিজ শয়ন ঘরে গেলেন না। জ্ঞানদায়িনীও মেজো ছেড়ে শয্যায় শুইলেন না। লোকজনের নানা উপরোধ সত্ত্বেও তাঁরা দু জনেই অভুক্ত রইলেন। বাড়ীর সকলে এটাকে সাধারণ দাম্পত্য-কলহ ব'লে মনে কর্‌ল।

---

(৪৪)

পরদিন কিশোর রায় শয্যা হ'তে উঠে বাইরে এলেন। ভৃত্য গঙ্গারাম তাঁকে দেখে আঁৎকে উঠ্ল, একরাত্রে যেন নবীন যুবক বুড় হ'য়ে পড়েছেন। ঝড়ে পত্র-পল্লব-শাখাচ্যুত হ'লে শাল্মলী তরুটি যেমন দেখায়—এই মূর্ত্তি সেইরূপ।

তিনি সারা রাত্রি একটি মিনিটও ঘুমোন নি। জ্ঞানদায়িনীর উপর যতই রাগ বাড়্তে লাগ্ল, ততই ভেতরে ভেতরে একটা কোমলতা যেন জেগে উঠ্ল। তাকে ছাড়া যে একটি দিনও থাকৃতে পার্‌ব না, তাকে কঠোর শাসন কর্‌তে যে প্রাণে উৎসাহ পাই না, সে যে আমার একান্ত আপনার জন, এই ভাব্‌তে চোখে জল এল। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল আবার চক্ষু দিয়ে ঝর্‌ঝর্ ক'রে জল পড়্তে লাগ্ল। তিনি দ্বার রুদ্ধ ক'রে বসেছিলেন; কাগজপত্র দেখাতে ও তাঁর স্বাক্ষর নিতে তিনবার দেওয়ানজি ঘুরে গেলেন; তিনি দরজা খুল্লেন না, অশ্রুবিক্লব কণ্ঠে শেষবার বল্লেন—"দেওয়ানজি ম'শায়, আমার বড্ড অসুখ ক'রেছে আজ ছুটি দিন।"

"ডাক্তার ডাকৃতে পাঠাব।"

"এখন নয়, দরকার হ'লে ব'লে পাঠাব।"

এই উত্তর শুনে দেওয়ানজী ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

বহুক্ষণ চোখের জল পড়াতে মনের ভার একটু লঘু হ'ল। তিনি দেরাজ থেকে একখানি কাগজ টেনে এনে লিখ্তে সুরু ক'রে দিলেন, "জ্ঞানদাকে ছাড়্‌ব, না রাখ্‌ব?" এ সম্বন্ধে অনুকূল ও প্রতিকূল যত যুক্তি হ'তে পারে তা সেই কাগজের মধ্যে সোজাসুজি একটা রেখা

টেনে দুই দিকে এক দুই তিন করে লিখ্‌তে লাগ্‌লেন। যদি তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে সে আরও খারাপ হবে, শেষে কি কষ্ট পাবে—তার ঠিকানা নেই, হয়ত রাস্তা ঘাটে ভিক্ষা ক'রে প্রাণ যাবে। লোক লজ্জার চূড়ান্ত হ'বে, মা বাপের বাড়ী পর্য্যন্ত তার মানা হ'য়ে যাবে, হয় ত অপমৃত্যুতে মর্‌বে, না হয় গলায় দড়ি দেবে, কত কুলোকের চক্রে প'ড়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে কেঁদে কেঁদে চোখের জলে পথ দেখ্‌বে না—এই পথের 'পরিণাম যা' তা' হ'তে কেউ তো মুক্তি পায় নি। আমার প্রাণের প্রাণ জ্ঞানদা, আমার বুকের হাড় জ্ঞানদা, আমি শেয়াল কুকুরের মত বাড়ী হতে দূর করে এই পথে পাঠাব। তার কষ্টের কথা শুনে কি করে ধৈর্য্য ধ'রে থাকব?" এই পর্য্যন্ত লিখে আবার দরদর চোখের জল পড়ে তার লেখাগুলি মুছে যেতে লাগ্‌ল। তিনি হাত দিয়ে বুক চেপে ধ'রে ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে আবার লিখ্‌তে লাগ্‌লেন। "জ্ঞানদা যে পথে গিয়েছে সে পথ হ'তে তাকে ফেরান কঠিন। তার ইচ্ছা থাক্‌লেও সে পার্‌বে না। আর আমি তাকে সরল বিশ্বাসের চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌ব না। আমার সন্দেহ ছায়ার ন্যায় তার পাছে পাছে ফির্‌বে। প্রথম হয় ত অনুতপ্ত হ'য়ে সে কত দিন চুপ ক'রে থাক্‌বে, কিন্তু তার পরে সে কথার উত্তর দিতে শিখ্‌বে, হয় ত কোন জায়গায় আমার সন্দেহ সত্য হবে—কোন জায়গায় মিথ্যা সন্দেহ ক'রে বস্‌ব, তাতে ঝগড়া ঝাটি হ'বে। জ্ঞানদা আমায় ভালবাসে না—এখন তো তার হৃদয় পাবার আশা আমার পক্ষে আকাশ-কুসুম—এই দ্বন্দ্ব কলহে সংসারিক সুখ হ'বে না, ছেলে-পিলে হ'লে নানারূপ অশান্তি আস্‌বে। তারা ও পিতামাতার পরস্প-রের প্রতি ভাবান্তর দেখে কোন দিনই এ সংসারে সুখী হ'তে পার্‌বে না। এ কথা ঢাকা থাক্‌বে না। যদিও আমি প্রকাশ না

করি—কালে কলঙ্কের রটনা হবে। আমার পিতামাতার পদধূলি-পবিত্র এই পুণ্য নিকেতন লোকের চক্ষে ঘৃনার্হ হ'বে, এবং আমাকে লোকে হেয় জ্ঞান করবে। আর যদি আমি কলঙ্ক চাপা দিয়ে রাখি, তবে ও তো মনে মনে নিরন্তর আগুন জ্বলবে। তাতে এ সংসার ছারখার হ'য়ে যাবে। হায় জ্ঞানদা! পিতৃহীন হ'য়ে আমি তোমাকে পেয়ে শান্তি পেয়েছিলেম! তুমি আমার চোখের মণি, তোমায় ছাড়া একদণ্ড আমার এক যুগ—তোমাকে আমায় ছাড়্‌তে হবে। আত্মহত্যা করে এই কষ্টের অবসান কর্‌তে পারি—কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে আমায় মন কিছুতেই এগোয় না।" আবার চোখ দুটি দিয়ে জল পড়ে তার লেখাগুলি মুছে যেতে লাগ্‌ল। কিন্তু ভেতরে আর একটা লোভ মনে উদয় হচ্ছিল, চিঠিখানি ছিঁড়ে ফেলে যখন জ্ঞানদায়িনী কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তাঁর পায়ে লুটে পড়ল, তখন সেই করুণ কোমল অশ্রুসিক্ত মুখখানিতে সুন্দর ঠোঁট দুখানি কেমন কাঁপছিল, রজনীগন্ধ পুষ্পের ন্যায় কোমল দুটি ঠোঁট, যার মাধুরী এক মুহূর্ত্তের জন্য ও তাঁর কাছে পুরাতন হয় নি, সেই ঠোঁট দুখানি মনে পড়্‌তে কিশোর রায় একবারে ভুলে গেলেন, "তুমি আমায় যে আঘাতই কর না কেন আমি সইব, কথা না বলে সইব, যদি বড় কষ্ট হয়, তবে তোমার মুখখানি দেখে ভুলব, এমন মহৌষধ থাক্‌তে আমি কষ্ট পাচ্ছি কেন? লোকে যদি বলে আমি পুরুষ নই, স্ত্রীর এমন অপরাধ সত্ত্বেও আমি একে নিয়ে সংসার কচ্ছি, তবে সেই নিন্দা কি ঠিক! ছেলে যে কত কষ্ট দেয়, কত অপরাধ করে মা কি তাকে ছাড়্‌তে পারেন? স্বামী যে কতরূপ অবিশ্বাসী হয়ে স্ত্রীকে নানারূপ উৎপীড়ন করেন—সাধ্বী স্ত্রী কি সেই স্বামীকে ছেড়ে দেন? তবে স্ত্রী ছাড়ার মানে কি? এমন স্বামী থাক্‌তে পারেন যাঁর মন কেবল ভালবাসারই অধীন,

মায়ের প্রাণের মত—সাধ্বী স্ত্রীর প্রাণের মত—যার মন ন্যায় অন্যায়ের বিচার করতে চায় না, শুধু স্নেহের স্রোতে নিজকে সর্ব্বস্বান্ত করে ছেড়ে দিয়েছে, সে স্বামী তার স্ত্রীকে কি ক'রে ছাড়বে ?"

এই সকল লিখে কিশোর রায় পুনরায় চিন্তিত ভাবে বসে রইলেন, "আচ্ছা সকল শাস্ত্রই ত অপরাধী স্ত্রীকে ছাড়তে বলেছেন। কলঙ্কিত রমণী নিয়ে ঘর করতে ত কেউ বলেন নি—বোধ হয় আমি তার সকল অপরাধ স'য়ে ক্ষমা করতে পারব না—সে যদি এই পথ ত্যাগ না করে—তবে আমি চির-সহিষ্ণু হ'য়ে থাকতে পারব না। তখন ঘরে ছেলে পিলে হ'বে—এবং আমাদের ঝগড়া ঝাটিতে দিন রাত অশান্তির উৎপত্তি হ'য়ে এই সংসার অতি হেয় সংসারের দৃষ্টান্তস্থলীয় হয়ে থাকবে। যারা এই ঘরে নূতন আসবে—তাদের গার্হস্থ্য জীবনের আদর্শ খাটো করবার আমার কি অধিকার আছে ?"

অনেকগুলি কাগজ তিনি লিখে গেলেন—একটা যন্ত্রের ন্যায় দ্রুতবেগে ডান হাত কাগজের উপর চলে গেল। তারপর অনুকূল প্রতিকূল যুক্তিগুলি অনেক চিন্তা ক'রে ক'রে তিনি পড়লেন, শেষে সিদ্ধান্ত করলেন—"জ্ঞানদায়িনীকে বর্জ্জন করাই শ্রেয়। যদি আমার হৃদয় সে কষ্টে পীড়িত হয় তথাপি ভগবানকে স্মরণ ক'রে কর্ত্তব্যের পথে চল্লুম, তিনি আমায় ছাড়বেন না।"

এই ভেবে তিনি শয়ন প্রকোষ্ঠে গিয়ে দেখেন, হাতীর দাঁতের খাটের মশারি খাটাবার সিংহ-মুখ একটা দণ্ড ধ'রে ম্লানমুখে জ্ঞানদায়িনী দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে আস্‌তে দেখে চোখে আঁচল চেপে কাঁদ্‌তে লাগলেন। কিশোর রায় তাকে আদর কর্‌লেন না,—দূরে দাঁড়িয়ে বল্লেন "জ্ঞানদা তুমি ভাল হ'তে পার্‌বে?" জ্ঞানদা কিছু বল্লেন না, শুধুই কাঁদ্‌তে লাগলেন। কিশোর পুনর্বায় সেই প্রশ্ন কর্‌লেন,—জ্ঞানদা এবারও কিছু না বলে চোখের জল মুছ্‌তে লাগলেন। তাঁর স্বামী বিরক্ত হ'য়ে বল্লেন—"যাক্, কপাল ভাঙ্গলে জোড়া লাগে না—আমার জীবনে আর সুখের আশা রাখি না, তুমি নওয়াপাড়া যাবে?" এই প্রশ্নে বিস্ময়ের ভাবে জ্ঞানদা সজল চক্ষে কিশোর রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিশোর রায় বলে যেতে লাগ্‌লেন—"তুমি আমি পরস্পরের দ্বারা আর সুখী হ'তে পার্‌ব না—একত্র থাক্‌লে নানারূপ অশান্তি হ'বে —তার চাইতে দূরে থাকাই শ্রেয়, সুখের থেকে সোয়াস্তি ভাল। আমি তোমায় নওয়া পাড়ায় পাঠাতে চাই—যাবে?"

এবার জ্ঞানদা অশ্রু-কম্পিত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বল্লেন "যাব।" কিশোর রায় মনে করেছিলেন এই চূড়ান্ত শাস্তির কথা শুন্‌লে জ্ঞানদা বিমূঢ় ও স্তব্ধ হ'য়ে পড়বে, কিন্তু তাঁর এ সময়েও পিত্রালয়ে যাবার ইচ্ছা দেখে কোন কালে যে তিনি আর স্বামীকে ভালবাসবেন সে আশা মনের থেকে দূর হ'ল। আর কিছু মাত্র বিলম্ব না ক'রে তিনি ঘর হ'তে বাইরে গিয়ে দেওয়ানজিকে ডেকে এনে বল্লেন—"ইনি নওয়া-

পাড়া যাবেন, আপনি এঁর যাবার বন্দোবস্ত ক'রে দিন, সেথানে যে সকল চাকর ও দাসী যাবে—তা ঠিক করুন, এবং মাসিক টাকার ব্যবস্থা ক'রে রাখুন,—এবার হয় ত একটু দীর্ঘকাল তাঁকে তথায় থাকতে হ'বে।"

দেওয়ানজি বুঝতে পারলেন না, রাণীমা সে দিন মাত্র পিত্রালয় হ'তে এসে আবার দীর্ঘকালের জন্য তথায় যাচ্ছেন কেন? হয় ত এঁর মা বৃদ্ধা হয়েছেন, অসুখ টসুখের খবর এসে থাকবে। এই সিদ্ধান্ত ক'রে তাঁর পিত্রালয়ে যাত্রার উদ্যোগ করতে লেগে গেলেন।

"মনের ব্যথা দূর করবার উপায় কি?" কিশোর রায় ভগবানকে ডেকে কাঁদতে লাগলেন আর প্রার্থনা কল্লেন, "আমি মনকে কিছুতেই বুঝোতে পাচ্ছি না—আমার মনকে শান্ত কর, আমার এ অসহ্য কষ্ট দূর কর।" অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত বিনিদ্র চক্ষে রাত কাটিয়ে প্রাতে এই প্রার্থনা ভগবৎ সকাশে জ্ঞাপন করেন। একদিন মনে হ'ল কোন একটা বড় ও ভাল কাজের মধ্যে থাকলে মনটা জ্ঞান-দার চিন্তা হ'তে মুক্ত হ'তে পারবে। দেওয়ানজিকে বল্লেন—"আপনি আমাদের ষ্টিমলঞ্চ খানি প্রস্তুত থাকতে বলুন, আমি অদ্যই আমাদের জমিদারীর কাচারি গুলি দেখতে যাব—সর্ব্বাপেক্ষা দূর কোন্ জায়গাটা বলুন দেখি।"

দেওয়ান শ্যামসুন্দর ঘোষ বল্লেন—"সিলেটে হবিগঞ্জে হচ্ছে পূর্ব্ব সীমানায়, ময়মনসিংহ কেন্দুয়া নামক গ্রাম আর একটা সীমানা—এ দিকে মগড়া ও সুন্দরবন ও কতকটা দূর,—অবশ্য সিলেট ময়মন-সিংহের মত দূর নয়, এদিকে বীরভূম, শাকুলীপুর, ও উত্তরে জলপাই-গুড়িতেও অনেক তালুক আছে। মগড়ার প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে—নায়েব লিখেছেন, তাঁকে তারা কখন খুন করে ঠিক নেই। সুতরাং

সেদিকে যাওয়া নিরাপদ নয়—বীরভূম অঞ্চলটাতে দেখবার মতন অনেক জিনিষ আছে—সেখানেও আমাদের জমিদারী আছে।"

"দেওয়ান, আমি মগড়াতে যাব।"

"সেখানে যেতে হ'লে অনেক পাইক লস্কর নিয়ে যেতে হবে, মারামারি হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। তারা বড়ই দুর্দ্দান্ত প্রজা। রাজাবাবু এখন অন্যত্র গিয়ে শেষে গোলমাল মিটলেও তথায় যেতে পারেন।"

"না, শ্যামসুন্দর বাবু, আমি সেইখানে যাব। লোকজন অন্যত্র গেলে যেরূপ—তেমনই দেবেন—বেশী নেওয়ার প্রয়োজন নেই।"

রাজাবাবু প্রথম জমিদারীতে যাবেন, খুব ধুম ধামে সাজ সজ্জা হ'ল। বাঁশ বেড়িয়ার ওদিকে ও তাঁর অনেক তালুক ছিল। রেলওয়েতে সেইখানে এসে কাচারীতে এলেন, দু চারদিন পরে তথা হ'তে মগড়া যাবেন, এই স্থির কর্‌লেন।

রাজাবাবু এসেছেন খবর পেয়ে প্রজারা তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য একত্র হ'ল। তারা দুদিন পূর্ব্বেই খবর পেয়েছিল। পুরানা ধরণের লোক, যে জমিতে তারা বাস করে তার মালিককে দেখা তাদের বড় একটা সৌভাগের বিষয় মনে করে। ষ্টেশন হ'তে রাজাবাবু যেতে লাগ্‌লেন, দুধারে লোকের ভয়ানক ভিড়, তাদের একহাতে নিশান, আর একহাতে মশাল, কারণ তখন সন্ধ্যা হ'য়ে ছিল। গ্রামে ও চতুষ্পার্শে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি ও বাজনার শব্দ হ'তে লাগল; কত লাল কাল টুপি পরা মুসলমান ছুটে এসেছে, কামার কুমার সদ্গোপ তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থও আছেন, কুলবধুরা লজ্জা ছেড়ে দিয়ে ঘোমটায় মুখখানির অর্দ্ধেক ঢেকে রাজদর্শনে এসেছেন, তাঁদের কপালে বড় বড় সিন্দুরের ফোঁটা। লাল নীল পতাকা মশালের আলোতে বড় বড় প্রজাপতির মত

দেখা যাচ্ছে। স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, যুবক ও বৃদ্ধের মহামিলন; গ্রামগুলি যেন ভেঙ্গে পড়েছে। রাজাবাবুর পাল্কী যেখানে, সে দিকে বহু মশালের আলো, কারণ সকলেই তাঁর, মুখখনি দেখে পূণ্য অর্জ্জন কর্‌তে চাচ্ছে। এদিকে একটি খাল পার হ'য়ে রাণীপুকুর গ্রাম হ'তে শত শত লোক খেয়া নৌকায় আস্‌ছে। নৌকাখানি লোক পদ ভরে ডুবু ডুবু। কাছারী বাড়ীর দরজায় বাঁশবেড়ের কুমারের হাতের সুন্দর, কারুকার্য্য খচিত,বড় বড় কুম্ভ জলে পোরা, তাদের গায়ে সিন্দুর মাখা ও উপরে আম্র পল্লব জড়িত নারিকেল ফল। নায়েব শীতল বাঁড়ুয্যে রাজাবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন, তখন গ্রামের মোড়ল রাসবিহারী সরকার পনের হাজার সাতশতের টাকা এনে রাজাবাবুর পায়ের কাছে রাখ্‌লে, উহা তথাকার প্রজাদের নজর। ঐ তল্লাটের আয় ৫৫ হাজার টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৭০ বছরের এক বুড়ো ভিঁড় ঠেলে তথায় আস্‌তে বিষম ব্যগ্রতা দেখালে; রাজাবাবু তার জন্য একটু পথ কর্‌তে বল্লেন। অমনি বহুলোক তাকে একটা বলের মত হাতে হাতে নিয়ে রাজাবাবুর কাছে উপস্থিত কর্‌লে। বুড়ো রাজাবাবুর পায়ের কাছে প'ড়ে হাউ মাউ ক'রে কাঁদ্‌তে লেগে গেল, তার একটিও দাঁত নেই, পরিধান একখানি শতছিন্ন খাটো কাপড়, আর একটা ন্যাক্‌ড়া মাথায় পাগড়ীর মত জড়ানো।

বুড়ো কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে সেই ছেঁড়া কাপড় খানির কোঁচার খুঁট হ'তে বহু চেষ্টায় একটি গেরো খুল্লে, কারণ সেই চেষ্টায় তার হাতের আঙ্গুল গুলি ক্রমাগত কাঁপছিল। সেই গেরো খুলে সে একটি আধুলি ও একটি সিকি বার ক'রে জমিদারের পায়ের কাছে রেখে বল্লে, "বহুকষ্টে এই ৸৹ আনা জোগাড় কর্‌তে পেরেছি, আজ আমার চক্ষু দুটি ধন্য, সারাটা জীবন, বাবা তোমার পথের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। আমাদের

রাজাকে দেখ্‌ব ছোট বেলা থেকে এই আশা করে আছি; রেলভাড়া জোগাড় করতে পারি নি। কতদিন উপোস ক'রে বুড় বয়সে মা সর্ব্ব-মঙ্গলার কাছে বলেছি, 'প্রাণ যাবার আগে আমাদের রাজাবাবুকে এনে দেখাও।' আমি পাপী, তাই ভেবেছিলাম এ জীবনে সে পুণ্য হবার আশা নেই। আজ তোমার শ্রীমুখ দেখে চোখ জুড়ালো. এই বার আনা নজর বহুকষ্টের পাওয়া, তুমি একবার হাত দিয়ে ছুঁয়ে নেও, আমি ধন্য হই"—এই বলে পুনরায় হাউ মাউ করে কাঁদ্‌তে লাগল।' নায়েব সেই বার আনা পয়সা সরিয়ে রাখ্‌ছিলেন, রাজাবাবু নিজ হাতে তা তুলে নিলেন, তাঁর চোখে এক ফোঁটা অশ্রু টলমল্ করতে লাগ্‌ল। তিনি বল্লেন "তোমার এই বার আনা, আমার কাছে কুবেরের ভাণ্ডারের চেয়েও বড়। তুমি আমার জন্য তপস্যা কচ্ছিলে তা—আমি জানতুম না, আমি তোমাদের ভুলে ছিলাম,—তোমরা যে আমার এত আপনার, তা মনেই ছিল না, আমি ভেবেছিলুম আমার কেউ নেই—এখন দেখ্‌ছি আমার বহু পরিজন। যা হোক, তুমি কেঁদ না, তুমি আমার পরিবারেরই একজন," এই বলে নায়েবকে বল্লেন, "এ দেখ্‌ছি বড্ড গরীব, এর বাড়ী ঘরের অবস্থা দেখে ভাল বাড়ী ঘর ক'রে দিও—মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা ক'রে দিও, যেন এর খাবার পর্‌বার দুঃখ না থাকে। আমাকে সকল কথা লিখে পাঠিও।" বুড় তখন মাটীতে প'ড়ে মাথা নুইয়ে উচ্চস্বরে কেঁদে বল্‌ছিল—"আমার দর্শন হ'য়েছে এইত লাভ, কটা দিনই বা বাঁচব? তার জন্য সুবিধা করবার ইচ্ছায় আসি নি, তুমি যা দেবে তা আমার ভগবানের দেওয়া, আর কি বল্‌ব।"

দুই একদিন সেখানে থেকে রাজাবাবু মগড়ায় এলেন। তাঁর মনে অনেকটা শান্তি এসেছে, তাঁর জন্য শত শত লোক এরূপ আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা কচ্ছিল তা তো তিনি জান্‌তেন না।

এক জ্ঞানদা না হ'লেই সৃষ্টি অন্ধকার দেখ্‌ছিলেন, দৃষ্টি তাঁর এতটা সীমা-বদ্ধ হ'য়ে প'ড়েছিল—তাঁর চার'দিকে যে মস্ত বড় স্নেহের রাজ্য পড়েছিল, শত শত চক্ষের অশ্রুজলে গড়া একটা সিংহাসন তাঁর জন্য পাতা ছিল, তিনি যে শুধু মুখের রাজাবাবু নন্—কিন্তু তাঁদের প্রাণের রাজা, এটা ভাব্‌তে তাঁর মনে অনুতাপ হ'ল। "এদের জন্য আমি কি করেছি? আমিত জ্ঞানদার জন্য কত কেঁদেছি, ঠাকুর ঘরে কত ধন্না দিয়েছি, এমন কি আত্মহত্যা কর্‌তে গেছি,—অথচ জ্ঞানদা একদিন ও আমায় চায় নি। কিন্তু এরা যে আমার নাম কর্‌তে পাগল, এদের শত-অভাব অভিযোগ আছে, হয়ত অনেকের বহু কষ্ট, তার দূর করার জন্য আমি দায়ী—আমি সেই দায়িত্বের কথা একদিনও ভাবি নাই। নায়েবের কাছ থেকে খাজনা পাওয়াটাই শুধু এই জমিদারীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ মনে করে একবারে নির্লিপ্ত ছিলাম।" তখন সেই বুড়োর অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি মনে পড়ল। আমার দেখবার এর কত আনন্দ! সত্য সত্যই জমিদারের মুখ দেখ্‌বার জন্য জীবন ভরে তপস্যা করেছে,—আমি ঘোর স্বার্থপর বিষয়ী, দেহ-সুখ-ব্যস্ত,—আমাকে ঠাকুরের জায়গায় বসিয়ে 'দর্শন' করতে চেয়েছে।" এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে রাজাবাবুর মনে একটা লজ্জা ও ধিক্কারের ভাব এল, তিনি জ্ঞানদায়িনীর কথা কিছুকালের জন্য ভুলে গেলেন।

মগড়ার নায়েব শশী লাহিড়ী বল্লে, "হুজুর, এখন এসে ভাল করেন নি, এখানে মুসলমানের সংখ্যাই বেশী, তারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করেছে, আমাকে খুন কর্‌বে বলে ভয় দেখাচ্ছে, এমন কি সিন্দুরতলার প্রাসাদ লুট করবার মতলব পর্য্যন্ত কচ্ছে। আজ তিন দিন হ'ল পথের মাঝে সন্ধ্যাবেলা আরজান খাঁ প্রজা আমার হাত দুটো ধরেছিল, তার কোমরে একটা ছোরা ছিল। দুটো বড় লাল চোখে চেয়ে সে আমায় এমনই গাল দিচ্ছিল যে দৈবাৎ যদি মিছির পালোয়ান পেছন থেকে এসে তার

দুটো হাত পেছন-মোড়া করে না বেঁধে ফেল্‌ত, তা হ'লে তার হাতেই মুরগীর ন্যায় আমিও সেইখানে জবাই হ'তেম। কিন্তু মিছির তাকে ধরে রাখ্‌তে পারলে না,—তার পেটে এমনই জোরে হঠাৎ পদাঘাত করলে যে মিছির চিৎ হ'য়ে পড়ে গেল এবং সেই অবসরে সে দে ছুট। আর ধরলেই বা কি হ'বে? ধরলে বা পুলিসে খবর দিলে হয়ত কাছারী বাড়ীটা রাত্রিতে এসে জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে। মহারাজ এ সময় আসাতে বড়ই অসোয়াস্তি বোধ কচ্ছি।"

রাজাবাবু এর উত্তরে কিছুই বল্লেন না,—একটি পাইককে গ্রামে পাঠিয়ে এই বল্‌তে আদেশ কল্লেন যে কাল সকালে রাজাবাবু স্বয়ং তাদের পাড়ায় যাবেন।

নায়েব প্রতিবাদ করতে সাহস কল্লে না,—তবে ভাব্‌লে, কলেজে পড়ে লেখা পড়া শিখ্‌ছেন—এরা সংসারের কিছুই জানেন না, অথচ বেপরওয়া, যেন সব জান্তা। পরদিন যখন পাইক সর্দ্দার সেপাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রওনা হ'বে, তিনি নায়েবকে বল্লেন—"তুমি বল্‌ছ, বিদ্রোহীদের নেতা মানিক্‌সেখ, তার বাড়ী যাওয়ার পথটা ভাল ক'রে বলে দাও।" নায়েব বল্লে, "লোকজন সঙ্গে যাচ্ছে, তারা পথ দেখিয়ে নে যাবে।" রাজাবাবু বল্লেন "আমি কাউকে সঙ্গে নেবনা, একা যাব।"

সকলেই অবাক হ'য়ে গেল।

তখন একটা লাল নীল পেন্সিল দিয়ে রাজাবাবু পকেট বইএর একটি পাতায় সেই গ্রামখানির একখানি ম্যাপ এবং বড় বড় প্রজাদের বাড়ী ও তথায় যাবার পথ ঘাট এঁকে নিয়ে একা সেই গ্রামাভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। সেপাই-লোক-লস্কর তাঁর পথের দিকে ভয়ে ও বিস্ময়ে চেয়ে রইল, শুধু নায়েবের প্রাণটা একটা অব্যক্ত ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগল—তা' জমিদারের বিপদের কিংবা নিজের বিপদের আশঙ্কায় তা বোঝা গেল না।

ওপারের আলো

হানিফ সেখের বাড়ীতে আজ বিস্তর জনতা। জমিদার বিদ্রোহ দমন করতে এসেছেন, সুতরাং সেপাই-পাইক বিস্তর সঙ্গে এসেছে, গুলিও চালাতে পারে। আকবর খাঁ বল্লে, "আমদের একশ সড়কী আছে। হানিফ্ সেকের বন্দুক আছে, তরিপউল্লার ছেলে রহিম উল্লাও এবার বন্দুকের লাইসিনি পেয়েছে, খোদার মর্জ্জি হ'লে আমাদের হট্‌তে হবে না। তা' যা হবে,—আমরা জান্ দেব,— ইজ্জতই যদি না থাকে তবে জান নিয়ে দরকার কি?" এর মধ্যে করিম সেখ খুব মর্দ্দানি ক'রে পালোয়ানদের মত এক বাহুতে অপর বাহু দিয়ে চটাপট্ থাপড় দিয়ে একটা শাল গাছের মত দাঁড়াল, ও তার বিক্রম দেখে প্রায় দুইশ মুসলমানের প্রাণ উত্তেজনায় যেন আড়াই হাত উঁচু হ'য়ে উঠ্‌ল, তারা 'আল্লাহু' বলে চীৎকার করতে লাগ্‌ল। এমন সময় একজন বল্লে, "দেখ্ দেখি পূর্বদিকে কে আস্‌ছে, একজন বাবু নয়?" সকলে দেখ্‌লে একটি সৌম্যকান্তি গৌরবর্ণ যুবক—বেশ ভূষা সাধারণ, হাতে একখানি অতি হাল্কা বেতের ছড়ি, তার অগ্রভাগে একটি হীরার চোখ-ওয়ালা সোনার কুকুরমুখ,—ধীর পাদক্ষেপে হানিফের বাড়ীর দিকে আসছেন। তারা বলাবলি করতে লাগ্‌ল যে হয়ত ইনি পুলিসের ইনেস্পেক্টার বাবু, নয়ত জমিদারের কোন নায়েব। করিম খাঁ বল্লে, "পুলিস হ'লে তার পেছন পেছন খাতা নিয়ে লাল পাগড়ীওয়ালা কনেষ্টবল থাকতই।"

এই সময়ে তিনি তাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে বল্লেন, "আমি কে জান? আমি তোমাদের জমিদার কিশোর রায়।"

তারা বিশ্বাস করতে পার্‌লে না। রাজা বাবু যে পথ দিয়ে যান, তার দুই দিকে তুরুপ-সোয়ার সারবন্দী হ'য়ে সাথে সাথে যায়। তাদের একহাতে নিশান, একহাতে সড়কী ও কোমরে তলোয়ার ও বন্দুক,

সম্মুখে বড় বড় রূপার আশাছোটা নিয়ে নকিবেরা "খবরদার" বলে চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে যায়। যারা এই সকল দেখে এসে পাড়া গাঁয়ে গল্প করে, তারা আবার বাড়িয়ে বলে—সুতরাং পাড়াগাঁয়ের লোকের মানসপটে জমিদারের সম্বন্ধে কল্পনা-জড়িত নানা ছবি আঁকা আছে। এঁর সঙ্গে তাঁর যে আকাশ পাতাল পার্থক্য—সুতরাং কেউ একথা বিশ্বাস কল্লে না। এর মধ্যে আবদুল জব্বর মিঞা হঠাৎ এসে জমিদারের পায়ের কাছে সেলাম ক'রে বল্লে "হুজুর একা এখানে!" রাজা বাবুর বাড়ীতে সে অনেকদিন পাইকের কাজ করেছে, সুতরাং হানিফ্ সেখ এবং আর আর সকলের সন্দেহ দূর হ'ল। তারা কিছু ভেবে স্থির করবার পূর্ব্বেই তাঁকে একত্রে হাত উঠিয়ে সেলাম কল্লে। কিশোর রায় বল্লেন—"তোরা নাকি নায়েবকে মার্‌বি? কাছারি বাড়ী জ্বালাবি, সিন্দুরতলায় বাড়ী লুট কর্‌বি? এত ক'রে কি হ'বে, আমিই তো হচ্ছি তোদের রাগের মূল, আমাকে খুন কর্ না—সব চুকে যাক্।"

এত বড় বীর পুরুষ তারা, এই কথায় থর থর ক'রে কাঁপ্‌তে লাগল। জমিদার আবার বল্লেন—

"তোরা নিশ্চয়ই কোন জায়গায় ব্যথা পেয়েছিস্, নতুবা এত চটে গেছিস্ কেন? আমি তোদের পিতা, তোরা আমার ছেলে, তোদের কথা থাক্‌লে আমায় বল্‌বি না? আমাকে কিছু না জানিয়ে আমার কাছারি বাড়ী পুড়িয়ে ফেল্‌বি, তোদের পিতার মনে কষ্ট দিলে শেষে অনুতাপ হবে। আমি তাই তোদের বল্‌তে একা এসেছি, তোরা ত দেখছি সড়কী, দা এই সব নিয়ে তৈরী হ'য়ে এসেছিস্—আমার দোষ থাক্‌লে বিচার কর্, যে শাস্তি দিবি তাই নেব।" রাজা বাবুর কণ্ঠে অশ্রুরুদ্ধ হয়ে এল, হানিফ খাঁর চোখ থেকে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগ্‌ল।

তখন সেই জনতার মধ্যে জানু পেতে বসে এক হাত দিয়ে অবিরত চোখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে হানিফ্‌ খাঁ রাজা বাবুকে তাদের অভিযোগ জানালে। নায়েব যে তাদের উপর কত জুলুম ও অত্যাচার করেছে, তার ইতিহাস দিলে—তারা খাজনা দিলে খাতায় উস্থল দেয়না, হাজার তাগাদায়ও দাখিলা দেয় না, দুমাস যেতে না যেতে সেই সময়ের জন্য আবার খাজনা আদায় করতে পাইক পাঠায়। এই ভাবে একই খাজনা দুইবার তিনবার আদায় করে, না দিলে কাছারি বাড়ীতে নিয়ে আটক্‌ ক'রে রাখে, পাইক দিয়ে পেছন-মোড়া ক'রে বেঁধে পিঠে লাথি মারে, মুখে থুতু দেয়। পুলিসকে জানিয়ে কোন ফল হয় না। পুলিসের বাবুরা প্রায় কাছারি বাড়ীতে আসে, খুব মদ মাংসের ঘটা চলে। "আমরা নালিস কর্‌ত গেলে পুলিস উল্টো আমাদের হাজতে নিয়ে ফেলে। সে দিন রহিম সেখের ছেলেটাকে নিয়ে কাছারি বাড়তে আট্‌কে রাখ্‌লে। তার দোষের মধ্যে এই যে নায়েবের পাইক রহিমের দাড়ি ধ'রে টান্‌ছিল, দেখে ছেলেটা সহ্য করতে না পেরে পাইকটার মুখে একটা চড় মেরেছিল, ছেলেটার বুকে পিটে এমনই প্রহার ক'রে, যে ৪।৫ দিন পরে সে মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে গেল, আহা ২৪ বছরের ছেলে গো, গায়ে অসুরের জোর ছিল, দুটো ইলিস মাছ ও আউস ধানের তিনপো চেলের ভাত সে একেবারে খেত। নায়েব হুকুম দিয়ে কত বাড়ী যে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে, তা আর কি বল্‌ব! ঐ পশ্চিম দিকে একটু দূরে যে শুধু উঠোনটা পড়ে রয়েছে, সেখানে একটা গরীব বুড়ি থাক্‌তো, তার খড়ো ঘরখানি জ্বালিয়ে দেছে—এখনও বোধ হয় সেখানে পোড়া ছাই দেখতে পাওয়া যায়।"

কিশোর রায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি ভাব্‌লেন তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কত লোক আছে, তাঁর অমনোযোগে কত লোক কষ্ট পাচ্ছে।

আর তিনি, নওয়াপাড়াটাই জগতের একটি মাত্র স্থান মনে ক'রে দিনরাত তাই ভাব্‌ছেন, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি ?

হানিফ সেখ শেষে বল্লে "তুমি আমাদের বাপ, আমরা তোমার ব্যাটা, আমাদের এইযে সব দুঃখ তা দূর কর বাবা, আমাদের এই নায়েবের হাত হ'তে উদ্ধার কর" তখন সকলগুলি প্রজা একত্র হ'য়ে রাজাবাবুর পায়ে ধরে কাঁদ্‌তে লাগল, কুঁড়ে ঘরের দাওয়ায় ও দরজার পাশ থেকে, রূপার বেশর নাকে ও রূপার কণ্ঠী গলায় স্ত্রীলোকেরা অশ্রুসিক্ত চক্ষে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

রাজাবাবু বল্লেন, "তোরা আমার ছেলে, যখন সকলে একসঙ্গে এক কথা বলছিস্ তখন জুলুম অবশ্য হ'য়েছে। আমি এ নায়েবকে অবশ্য রাখ্‌বনা" এই বলে পকেট বুক হ'তে একটুকরা কাগজ ছিঁড়ে তাতে লাল নীল পেন্সিল দিয়ে নায়েবকে লিখ্‌লেন "লাহিড়ি, এখানে চলে আস্‌বে, সঙ্গে দুইএকজন লোক নিয়ে এস।" সেই চিঠি খানি নিয়ে আবদুলজব্বর চলে গেল, এবং আধ ঘণ্টা পরে নায়েবকে ও লোক লস্কর নিয়ে হানিফ্ সেখের বাড়ীতে ফিরে এল।

রাজাবাবু বল্লেন—"লাহিড়ি, তুমি আমার কি টাকা ভেঙ্গেছ, প্রজাদের কাছ থেকে জুলুম ক'রে কি নিয়েছ, সে সকল আমি শুনতে চাইনা, সমস্ত প্রজারা তোমার অত্যাচারের কথা বলছে—তোমার মুখের কতকগুলি মিথ্যা কৈফিয়ৎ শোনবার মত আমার সময় নেই। তোমার আজ হ'তে ছুটি। তোমার বাড়ী নৈহাটি, তুমি আজই সেখানে চলে যাও। যদি শুনতে পাই, তুমি আর একটি দিন মগড়ার ধারে কাছে আছ—তবে তোমাকে শাস্তি দেওয়ার যে সকল আইন-সঙ্গত উপায় আছে, তা অবলম্বন করব, সেটা তোমার পক্ষে গুরুতর হবে।"

শশী লাহিড়ী তার জমিদারকে একদিনেই চিনে ফেলেছিল—তিনি

স্বল্পভাষী, কিন্তু মুখে যা বলেন কাজেও তাই করেন, কার সঙ্গে পরামর্শ করেন না। সুতরাং মাথা হেঁট করে, চক্ষু মাটীর দিকে ফেলে—যেন দুর্ব্বাঘাস দেখ্ছেন—এইভাবে কাচারী বাড়ীর দিকে গেলেন। রাজাবাবু কাচারীর কেরানিকে বল্লেন, ওর সঙ্গে গিয়ে কাগজপত্র বুঝে নিতে।

তিনি হানিফ্ খাঁকে বল্লেন, "তোমায় দেখ্ছি এখানকার সকলে খুব মান্য করে, তুমি নায়েবী নেবে ?"

"হুজুর, আমি লিখ্তে জানি না।"

"কাচারীতে যে কেরানী আছে—তাকে দিয়ে সেই কাজটি হবে, আর আসল কাজ গুলি তুমি করো।"

হানিফ ভুঁয়ে পড়ে রাজাবাবুকে বহুত বহুত সেলাম কর্তে লাগলো, এবং অপরাপর প্রজারা উচ্চস্বরে তাঁর প্রশংসাবাদ কর্তে লাগল।

রাজাবাবু তাঁদের বল্লেন, "ছেলে হ'য়ে দুষ্টমি কচ্ছিলি, এখন নায়েব সরে গেছে, তোরা ভাল হ'য়ে থাক্। আমার আরও কিছু কর্ত্তব্য আছে। হানিফ্ তুমি কেরানীর সাহায্য নিয়ে একটা হিসেব তৈরী কর, নায়েব যাদের যা ক্ষতি ক'রেছে, সরকার হ'তে তা পূরণ করে দেওয়া যাবে।"

তারপর পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম গুলিতে জলকষ্ট দেখে কিশোর রায় কতকগুলি জলাশয় কাটাতে আরম্ভ করলেন। সেই গ্রামবাসীরা তাঁর কাছে যেরূপ মিনতি ও ভক্তি দেখাতে লাগ্ল, তাতে বোধ হ'ল, যেন তিনি ভগবান হ'য়ে এসেছেন।

এই সকল জলাশয় খননের কাজ তিনি নিজে দেখ্তে লাগ্লেন। সারাদিন ধরে কখনও ঘোড়ার পিঠে, কখনও পাল্কীতে চড়ে তিনি বাসা বাড়ীতে ফির্তেন। গ্রামের পথদিয়ে যেতে যেতে দেখ্তে পেতেন, সারাদিন লাঙ্গল চালিয়ে, কি ধান কেটে, খড়ের বোঝা মাথায় ক'রে চাষীরা তাঁদের কুঁড়ে ঘরে ফির্ছে। তাদের বউ সকল সন্ধ্যায় দীপ-

জ্বেলে, মেটে সান্‌কিতে ভাত নিয়ে তাদের প্রতীক্ষা করছে। আর একটু রাত হ'লে তিনি দেখ্‌তেন, সারা দিনের ক্লান্তির পর আহার ক'রে চাষা মোড়ায় বসে ডাবা হাতে তামাক খাচ্ছে—এবং তার স্ত্রী পাশে দাঁড়িয়ে কল্কের আগুন ফুঁদিয়ে উস্কিয়ে দিচ্ছে, তার পৈঁছি থেকে ছোট ছোট রূপার ঘুণ্টি চাষার কাঁধ ছুঁয়ে যেন নৃত্য কচ্ছে।

এই সকল দৃশ্য দেখে তিনি সারাদিন যে চিন্তা থেকে মুক্ত থাক্‌তেন, তা আবার এসে তাঁর মনকে দখল ক'রে বস্‌ত, জ্ঞানদায়িনীর মুক্ত কৃষ্ণ কেশরাজির সুগন্ধ ও দোদুল্যমান সৌন্দর্য্য স্মরণ ক'রে একা বিছানায় প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে থাক্‌তেন এবং বহু কষ্টেও নিদ্রাদেবীর হস্তে নিজকে সমর্পণ করতে পারতেন না।

এই ভাবে অনেক দিন কাটিয়ে তিনি বাড়ীতে ফিরে যাবেন। পথে বামুনডাঙ্গা, সেই গ্রামে তিনি একটি জলাশয় খনন করিয়ে দিয়েছিলেন। বামুনেরা তাকে অভিনন্দন কর্‌বেন; এজন্য তিনি রেল থেকে সন্ধ্যা ৭টার সময় সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী ষ্টেশনে নাব্‌লেন। দেখ্‌লেন, তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিস্তর লোকের ভিড় হ'য়েছে, তাঁরা তাঁকে নিয়ে একটা পুষ্প বেদীতে বসালেন, এবং প্রাণকিশোর ভট্টাচার্য্য—সেই গ্রামের অতি পদস্থ ও বৃদ্ধ অধিবাসী, পঞ্চপ্রদীপ ধুপ ও নৈবেদ্য নিয়ে তাকে দস্তর মত আরতি কর্‌লেন। মেয়েদের মুখের শঙ্খধ্বনি, ছেলেদের হাতের কাঁসর ও ঘণ্টা নিনাদ এবং প্রাণকিশোরের চামর দোলান, দীপ ঘোরানো এবং বরণডালা নিয়ে দীপের আলোতে, ধুপের ধোঁয়ায়ে, কিশোর রায়ের কাছে ঘণ্টা বাদ্যের তালে তালে, থম্‌কে থম্‌কে উঠানো নামানো—দেব-মন্দিরের আরতির কথা মনে জাগ্রত করল। কিশোর রায় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর তাঁকে এতটা বাড়ান কখনই ইচ্ছা করেন নাই, কিন্তু তাঁরা বল্লেন

"রাজা আজ স্বয়ং ভগবান" আমাদের এই প্রার্থনা পূর্ণ না করলে আজ আমরা সবাই মিলে উপোস ক'রে থাকবো।" লজ্জায় মাথা হেঁট ক'রে রাজাবাবু এই প্রার্থনা গ্রহণ করলেন, কিন্তু তাঁর মুখ অশ্রুপ্লাবিত হ'য়ে গেল। যখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন, তখন তিনি বেদী হ'তে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁর অপেক্ষা অধিক বয়স্ক সমস্ত ব্রাহ্মণের পদধূলি নিলেন, এবং তাঁর কাছে যে গৌরকায় সুদর্শন ছোট বালকটি একটা চন্দনের বাটি হাতে ক'রে দাঁড়িয়েছিল, তার গলায় বৃহৎ পুষ্পমাল্যটি পরিয়ে দিলেন।

এরপর তিনি সিন্দূরতলায় ফিরে এলেন। বাড়ী এসে তিনি কয়েকদিন স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় ছিলেন, প্রজাদের অভাব অভিযোগ কোথায় কি কি, তাদের কি ক'রে অবস্থার উন্নতি হ'তে পারে, কি ক'রে তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হ'বে, নিজ সেরেস্তায় প্রত্যেক জায়গার লোকদের চিঠিপত্র ঘেঁটে ঘেঁটে শ্যামসুন্দর ঘোষের সঙ্গে সেই পরামর্শ করতে লাগলেন।

এর মধ্যে একদিন মাধব মুখুয্যে নওয়াপাড়া হ'তে ফিরে এসেছে। সে রাজাবাবুর সরকারের একজন কর্ম্মচারী, অপর কয়েকজনের সঙ্গে তাহারও নওয়াপাড়ায় থাকার আদেশ হ'য়েছিল। রাজাবাবু বৈঠকখানায় একা বসে আছেন, এমন সময়ে মাধব এসে তাঁকে নমস্কার করলে। মাধবকে দেখে রাজাবাবুর মন অধীর হ'য়ে উঠল, কোন অজানা রাজ্যের হাওয়া এসে যেন গায়ে পড়ল। তিনি কোন প্রশ্নের উত্তর করতে সাহসী না হ'য়ে শুধু তার দিকে ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে রইলেন।

মাধব তাকে প্রণাম ক'রে বল্লে—রাণীমার মা প্রাণদা দেবী তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন—অগ্রহায়ণ মাস পড়েছে। "রাণীমায়ের কাশ্মীরি শাল ও গায়ের কাপড়গুলির বাক্সটা আমার সঙ্গে দিতে বলেছেন।" রাজবাড়ীর খবর কি, কে কি রকম আছেন, তাও দেখে যেয়ে তাঁকে বলতে বলেছেন। "হুজুরের আদেশ হ'লে আমি কালই চলে যাব।"

ভয়ে ভয়ে অনেকটা লজ্জা ও হৃদয়ের আবেগ বাহ্যিক সংবরণ

করে কিশোর রায় বল্লেন—"তাঁরা ত ভাল আছেন ?" তিনি নিজে অত্যন্ত কৃশ হ'য়ে গেছেন ; মনে হয়েছিল হয়ত জ্ঞানদা যে ভাবেই থাকুক না কেন, তাঁকে ছাড়া থাকতে তাঁরও কষ্ট হচ্ছে—হয়ত শুকিয়ে গেছেন, অনুতাপে রাত্রিটার অনেক সময় কেঁদে কাটান। এই ভেবে কিশোর রায় দুঃখের মধ্যে পত্নীর তাঁর প্রতি কিছু টান আছে—অনুমান ক'রে সোয়াস্তি পেতেন। মাধব চাটুয্যে বল্লে—"তাঁরা বেশ ভাল আছেন, রাণীমার শরীর বেশ ভাল হয়েছে। আগেকার মত কৃশ নেই, বর্ণটা আরও যেন চাঁপা ফুলের মত হ'য়েছে। প্রায়ই এখানে ওখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান,—রাজাবাবুর পিতাঠাকুর তাঁকে যে সঙ্গীত বিদ্যা শিখিয়েছেন, তাতে নওয়াপাড়া এমন কি রাজহাটি গ্রামেরও ব্রাহ্মণ সকল মুগ্ধ হ'য়ে গেছেন, রাণীমার গলাটি কোকিলের স্বরের মত মিষ্ট।"

এই বলে কিশোর রায়কে প্রণাম ক'রে চাবি হাতে ক'রে সে রাণীমার দ্রব্যাদি রাখ্‌বার প্রকোষ্ঠ খুলে একটা বড় তোরঙ্গ বের ক'রে নিয়ে এল ; এবং বল্লে—"হুজুর এইটেই ত ?" কিশোর রায় অন্যমনস্ক ভাবে বল্লেন "হাঁ" মাধব তবু দাঁড়িয়ে রইল। তার প্রভু তখন মাথা হেঁট ক'রে কি ভাব্‌ছিলেন, অনেকক্ষণ পরে মাথা উঁচু করে দেখ্‌লেন, মাধব তখনও দাঁড়িয়ে আছে—তখন নিজেকে কতকটা সামলিয়ে নিয়ে বল্লেন, "মাধব শীত বস্ত্রগুলিত পেয়েছ, আর কি চাই ?"

"হুজুর কোন চিঠি দেবেন কি, কোন খবর এখানকার বল্‌বার আছে কি ?"

চিঠি ? হায় চিঠি ! প্রাণের সমস্ত কথা বল্‌তে গেলে যে সাতকাণ্ড রামায়ণের মত বই হ'য়ে যায়। এই ৫ মাস তিনি জ্ঞানদাকে দেখেন নাই, এর মধ্যে জ্ঞানদা কোন চিঠি লিখেন নাই—তিনি নিজেও

কিছু লিখেন নাই ; পাঁচ মাস পূর্ব্বে তিনি ভাবতে পারতেন না, পাঁচমাস কাল জ্ঞানদার খোঁজ না নিয়ে কি ক'রে তিনি থাকতে পারতেন। চিঠির কথায় বুক ফেটে তার একটা নিশ্বাস পড়ল, সেই নিশ্বাসটার ভেতর যেন একটা মহাকাব্য লিখিত ছিল, বিয়োগান্ত নাট্যের চূড়ান্ত কথা সেই নিশ্বাসটা ব'য়ে নিয়ে গেল। তিনি খানিকটা আবিষ্টের মত থেকে আবার চেয়ে দেখলেন, মাধব তাঁর উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। তখন লজ্জিত হয়ে তাকে বল্লেন—"না মাধব, আমার কোন চিঠি লিখবার কথা নেই। তুমি এই কাপড়গুলি নিয়ে যাও, দেওয়ানজীকে ব'ল আজই কলকাতায় লোক পাঠিয়ে আর একখানি কাশ্মীরি শাল আনতে হবে,—এই শীতের সময় হয় ত আমার শাশুড়ী-ঠাকরুণ কষ্ট পাচ্ছেন—তাকেও একখানি দেওয়া দরকার।"

মাধব চলে গেল।

সে রাত্রি কি দুঃসহ ব্যথা কিশোর রায়ের বুকে পাষাণ চাপা দিয়ে রইল। প্রজাদের চিন্তা—ষ্টেটের উন্নতি প্রভৃতি যে সকল বিষয় নিয়ে এ কয়েক মাস তিনি নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করতেন, তা বন্যার জলে খড় কুটোর মত ভেসে গেল। জ্ঞানদায়িনীর কথার জন্য যেন তার মন সিংহাসন পেতে রেখেছে, তার চিন্তা এলে আর সকল চিন্তা মাথা হেঁট করে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়।

"সে আরও সুন্দর হয়েছে, তার সেই অনিন্দ্য মুখখানি হাসির ছটায় উজ্জ্বল ক'রে সে কীর্ত্তন গায়"—এই ভাবতে কিশোর রায়ের মনে অব্যক্ত বেদনা হ'ল! হায়! যার মুখের একটি কথা আমার কাছে কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের ন্যায় অতি মহার্ঘ ;—তা শোনবার আমার সাধ্য নেই—তার গান অপরে শোনে। সকলেই ভাল ব'লে, মুগ্ধ হ'য়ে শোনে—আর আমি, সেই দুর্লভ সুখ হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে আছি।"

সারারাত্রি কিশোর রায় ঘুমোতে পারলেন না। তাঁর জন্য যে পত্নীর একটুও মমতা নেই, বরঞ্চ তার কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে যে তিনি অবাধ আনন্দে গা ঢেলে দিয়েছেন—এই চিন্তা তার মনে শেলের মত বিঁধতে লাগ্‌ল।

শয়ন ঘরের দক্ষিণের জানালা খোলা ছিল, সেখান থেকে কতক-গুলি রজনীগন্ধ ও কুন্দের সুঘ্রাণ বায়ু বহন করে আনতে ছিল। কিশোর রায় সেই ঘ্রাণ পেয়ে উতলা হ'য়ে উঠ্‌লেন, মনে হ'ল যেন অলঙ্কার পরে হাস্‌তে হাস্‌তে তার দেবীপ্রতিমা শয়ন প্রকোষ্ঠে আস্‌ছেন, তাঁরই অঙ্গ গন্ধে দিক মাতোয়ারা হ'য়ে উঠেছে।

মাধবের মুখে জ্ঞানদার আনন্দে থাকার কথা, তাঁর দৈহিক শ্রী আরও বাড়বার কথায়—কিশোর রায়ের মন স্ত্রীর উপর আরও শতগুণ বেশী আকৃষ্ট কর্ল। স্বাভাবিক ভাবে ত' ইহাতে বিরাগ ও ক্রোধ হইবার কথা থাকে, যাকে তার স্বামী একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন, সে কি করে পরের কাছে গান করবার মত মনের আনন্দ পেতে পারে? তার চেহারা কি ক'রে আরও ভাল হ'তে পারে? যে স্ত্রী এরূপ, স্বামী ত তার কথা ভাবতেও ঘৃণা বোধ করেন, কিন্তু ঘৃণার পরিবর্ত্তে একি অপূর্ব্ব আকর্ষণ! কিশোর রায়ের বুক ফেটে যেতে লাগ্‌লো। একবার তাকে দেখ্‌বার জন্য যেন তার চোখ দুটি ছটফট্ ক'রতে লাগ্‌লো। তিনি নিজের মনকে যতই বুঝোতে চেষ্টা করেন, ততই তাঁর মনের ব্যাথা বেড়ে যায়। সময় নাই অসময় নাই চোখ থেকে ঝরঝর করে জল বেরোয়, কথা ব'লতে গেলে কণ্ঠ-রোধ হয়—তিনি বুঝ্‌লেন, জ্ঞানদাকে ছেড়ে তিনি থাকতে পারবেন না। জ্ঞানদা ছাড়া সংসারের শোভা নাই, সুখ নাই, সান্ত্বনা নাই।

খাওয়া দাওয়া ও চোখের ঘুম একবারে গেছে, হাঁটতে হোঁচট খান। জমিদারী সংক্রান্ত কাজ কর্ম্ম নিয়ে দেওয়ানজি প্রায়ই দেখা করেন—কোনরূপে রাজাবাবু তাঁকে বিদায় ক'রে দিতে পারলে বাঁচেন। সর্ব্বদা নির্জনে থাকতে ইচ্ছা হয়—কেবলই চোখের জল পড়তে থাকে।

তার দিদিমা এই দুঃখের কারণ ঠিক অনুমান ক'র্লেন। জ্ঞানদা যে কোনরূপেই হউক তাঁর কোমল-চিত্ত নাতির মনে ঘা দিয়েছে, এটা তাঁর নিশ্চয় বোধ হ'ল। জ্ঞানদা যখন বাড়ীতে ছিলেন—তখন দিদিমা লক্ষ্য করেছেন—কিশোর তার কাছ থেকে কোন সুখ পায় নি। বধূ যেন তাঁকে সর্ব্বদাই উপেক্ষা ক'রে গেছে। উভয়ের মধ্যে যে একটা ভাবান্তর হ'য়েছে, তা' তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ্তে পেয়েছিলেন। একদিন অপরাহ্নে তিনি কিশোর রায়ের প্রকোষ্ঠে এসে তার বিছানার একপাশে বস্লেন। দিদিমাকে নিয়ে কিশোরের এ পর্য্যন্ত কত ঠাট্টা চাতুরী চ'ল্ত, দিদিমাকে দেখ্লে তার মুখে কথার ফোয়ারা ছুট্ত। কিন্তু আজ তাঁকে দেখে ম্লানভাবে একটু হেসে কিশোর রায় জিজ্ঞাসা ক'র্লেন—

"দিদিমা, ভাল আছ তো ?"

"তুই ভাল না থাক্লে আমার আর ভাল কি রে বোকা ?"

"কেন দিদিমা, আমিত বেশ ভালই আছি" ব'লতে যেয়ে তার কণ্ঠরোধ হ'ল।

দিদিমা বল্লেন, "আমাকেও ভাঁড়াচ্ছিস্, তোর মা ছোট রেখে মরে গেছল—আমি ত তোর সেই জায়গাটা এসে নিয়েছি। তোর মুখের দিকে একবার চাইলে আমি বুঝ্তে পারি, তোর ঠোঁটের হাসিটা কান্নার ছদ্মবেশ কি না। তুই সুখে আছিস্, কি দুঃখে আছিস্, তা' কি তোর দিদিমাকে কথা ক'য়ে বুঝুবিরে বোকা ? দিদিমা কি তা তোর মুখ দেখে বুঝ্তে পারে না ? তোর ক্ষিদে হ'লে তুই সন্দেশ খেতে চাস্, কি আম খেতে চাস্—না টকের দিকে লোভ পড়েছে, তা' তোর মুখ

দেখেই যে এতকাল আমি বুঝেছি। এখন তুই দশটা মিথ্যে কথা বলে অপরকে ভুলুতে পার্‌বি, দিদিমা তাতে ভুল্‌বে না। বউএর সঙ্গে ঝগড়া হ'য়েছে? তাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে মনে বড় দুঃখ হ'য়েছে,আন্‌তে পাঠাব? তোর যদি লজ্জা হয় আমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসি।"

কিশোর রায় দিদিমার স্নেহমধুর কথা শুনে হৃদয়াবেগ সাম্‌লাতে পার্‌লেন না,কেঁদে ফেল্লেন।

তার কান্না দেখে দিদিমাও কাঁদ্‌তে লাগলেন, এবং বল্লেন, "বউ বাপের বাড়ী গেছে—আস্‌বে, তারজন্য এত দুঃখ কিরে বোকা?"

কিশোরের কান্না থামে না। দিদিমার হাত দুখানি বুকের মধ্যে চেপে ধ'রে সে কি কান্না! দিদিমা চম্‌কে উঠ্‌লেন, তিনি বুঝ্‌লেন, সহজ দুঃখে তাঁর নাতির এমন কষ্ট হয় নি। তিনি বল্লেন, "আর একটা বিয়ে করবি পাগলা! বঁড়্‌শের সাবর্ণ চৌধুরীদের একটি মেয়ে সেদিন দেখে এসেছি, সাগরে স্নান করবার জন্য তার মা বাবা গিয়েছিলেন, সঙ্গে মেয়েটি ছিল। তার কি চমৎকার হাত পায়ের গড়ন, মুখের শ্রী! রংটি যেন পদ্ম ফুল ফুটে আছে, বিয়ে ক'র্‌বি? জমিদারের ছেলেরা তো মাঝে মাঝে দু'টো তিনটেও বিয়ে ক'রে থাকে। তাতে কি জ্ঞানদা চ'টে যাবেন? চটেন্ ত' নূতন বৌ গিয়ে তার পায়ে জবাকুসুম তেল মাখাবে, কতক্ষণ আর রেগে থাক্‌তে পার্‌বেন?"

কিশোর অশ্রুমুখে একটু ম্লান হাসি এনে বল্লেন "দিদিমা যে কি ছাই মাথা মুণ্ডু বলেন, তার ঠিকানা নেই।"

দিদিমা নিজের চোখের জল মুছে বল্লেন, "সত্যি বল্‌ছিরে পাগ্‌লা, মেয়েটি দেখে আমার বড্ড মনে ধরেছিল। তার মা বল্লেন 'ভরত তর্ক-রত্নের অদৃষ্ট দেখ, কেমন বিদ্যার বৃহস্পতি-রাজা—জামাই পেয়েছে, আমাদের বরাতে এ মেয়ে যে কোন্ ঘরে পড়্‌বে, তার ঠিক কি?' আমি

ঠাট্টা ক'রে বল্লুম, "কেন দশরথ থেকে সুরু ক'রে ত্রিপুরার রাজা পর্য্যন্ত সকলেই তো বহু বিয়ে করেছেন। আমাদের ছেলে একটা বিয়ে করেছে ব'লে কি আর একটা করতে পারে না? তোমরা দেবে?" মেয়ের মা বল্লেন "এই তীর্থস্থানে দাঁড়িয়ে বল্‌ছি, যদি তোমরা নেও তবে দেব।" মেয়ের বাপ বল্লেন "এমন সোণার ছেলে যদি দুইটে বিয়ে করতে চায়, সেত আর একটাকে গলাটিপে মারবার জন্য নয়।" এমন রাজার ঘরে সতীন পেলেও মেয়েটার ভাগ্যির সীমা থাকে না। হাসতে হাসতে এ কথা হ'ল। তুই মনে কি দাগা পেয়েছিস্ আমায় খুলে বল। আমি উপোস ক'রে মরব, যদি তুই মনের ভাব গোপন ক'রে গুমরে মরবি ও শুকিয়ে একটা খড় কুটোর মত বাতাসে হেলে পড়্‌বি।" এই বলে দিদিমা নাতির হাত দুখানি চেপে মিনতি ক'রে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কিশোর রায় বল্লেন "যে কোন দাগাই পেয়ে থাকিনা কেন, তোমার শোন্‌বার দরকার নাই, তবে এইটুকু জেনে রেখ, দশরথ রাজা এমন কি বাড়ীর কাছে ত্রিপুরার রাজার দৃষ্টান্ত দেখেও তোমার নাতির মাথা বিগড়বে না। যাও, আজ রান্না কর গিয়ে, অনেকদিন কিছুই খেতে রুচি হয় না, তোমার প্রসাদ নিরামিশ বড্ড ভাল লাগে, এবার থেকে তোমার কাঁচ কলা ও আতপ চালের ভাগি হব, তাতে যদি রুচিটা ফিরে পাই।"

দিদিমা দেখ্‌লেন, কিশোরের মনটা দুঃখের দিক হ'তে একটু ফিরে এসেছে। অনেক দিন তাঁর হাতের রান্না কিশোর খান্ নি। ছেলে বেলার মত ঐ আবদার শুনে তাঁর প্রাণটা গলে গেল। "আচ্ছা তবে রান্না করি গিয়ে, পেট ভ'রে খেতে হ'বে—তা না হ'লে ছেলে বেলায় যেমন আমায় আলো চালের ভাতের সঙ্গে চড় চাপড়টাও প্রসাদ পেয়েছ, আজও তার ব্যবস্থা করব।"

"আচ্ছা দিদিমা তাই ক'রো, তোমার কাছ থেকেই ত 'রাম চিমটি' 'শ্যাম চিম্‌টি' শিখেছিলেম, তা ফিরিয়ে দিতে আমিও কসুর করব না।"

"না আর পারা যায় না। এখন মাথার যে অবস্থা, হয়ত পাগল হ'য়ে যাব। পাগল হ'য়ে গিয়ে কি ছাই মাথা মুণ্ড বলে ফেল্‌ব, তাতে জ্ঞানদা লজ্জায় মরে যাবে, আমিত আর সইতে পারিনা। সে আরও সুন্দর হ'য়েছে!"

"ঘুমোতে ঘুমোতে তারে স্বপ্নে দেখে অনেক সময় ধড় ফড় করে উঠি, জেগেও দেখি সে পাশে বসে আছে, তাকে দেখে প্রাণটা বেদনায় অস্থির হ'য়ে যায়। এত কষ্ট আর সইতে পারি না।" কিশোর রায় এই ভাব্‌ছেন এবং এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন যে বিছানায় ব'সে থাকতেও কষ্ট হয়। দিদিমাকে তিনি কোন কথাই বলেন নাই, তথাপি বঁড়শের মেয়েটির কথা তিনি প্রায়ই উথাপন করেন; পূর্ব্বে করতেন, কৌতুক ও হাসি ঠাট্টার সঙ্গে, এখন করেন গম্ভীর ভাবে সত্যিকার বিয়ের প্রস্তাবের মতন করে। কিন্তু কিশোর রায়ও সত্যিকার সংকল্পিত দৃঢ় ভাবে বল্লেন "সে হ'তেই পারে না। যদি মরে যাই, তাও ভাল, দিদিমা ওকথা আর ব'ল না।"

একদিন রাজাবাবু রান্নাঘরের পাশে যেখানে চাকরাণীদের খাবার জায়গা, সেই খানটা দিয়ে অতিকষ্টে নিজের শোবার ঘরের দিকে আস্‌ছেন। তিনি যে হাঁটতে কষ্ট পান তা কেউ জানে না। যদিও দিনরাত শুয়েই থাকেন, তবুও লোক মনে ক'রে তিনি জমিদারী হ'তে অনেক কষ্ট ও শ্রম ক'রে এসেছেন, কয়েকটা দিন বিশ্রাম কচ্ছেন।

সেইদিন অপরাহ্নে রান্নাঘরের পাশটা দিয়ে যেতে দেখ্‌লেন, পার্ব্বতী ঝি খুব টক্‌টকে লাল একটা কাঁচা লঙ্কার রস দিয়ে ডা'লের সঙ্গে ভাত

মেখে, হাতের খাবার গ্রাসটি বেশ পাকিয়ে খেতে সুরু ক'রে দিয়েছে, সম্মুখে ডাঁটার চচ্চরি, তার এক একটা ডাঁটা সেই ডাল ভাতের পরিশিষ্টের মত মুখ-বিবরে যাচ্ছে, অদূরে একবাটী দুধ ও দুইটি চাটিম কলা সেই ভোজনের উপসংহার-লীলার সূচনা জানাচ্ছে। পার্ব্বতীর স্বামী হ'রে ও সেই বাড়ীতে কাজ করে। তাদের কোন ছেলে পিলে নাই। দুই-জনে সেই রান্নাঘরের সংলগ্ন একটা কোঠা বহুদিন থেকে দখল ক'রে দাম্পত্য জীবনটার প্রায় অর্দ্ধেক ভাগ কাটিয়ে দিয়েছে। এখন যে সময় পার্ব্বতীর ভোজন-লীলা উপসংহারের দিকে দ্রুতভাবে অগ্রসর হচ্ছে, এমন সময় বামা ঝি এসে বল্লে, "তুই তো খাচ্ছিস্, গ্যাখ্‌গে হ'রে ডাবা হাতে করে রেগে বসে আছে।" "কেন?" "তুই তাকে তামাক সেজে দিবি বলে সব ভুলে গেছিস এবং এসে ভাত খেতে বসেছিস্।" তখন "ও মাগো, আমার সবই ভুল হচ্ছে, আজ কাল"—এই বলে চাটিম কলা দুটো ও দুধের বাটীর প্রতি একটা লোলুপ দৃষ্টি ফেলে—ঐ দুই সামগ্রীর উপর একখান থালা ঢাকা দিয়ে, হাত ধুয়ে সে তামাক সাজ্‌তে গেল।

কিশোর রায় এই দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে শয়ন প্রকোষ্ঠে এসে শুয়ে পড়লেন। তখন অম্বর মেঘ-মেদুর, বাগান থেকে কেয়া ফুলের সুবাস আস্‌ছে এবং বহুদূর শ্রুত সেতারের গুণগুণ সুরের মত ভ্রমরের একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। দাম্পত্য-জীবনের সুখের জন্য কিশোর রায়ের মন ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌ল। তিনি কিছুতেই আত্মসংবরণ করতে পার্‌লেন না। "জ্ঞানদাকে না হ'লে মরে যাব, তাকে নিয়ে আসি" এই স্থির করে ফেল্লেন। এই সংকল্পের সঙ্গে যেন নব বল পেয়ে তিনি দ্রুতবেগে দোতালায় নেমে এসে বাইরে দেওয়ানজীর ঘরে গেলেন—শ্যামসুন্দর ঘোষ শশব্যস্তে উঠে এসে প্রণাম করে তার পাশে দাঁড়ালেন, বহুদিন রাজাবাবু দপ্তর-খানায় আসেন নাই।

তিনি বল্লেন "শ্যাম সুন্দর, আমি আজই নওয়া পাড়ায় যাব,—সব ঠিক্ ঠাক্ করে দাও।"

এই বলে আর অপেক্ষা না করে শয়ন ঘরে ফিরে এলেন। তখন তাঁর চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু পড়ছেও বুকের ভার হাল্কা হ'য়ে গেছে। যিনি বসে থাকতে শ্রান্ত হয়ে পড়েন, তিনি দিব্য স্ফুর্ত্তির সঙ্গে তার বড় হলটায় পায়চারি কর্ত্তে লাগ্লেন।

জ্ঞানদায়িনীকে রাজাবাবু ফিরে নিয়ে এসেছেন। আস্বার সময় তাঁর চিবুকে হাত দিয়ে সজল চক্ষে তার মুখের দিকে চেয়ে অতি স্নেহের সহিত তিনি বলেছিলেন "জ্ঞানদা তোমার ছেড়ে বড় কষ্ট পেয়েছি। যা, হ'য়েছে, হয়েছে। এবার ভাল হ'য়ে থেক, আমার আর কষ্ট দিওনা, বল ভাল হ'য়ে থাক্বে।" কিশোর মনে করেছিলেন এ কথায় অনুতপ্তা স্ত্রী সকৃতজ্ঞ-ভাবে হৃষ্টান্তঃকরণে সম্মতি দেবেন, কিন্তু জ্ঞানদা কাঠের মূর্ত্তির মত স্থির হ'য়ে বসে রইলেন, এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তিনি লজ্জায় কথা বল্তে পাচ্ছেন না, এই মনে করে বহু আদরে চোখের জল ফেলে তাঁর স্বামী আবার বল্লেন—"বল, জ্ঞানদা তুমি ভাল হ'বে—আমার কাণ জুড়োক" তথাপি জ্ঞানদা কিছু বল্লেন না—চুপটি করে ব'সে রইলেন।

বাড়ীতে এসে কিশোর রায় দেখলেন, নওয়া পাড়া থাক্তে বরং জ্ঞানদা কাছে ছিলেন, কারণ কিশোর রায় দুঃখের মধ্যেও নানারূপ সুখ-কর কল্পনা করবার সুবিধা পেতেন—কিন্তু নিজের কাছে এনে দেখেন - তাঁর স্ত্রী কত দূর দুরান্তরে। এক সম্রাটের রাজ্যের সমস্তটা হেঁটে গেলেও যেন তাঁর নাগাল পান না। এই ব্যবধানটা ক্রমেই উৎকট হ'য়ে উঠ্ল।

---

(৩০)

এর পরে আর ৭।৮ বছর চলে গেছে, জ্ঞানদায়িনীর ৩।৪টি ছেলে মেয়ে হ'য়েছে, কিন্তু তাঁর চরিত্র—শোধরায় নাই, বরং অবনতির দিকে আরও অনেকটা অগ্রসর হ'য়েছে।

কিশোর রায় প্রথম প্রথম উপদেশ দিয়ে তাঁর মনের গতি ফিরাতে চেষ্টা পেয়েছিলেন। এক এক রাত্রি জেগে তিনি জ্ঞানদার নিকট কত উপাখ্যান ব'লতে থাকতেন। কোন দিন টেনিশন পড়ে শুনাতেন। সামান্য সামান্য জায়গার মানে করে দিলেই জ্ঞানদা তা' বেশ বুঝতে পারতেন, কারণ রাজা রাজীব রায় তাঁকে ইংরেজী শিখিয়েছিলেন, তা পূর্ব্বেই বলা হ'য়েছে। টেনিসন থেকে কিশোর রায় গুইনিভিরের গল্পটি শুনালেন, সে জায়গায় আর্থার ভ্রষ্টা স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ ক'রতে ক'রতে তাঁর প্রতি স্বীয় গভীর ভালবাসা জানাচ্ছিলেন, গদগদ কণ্ঠে সেই স্থানটি নিজের হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে পড়িয়ে শুনালেন। কোন দিন "নিকলাস রো"এর 'ফেয়ার পেনিটেণ্টে'র গল্পের মর্ম্মোদ্ধার ক'রতে গিয়ে এবং এনি-কার্ণনিনার রেলপথে আত্মহত্যার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা ক'রতে করতে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। কখনও বা পুরাতন বাঙ্গলা বই হ'তে বেহুলার পাতিব্রত্য, মালঞ্চ-মালার ত্যাগ-স্বীকারের অপূর্ব্ব কথা উদ্দীপনার সহিত কীর্ত্তন ক'রেছেন, কিন্তু জ্ঞানদার নিকট সেই সকল কাহিনী কতকটা বিরক্তিকর বোধ হ'য়েছে—ঐ সকল গল্প বলার মধ্যে তাঁর চরিত্র সংশোধনের জন্য যে প্রচ্ছন্ন চেষ্টা ছিল, সতীত্বের দিকে টেনে নেওয়ায় যে গুপ্ত প্রয়াস ছিল সেটি জ্ঞানদায়িনীর মোটেই ভাল লাগত না। গল্প যখন নীতি-সঙ্কলনে বিশেষ ব্যস্ত হয়, তখন ভুক্তভোগীর নিকট তা' আর

গল্পের আকারে আসে না, সংমার্জ্জনীর তীব্রশলাকার মত হ'য়ে উপস্থিত হয়। জ্ঞানদায়িনী যে বিরক্তি বোধ ক'রতেন তা' কিশোর রায়ের বুঝ্‌তে বাকী থাক্‌ত না। কখন কখন তিনি সংস্কৃত রামায়ণ হ'তে রামের বিরহের অধ্যায়টি প'ড়ে শুনাতেন, সীতার শোকে অশন ও সপ্তপর্ণ ফুল শ্রীরামের চক্ষে কিরূপ শোভাহীন হ'য়ে গিয়েছিল, বৃক্ষের আড়ালে একটা ছায়াকে সীতা ভ্রম ক'রে রাম কিরূপ ব্যাকুল ভাবে ধর্‌তে গিয়ে বলেছিলেন "তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা ক'রে পালাচ্ছ—এ সময় তোমার পরিহাস করা উচিত নয়।" নিজে সাশ্রু চক্ষে সেই ব্যথার সম্পূর্ণ অনুভূতি প্রকাশ ক'রে কিশোর রায় এই অংশ প'ড়ে যেতেন; কখনও জুয়ান ও হ্যাডি্‌র প্রেমাখ্যান ডন জুয়ান হ'তে সংকলন ক'রে তার ব্যাখ্যা ক'র্‌তেন,—এগুলি জ্ঞানদায়িনীর কাছে ভাল লাগ্‌ত।

কিন্তু যতই চেষ্টা করুন না কেন—কিশোর তার স্ত্রীর মন পেলেন না। এর মধ্যে এক দাসী সেই বাড়ীতে ঝগড়া ক'রে চলে যাওয়ার মুখে তাঁকে গোপনে কতকগুলি কথা বলে গেল—যা তিনি কিছুতেই অবিশ্বাস করার সুবিধা পেলেন না। সেই কাহিনী শুনে স্ত্রীর সঙ্গে কথা কওয়া বন্ধ ক'রে দিলেন। দক্ষিণ দিক—যেখান দিয়ে তাঁর পিতৃকৃত একটি সুন্দর ঝিলের হাওয়া পদ্মের সুবাস সংপৃক্ত হ'য়ে প্রকৃতির প্রভাতী উপহারের মত তার জানালায় মৃদু আঘাত করত, সেই দিকে—যার পূবে ও পশ্চিম কয়েকটি সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের বাড়ী ছিল,—তিনি একটা প্রকাণ্ড প্রাচীর তুলে দক্ষিণা বায়ুর পথ রোধ করে ফেল্লেন। ইহার পরে ঝগড়া ঝাটি ক্রমে আরও বেশী চ'ল্‌তে লাগ্‌লো। জ্ঞানদায়িনীকে দোতলা হ'তে একতলায় নাম্‌তে হ'লে অনেক কৈফিয়ত দিতে হ'ত। মাঝে মাঝে তাঁর সাধের ফুলটি যাঁকে পারিজাত কুসুম মনে ক'রে তিনি মাথায় রাখ্‌তেন, তাকে কখনও কখনও

প্রহার ক'রে তিনি নির্জ্জন এক প্রকোষ্ঠে বসে কাঁদতে থাকতেন। সেই ঝির কথিত কাহিনী এত উৎকট ও ঘৃণ্য ছিল, যে তিনি বিষয়টি যতই ভাবতে লাগলেন, ততই উত্তেজিত ভাবে নানারূপ উপায় মনে মনে উদ্ভাবন ক'রতে চেষ্টা পেলেন, কি করে তাঁর এত সাধের পত্নীকে হীনতা হ'তে উদ্ধার করবেন। জ্ঞানদা এখন নিশ্চয় বুঝলেন, তার স্বামীকে মিথ্যা কথা বলে আর প্রবঞ্চনা ক'রতে পারবেন না। তিনি সকল কথা জেনে ফেলেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত চতুরতার সহিত গৃহের সকলের নিকট স্বামীর অত্যাচারের কথা অত্যন্ত বাড়িয়ে ব'লতে সুরু ক'রে দিলেন এবং প্রায়ই চোখের জল ফেলে নানারূপ মিথ্যা কথা বলে তিনি যে সাধ্বী তার প্রমাণ দিতে লাগলেন। কিন্তু চারিদিক হ'তে গৃহের সকলে যখন রাজা বাবুকে এজন্য নিন্দা করতে লাগল এবং তিনি এরূপ কেন কচ্ছেন, আত্মীয়েরা তার কৈফিয়ৎ চাইতে সুরু ক'রে দিলেন, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে কোন কথাই বল্লেন না, বরং ছোট কাল হ'তে আব্দার পেয়ে যে তাঁর একটু খামখেয়ালী ধরণের মেজাজ হ'য়েছে—এই কথাই আভাসে বুঝালেন; তাঁর নিজের সম্বন্ধে যে যা' বলুক তা' তিনি হাসি মুখে সইয়ে নেবেন—কিন্তু জ্ঞানদা সম্বন্ধে বাইরের লোকে যদি কিছু বলে তা' তিনি কিছুতেই সইতে পারবেন না।

জ্ঞানদা এখন বুঝতে পারলেন—তার স্বামী কিছুতেই তা'কে ছাড়তে পারবেন না। সুতরাং তিনি অত্যন্ত প্রশ্রিত হ'য়ে উঠলেন, এমন কি পরের মুখে শুনে স্বামীর ভালবাসা সম্বন্ধেও তাঁর মুখের উপর কঠোর মন্তব্য প্রকাশ ক'রতে লাগলেন। কিশোর রায় তাঁকে কিছুমাত্রও ভালবাসেন না,—এই ছিল তাঁর ধ্রুব ধারণা। নিজের মন প্রেমশূন্য হ'লে আমরা এইরূপ ভাবেই পরের বিচার ক'রে থাকি।

জ্ঞানদার দুইটি পরিচারিকা ছিল। তাদের তিনি অনেক টাকা দিয়ে বশীভূত ক'রেছিলেন। তারা প্যাঁচার মত রাজ-বাড়ীর লক্ষ্মী ঠাকরুণের গুপ্ত উদ্দেশ্যের সহায়তা করত। এই সকল ব্যাপারে জ্ঞানদায়িনী এতই নিপুণতা অর্জ্জন করেছিলেন, যে তিনি সাধারণত সাধ্বী স্ত্রী বলেই সকলের নিকট খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

এইরূপ ভাবে কিশোর রায়ের দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। কখনও তিনি বৈঠকখানা হলের জানেলা খুলে বহুদূরে গরু গুলির সহিত রাখালদেরে দেখ্‌তেন এবং মনে মনে করিতেন, "হায় সমস্ত জমিদারী ছেড়ে দিয়ে যদি আমি ঐ সাঁওতাল রাখালদের একজনের মত প্রফুল্ল চিত্তে বাঁশী বাজাতে পারতুম্!" কখনও রাজ-বাড়ীর অতি কুৎসিত বিকট-দন্ত রমা বুড়ীকে দেখে ভাবতেন, যদি আমার বিবাহ এর সঙ্গে হ'ত, তবে বুঝি আমি প্রকৃত দাম্পত্য সুখ বুঝ্‌তে পারতুম; এ আমাকে ছাড়া নিশ্চয়ই আর কারুর প্রতি অনুরাগী হ'ত না।"

একদিন জ্ঞানদায়িনীর ব্যবহারে নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হ'য়ে প্রকৃতই তার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হ'ল। "আর এই সৌন্দর্য্যের কালকুট আমি পান ক'র্‌তে পারি না, আর এই রূপের নরক-কুণ্ডে আমি বাস ক'র্‌তে পারব না—মরতে বসেছিলেম মর্ত্তুম, কেন এঁকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডেকে আন্‌লুম। এই বাড়ীর ছেলেরা কি দুর্ভাগা! আমার এই হীন-প্রকৃতি-পুরুষের অযোগ্য সহিষ্ণুতার দরুণই সমস্ত অনর্থ ঘটেছে—এ বাঁধ আমি ছিন্ন ক'র্‌ব।"

এই নিদারুণ অবস্থা-চক্রে পড়ে তিনি যে কত কেঁদেছেন, কত রাত্রি অনিদ্রায় কাটিয়েছেন, কতদিন খেতে বসে চোখের জল ফেলে ভাতের থালা ফেলে উঠে গেছেন—আত্মহত্যার সংকল্প পর্য্যন্ত ক'রেছেন—সকল কথা মনে হ'ল, তখন মনে ব্যাকুলভাবে আশ্রয় খুঁজ্‌তে লাগল। "কে আছে

আমার ? কে আমার কাছে জ্ঞানদার মত রূপ নিয়ে আসবে ? এত যে কষ্ট দিচ্ছে, তবু ওর মুখখানি যেন স্নেহের খনি, ওর কপালের ধারে ধারে কোঁকড়ান চুল, স্নেহকরুণা গঠিত অধর,—এ যে আমার মনের নন্দন-কানন ; সহস্র অত্যাচারের ঝটিকাও যে আমার এই আশ্রয় ছিন্ন করতে পারে না। আর কেউ এইরূপ আশ্রয় হ'য়ে এস, এরূপ সত্তা হ'য়ে এস, আমি তাঁর পায়ের তলায় মাথা বিকোব—তাকে চোখে চোখে রাখব, উপোস করে, ব্রত ক'রে, কঠোর করে তার আরাধনা করব। আরাধ্য কেউ এস, আমার মনের কেল্লা জোর করে দখল কর, যেরূপ জ্ঞানদা করেছে।" যুক্তকরে কিশোর এই প্রার্থনা করতে লাগ্‌লেন। হঠাৎ সিন্দুর-তলায় তাঁর পিতৃপুরুষ প্রতিষ্ঠিত দেব-দেবীর কথা মনে পড়্‌ল। সেখানে কি কোন শান্তি পাওয়া যেতে পারে ?

এমন সময় বড় দুঃখে আর একটি কথা স্মৃতিতে উপস্থিত হ'ল। "একদিন যে সাধু পুরুষ আমায় আসন্ন মৃত্যু হ'তে রক্ষা ক'রেছিলেন—তাঁকে গিয়ে বলি, যে ভরা নদীর জলে ডুব্‌তে ডুব্‌তে আপনার কৃপায় রক্ষা পেয়েছিল—তা যে আবার ডুববার মুখে,—এবার কি রক্ষা করবেন না ?" সেই সাধুর কথা ভারি মিষ্ট, প্রায় ৮।৯ বৎসর চলে গেছে, কিশোর রায়ের স্মৃতিতে তার মুখখানি এখনও স্পষ্টরূপে আঁকা ছিল। তিনি মনে করলেন, "আর কোথাও জুড়োবার স্থান নাই, আমি তাঁর কাছেই যাব।"

এই সংকল্প স্থির করে পরদিন বৃন্দাবন রওনা হ'য়ে গেলেন।

———

(৩১)

কানপুর ষ্টেশনে এসে রাজা বাবু একবার গাড়ী হ'তে নেমেছেন সেখানে গাড়ী ২৫ মিনিট দাঁড়ায়। কেউ পানি পাঁড়ে বলে চীৎকার কচ্ছে, লোকজন ছুটো ছুটি কচ্ছে। একটা ছেলে গোগ্রাসে কতকগুলি নিম্‌কি খাচ্ছে, তার বাবা ঠোঙ্গাটা হাতে করে বল্‌ছেন—"চ—গাড়ীতে গিয়ে খাবি।" একজন হিন্দুস্থানী দরোয়ান তার ইয়া গাল পাট্টা দাড়ি ঘেঁষে দুটি হাত অঞ্জলির মত ক'রে পানি পাঁড়ের দেওয়া জল খাচ্ছে, আর এক গাড়ী হ'তে একটা খোট্টা মহিলা—তার সাদা আলোয়ানের ঘোমটার মধ্য হ'তে কৌতূহলপূর্ণ চাউনি দিয়ে—সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখ্‌ছে। রাজা বাবু এই সকল অন্য মনস্ক ভাবে দেখ্‌ছেন, আর পায়চারি কচ্ছেন। আকাশে মেঘ নির্ম্মিত অট্টালিকা থাম, এবং অপরাপর ছবিগুলি যেমন মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তিত হয়, ষ্টেশনের দৃশ্যগুলি তেমনি দ্রুত ভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে।

হঠাৎ রাজাবাবু দেখতে পেলেন, হ্যাট কোট পরা একটি প্রৌঢ় বয়স্ক শ্যামবর্ণ ভদ্রলোক' একটা গ্লাডষ্টোন ব্যাগ হাতে করে, অপর হাতে ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে একটি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা লক্ষ্য ক'রে তীরের মত ছুটে চলেছেন। তিনি হয়ত ভুলে গেছেন, গাড়ী সেখানে আরও দশ মিনিট দাঁড়াবে।

রাজাবাবু আরও খানিকটা ঐ ব্যক্তিটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর দ্রুতপদে তার পেছন পেছন গিয়ে আস্তে তার কাঁধে হাত দিয়ে বল্লেন,—"গাড়ী তোমায় ফেলে যাবে না ভাই,—তুমি একটা ডিপুটি,—তোমার নিজের শক্তিটা ভুলে যাচ্ছ, প্রভু।" পেছন ফিরে

ইনি রাজাবাবুকে দেখে বল্লেন, "কিশোর যে? রাজার বেটা রাজা, তোমার হুকুম কি ডিপুটির চেয়ে কম? আমরা গরীব ডিপুটিরা তো তোমার চাকরের যোগ্য।"

কিশোর জিজ্ঞাসা কল্লেন, "শ্রীশ• কোথায় যাবে? আমি বৃন্দাবন যাচ্ছি।"

"বুড় হয়ে এলে ৪০এর কোটা ছাড়িয়েছে—এখন তীর্থের প্রতি নজর পড়েছে। আমি ভাই আগ্রায় যাব। সে অঞ্চলে সম্প্রতি কোর্ট অব ওয়ারড্‌সের ম্যানেজার হয়েছি।"

"বেশ তা হলে ৬।৭ ঘণ্টা একত্র যাওয়া যাবে, এখন রাত ১০টা, ৫—৬০এ গাড়ী আগ্রায় যাবে। চল, আমার কামরায়, সেকেণ্ডক্লাসে আজ বড্ড ভিড় দেখ্‌ছি, আমার ফাষ্টক্লাস রিজার্ভ আছে।"

দুই বন্ধু গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লেন, এঁরা প্রেসিডেন্সী কলেজে এল, এ হতে এম, এ পর্য্যন্ত এক সঙ্গে পড়েছিলেন। কিশোর রায় অত্যন্ত কষ্টে সময় কাটাচ্ছিলেন,—ছোট বয়সের বন্ধুকে পেয়ে বড়ই প্রীত হলেন।

দুজনে বসে নানা কথাবার্ত্তা চল্ল। কিশোর রায় বল্লেন, "রাম বাড়ুয্যের খবর কি? সে তো গিরিপুর ষ্টেটের ম্যানেজার হ'য়েছিল।"

শ্রীশ···"তার আর খবর কি ভাই! সে মনে করে তার তুল্য বুদ্ধিমান পৃথিবীতে নাই। গিরিপুরের রাজা এক ছোক্‌রা—রেমো আগে তার মাষ্টার ছিল, সুতরাং রাজা স্বয়ং যার ছাত্র,—পৃথিবীতে তার মত পণ্ডিত আর কে থাক্‌তে পারে? এই তার বিশ্বাস। রাজাকে গ্যাসন্যাল কলেজের জন্য ছয় লাখ টাকা দিতে কবুল করিয়েছে। এ দিয়ে নাকি বিশ্ববিদ্যালয় খুলবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কি রকম হবে, তার একটা scheme নিয়ে সে যত বড় লোকের সঙ্গে দেখা করে বেড়াচ্ছে। রবিবাবু, নিবেদিতা, গগনবাবু প্রভৃতি সকলের

কাছে গিয়েছিল। তাঁদের একজন আমায় বলেছেন, যে রেমো তাঁদের কোন কথাই বল্‌তে দেয় না—নিজে প্রায় দু ঘণ্টা বক্তৃতা কর্‌বে,এরা যদি তাঁর মধ্যে কিছু বল্‌তে যান—তবে "একটু অপেক্ষা করুন, আমার কথা ফুরায় নি।" এই বলে মুখে থাবড়া মেরে অনর্গল বক্তৃতা করতে থাকে। আমাদের তো ভাই আমলই দেয় না। সে বল্‌বে,আমরা চুপটি ক'রে শুন্‌ব, এই সম্বন্ধ। শুধু তাই নয়, তার অভ্রান্ত মতগুলি আমাদের বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে হ'বে, বাইরে মাতব্বরি করলেও ভেতরটা কোমল আছে, গিন্নিকে জুজুর মত ভয় করে। লম্বা লম্বা দাড়ি রেখেছে কথা বল্‌তে গেলে সেগুলি দুল্‌তে থাকে।"

কিশোর রায় হেসে বল্লেন, অঙ্ক কষতে গিয়ে ফলটা কিছুতেই মেলে না, তবুও বুথ সাহেবকে বল্‌ত যে তার processটা right। বুথ সাহেব ক্ষেপে গিয়ে তাকে একবার ৫৲ টাকা জরিমানা করেছিল, তোমার মনে নাই।"

শ্রীশ···"হ্যাঁ গো মনে আছে।"

কিশোর···"পূর্ণ রাউতটি তোথায়? ক্লাসে অবসরের ঘণ্টায় আমরা লাইব্রেরীতে গিয়ে নাটক, নভেল ও কবিতা পড়তুম। আর পূর্ণ রউত লগারেথেম, সিন থেটা, কস্ থেটা প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তক নিয়ে সেই গুলিই তার অবসর-রঞ্জিনী বিদ্যা মনে ক'রে ধীরে ধীরে পাতা উল্টোতে থাকত। সে বরিশালে একটা কলেজে প্রফেসার হ'য়েছে, তার অটুট গাম্ভীর্য্য এখনও ভাঙ্গে নি। এক দিনে একটা রেলওয়ে ষ্টেশনে খাবার কিছু না পেয়ে আমি কিছু ছোলা ভাজা, ও মটর ভাজা কাচা লঙ্কা দিয়ে খাচ্ছিলুম—পূর্ণ তখন কাছে এসে মটর ভাজা চিবুতে লাগ্‌ল, মুখে শব্দ নেই, একটু হাসি নেই, যেন বীজগণিতের অঙ্ক কষছে।"

কিশোর হেসে বল্লেন "যা, বল ভাই, বলিহারি বিপিনকে, এত

গুলি লোকের রান্না রেঁধে এণ্ট্রান্সে ২০৲ টাকার বৃত্তি মেরে দিলে। তারপর রুড়কি থেকে প্রথম হ'য়ে, কাশীতে বড় ইঞ্জিনিয়ার হ'য়েছে—সরকার থেকে 'রায়বাহাদুর' খেতাব পেয়েছে। কি মিষ্ট স্বভাব, আমি যে তার পিঠে কত কিল মেরেছি, তবুও বই থেকে চোখ তোলে নি, অসহ্য হ'লে বলেছে—"কিশোর, হ'য়েছে, এখন থাম্।"

শ্রীশবাবু বল্লেন, "তোমার ইয়াছিন আলি ও ওহিদুদ্দিনকে মনে আছে?"

কিশোর…"মনে আর নেই! ওহিদুদ্দিন ছিল সাহেবের বড় প্রিয় ছিল, একদিন বৃষ্টির দরুন কলেজে আসতে দেরী হয়েছিল, আর হিল সাহেব বলেছিলেন "Ohiduddin, did you melt in the way? ওহিদুদ্দিন, তুমি কি রাস্তায় গলে পড়েছিলে?"

কিশোর রায় হাসতে হাসতে বল্লেন "ভাই, ইয়াছিনআলি মুসলমান ধর্ম্ম মানত না। আমায় প্রায়ই বলত, "তোদের ব্রাহ্মধর্ম্মটা খুবই ভাল, কিন্তু মুসলমান ব্রাহ্ম হ'লে ব্রাহ্ম মেয়েরা সাদি কর্ত্তে চায় না, মুখে এক কথা, কাজে অন্যরূপ!"

দুই বন্ধু খুব হাসতে লাগলেন; কিশোর রায় শ্রীশ কাঞ্জিলালকে পেয়ে যেন আবার নূতন যৌবন ফিরে পেলেন। তার গলা জড়িয়ে ধ'রে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন।

গল্প স্রোত নানাদিকে প্রবাহিত হ'ল, বিবাহ পদ্ধতি নিয়ে কথা হ'ল। শ্রীশ বল্লেন, তাঁকে খুলনার ম্যাজিস্ট্রেট রোজবাড়ি সাহেব বলেছিলেন, হিন্দু বিবাহই সব চাইতে ভাল বিবাহ। "ত্যাগ করায় সুবিধা দিলে স্ত্রীলোকদের কায়দা করা বড় কঠিন হয়। কি বল কিশোর? তোমার মতের সঙ্গে ভারি মিলে গেছে। কলেজে তুই তো "হিন্দু বিবাহ পবিত্র হোমাগ্নি সাক্ষী করে। তা' দুদিনের

সম্পর্ক নয়, আজ এটা ছেড়ে কাল ওটা ধরা নয়—ধর্ম্ম হচ্ছে তার ভিত্তি, দাম্পত্য প্রেম হিন্দুর চক্ষে সুমহান ব্রত, বিবাহের বাসর হিন্দুর চক্ষে দেবমন্দির ইত্যাদি ইত্যাদি" কত কি হাত নেড়ে নেড়ে ঘাড় হেলিয়ে ব'কে যেতিস্। রোজবাড়ির কথা শুনে আমার তোকে মনে পড়্ছিল।''

কিশোর…আমার ভাই মত উল্টে গেছে,—ডাইভোর্স (তালাক্) দেওয়াটা না থাকায় হিন্দুর সংসারে অনেক অশান্তি হ'য়েছে।"

শ্রীশ…"সে কি বলিস্? তুই এতটা এগিয়ে এসেছিস, বাহাবা! —কিন্তু একজনের সঙ্গে পাকাপাকি ভাবে সারা জীবন কাটাতে হ'বে, এটা জান্‌লে ঘরটায় অনেক পরিমাণে শান্তি বজায় থাকে। হিন্দুস্ত্রীর পবিত্রতা জগৎ প্রসিদ্ধ।"

কিশোর…"যখন সমাজে প্রথম বিবাহ-বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ১০।১২ রকমের প্রণালীকে হিন্দুরা মেনে নিয়েছিলেন। যথেচ্ছাচারের স্থলে বাঁধা বাঁধি নিয়ম হ'য়ে গেল, কিন্তু জোর ক'রে ধরে নেওয়া, গোপনে পরস্পরকে ভালবাসা—ইত্যাদি অনেক রীতিই বিবাহের অঙ্গীয় বলে স্বীকৃত হ'ল। তারপর সতীত্ব ধর্ম্মকে খুব বাড়িয়ে দেখান হ'ল—যাতে ক'রে বিবাহ বন্ধনটা বেজায় শক্ত হ'তে পারে। 'জাতক' গল্প গুলিতে দেখা যায় তখন বিবাহের রীতি ছিল, কিন্তু সতীত্ব ধর্ম্মের উপর ততটা জোর দেওয়া হয় নি। কুশজাতকে দেখা যায়, রাজার ছেলে না হওয়ায় তিনি শীলাবতী রাণীকে ৭ দিনের জন্য পত্নীত্ব হ'তে রেহাই দিয়েছিলেন। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে গিয়ে রাণী পুত্রবতী হ'য়ে ফিরে এলেন, তখন শঙ্খ, ঘণ্টা কাঁসর বাজিয়ে তাঁকে পুনরায় গ্রহণ করা হ'ল। ক্ষেত্রজ পুত্র সম্বন্ধে অনেক পৌরাণিক গল্প জানি।

"সুতরাং যদিচ বিবাহ পদ্ধতি হ'য়েছিল—তার ভেতর অনেকটা শিথিলতা ছিল—যাতে ক'রে স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের নির্ব্বাচনের সুবিধে দেওয়া হ'ত। কিন্তু এখন ত সকল রাস্তা সঙ্কুচিত হ'য়ে গলার দড়ি একটা মাত্র কড়িকাঠে ঝুলান হচ্ছে।"

শ্রীশ…"বলিস্ কিরে পাগ্‌লা, এক স্বামীর প্রতি অটল শ্রদ্ধা রেখে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হওয়া মানে গলার দড়ি একটা কড়িকাঠে ঝুলান না কি রে ?"

কিশোর। "কেবল বৃথা ব'কে যাস্‌না। আমাদের সমাজটা ছাখ্। বিবাহের দড়ি যতই এদিকে কষছি, অশান্তি ততই বেড়ে যাচ্ছে। কত প্রতিভা নষ্ট হয়ে গেছে, কারণ চিরকাল একটা অনিচ্ছার দায়িত্ব তাদের কাঁধে বয়ে নিতে হ'য়েছে। কত শ্রী হীনশ্রী হ'য়েছেন, কেননা তাঁদের মাথার উপরে যে দেবতারা আসন পেতেছেন, তারা দেবতা নন্, পিশাচ। তাই একটা নির্গমের পথ রাখা ভাল। মুসলমানেরা যে এত গোঁড়া, যাঁরা স্ত্রীলোককে অন্দরে আটকিয়ে রাখেন এবং তাঁরা যখন রাস্তায় বার হ'ন তখন একটা কাপড়ের অন্দর শুধু পায়ের আঙ্গুল কয়টি বাদ রেখে, আর সবটা শরীর ঢেকে রাখে—এমন মুসলমানেরা ও ত তিনবার 'তালাক' বল্লেই ছাড় পান, কিন্তু হিন্দুরা যে যাকে একবার ধরেছেন, ছুঁচোর ইন্দুর গেলার মত সেটাকে নিয়ে সারা জীবন হাঁস্ ফাঁস্ করে গলাধঃকরণ কর্‌তে চেষ্টা পাবেন।"

শ্রীশ বাবু বল্লেন "তুই ক্ষেপে গেছিস্, এখনও ষ্টাটেশটিক্ নিয়ে ছাখ্, অন্যান্য দেশের স্ত্রীলোক হ'তে হিন্দু রমণীরা বেশী পবিত্র।"

কিশোরে…"ও পতিব্রতা আমি মানিনা। দশবার করে নাওয়া, একটা ভাত কাপড়ে লাগ্‌লে একশবার কাপড় কাচা, অথচ এদিকে দ্বেষ ঘৃনা ও কুসংস্কার দিয়ে নিজেকে একটা হিংস্রপশু তৈরী করে রাখা, এর

মধ্যে পবিত্রতা কি? শুধু দেহটা কাউকে ছুঁতে দেব না, এই হলেই বুঝি হ'ল?"

শ্রীশ…"যা হোক, বাবা, তুই একবারে ক্ষেপে গেছিস্! তোর মতে এ ব্যাপারটা কি রকম করে চালাতে হবে?"

কিশোর…"শোন, তুই তিন বছরের চুক্তিতে বিয়ে হ'ক। বিলাতে অনেক এই মত প্রচার কচ্ছেন। তারপর যদি স্বামী স্ত্রী উভয়ে উভয়কে চান, তবে চুক্তির সময় বেড়ে যাক্। এ রকম হলে সীতা-সাবিত্রী হ'তেও আট্‌কাবে না, সারা জীবনের পত্নীব্রত বা স্বামীব্রত চলতে পারবে, অথচ গলার হারটা যদি ফাঁসির দড়ি ব'লে বোধ হয়, তা হলে যখন ইচ্ছা সেটা খুলে ফেলা যেতে পার্‌বে। বর্ত্তমান নিয়মে বহুলোক কষ্ট পাচ্ছে। বহু-লোকের যাতে মঙ্গল হয়, সমাজের সেইরূপ বিধি প্রণয়ন করা উচিত। ছেলেরা কতকটা সময় মায়ের কর্‌ছে থাক্‌বে, ধর ৪।৫ বছর। তার পর তাদের ভার ষ্টেট্ নেবেন। মা বাবা ছেলেদের জীবনের লক্ষ্য নির্দ্ধারণের ঠিক যোগ্য নন্, কারণ স্নেহ তাহাদিগকে অন্ধ ক'রে রাখে, অনর্থক ভয় ও দুশ্চিন্তা তাদের পক্ষে ছেলেদের প্রকৃত কল্যাণ নির্ণয়ের অন্তরায় হয়। এজন্য পূর্ব্বকালে অতি শৈশব পার হ'য়ে ছেলেরা ঋষির আশ্রমে যেতেন। যাঁরা শিক্ষা দেওয়ার যোগ্য, তাঁদের অভিভাবকতাই ছেলেদের পক্ষে ভাল। যাঁরা শুধু মমতার কূপে তাদেরে ফেলে রাখ্‌বেন, তারা তাদের ইষ্ট-সাধক নন্। ষ্টেটের হাতে ছেলেরা থাক্‌লে উপযুক্ত শিক্ষকগণ বুঝ্‌তে পার্‌বেন, কোন্ ছেলেটি কোন্ বিষয়ের যোগ্য, এবং তাঁরা তাদের সেইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা কর্‌বেন। তা হ'লে যে উৎকৃষ্ট ইঞ্জিনিয়ার হ'তে পাবে, তাকে ঠেলে নিয়ে স্কুলমাষ্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত করা হবে না, এবং সেখানে তাকে অযোগ্য ব'লে লাঞ্ছনা দেওয়ার সুযোগ থাক্‌বে না। যে ব্যক্তি শিল্পকলার অদ্বিতীয় হ'তে পারেন, তাকে উকিল বানিয়ে তার অকর্ম্মণ্যতা

প্রতিপন্ন ক'রে তার জন্য মায়া কান্না কাঁদতে হ'বে না। প্রত্যেকের মধ্যেই কোন না কোন গুণ আছে, তা' আবিষ্কার ক'রে বিকাশ করাই হচ্ছে সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য। ষ্টেটের হাতে ভার থাকলে এটি অনায়াসেই হ'তে পারবে। প্রত্যেক বাপ মা সরকারের চাঁদা দেবেন, এই দায়িত্ব নেওয়ার পক্ষে তা হ'লে সরকারের আর্থিক অন্তরায় উপস্থিত হবে না।"

শ্রীশ বাবু বল্লেন—"মানুষের sentiment বলে ত একটা জিনিষ আছে। যে দেশে সীতা-সাবিত্রী স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি দেখিয়ে আদর্শ হ'য়ে আছেন,—ভরত,লক্ষণ,ভীম প্রভৃতি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে অমর হয়েছেন,—এমন কি যেথানে হনুমান প্রভৃতি শুধু স্বীয় প্রভুর আজ্ঞাকারী হ'য়েই জীবনের চরম স্বার্থকতা লাভ করেছেন, এই স্নেহ-শীতল সিদ্ধিপ্রদায়ী পারিবারিক জীবনটার মুখে আগুন দিতে চাস্ বুঝি? এতকাল রামায়ণ প্রভৃতি গ্রন্থ যা' শিখিয়ে এসেছে এখন বুঝি তার উল্টো গান গাইতে হবে?"

কিশোর···"ওসব sentiment মানিনা। sentimentগুলি লোকের কষ্টের কারণ বই আর কিছুই নয়। পারিবারিক গণ্ডী ছেড়ে এখন জাতীয় গণ্ডীতে পা' দেবার সময় হয়েছে। শিশুর জামা যেমন সে বড় হ'লে আর তার গায়ে লাগেনা, তেমনই রামায়ণাদির শিক্ষা হ'তে উচ্চতর শিক্ষা চাই, এখনকার উপযোগী করে শিক্ষা দিতে হবে।"

শ্রীশ বাবু হেসে বল্লেন "তোর মত কয়েকটা শিক্ষক হ'লেই দেশ উদ্ধার হ'য়ে যাবে আর কি! তোরা কিছু গড়্তে পারবি নি, ভাঙ্গবার হাতুড়ির ঘা ক'ষে মার্তে পরবি, সে সম্বন্ধে সংশয় নেই।"

কিশোর রায় বন্ধুর হাতটি ধ'রে বল্লেন "এ যেন আবার সেই কলেজে পড়ার সময় ফিরে এল! ত্থাখ্ দেখি দেড় ঘণ্টাকাল আমরা একটা খেয়াল

নিয়ে তর্ক ক'রে কাটালেম! এ সকল যাক, তুই একটা গান গা; তোর গান কতবার শুনেছি, তা এখনও ভুলতে পারিনি।"

শ্রীশ···"রেলের ঘর্ঘর শব্দে গান কি শোনা যাবে? আর কি গান গাব বল্ দেখি।"

কিশোর···"সেই যে যতন করিতে তারে' আগে গাইতিস্, সেই গানটা গা।"

তখন শ্রীশ বাবু গাইলেন :—

"যতন করিতে তারে বাকী কি রেখেছি আমি!
আপন স্বভাব দোষে সে হ'ল কুপথ-গামী।
তারে ভালবাসি কেমন, সে জানে আর জানে মন
আর জানে সেইজন যেজন অন্তরযামী।"

শ্রীশ বাবুর কণ্ঠস্বর বড়ই মধুর। গান শুনে কিশোর রায়ের চোখ দিয়ে জল পড়্তে লাগ্ল, তিনি রুমাল দিয়ে মুখ মুছ্লেন। শ্রীশ বাবু বল্লেন, "সেই ছোট বেলার মতই দেখ্ছি মনটা কোমল আছে, এখন বুড়ো হ'তে চল্লি তবু প্রেমের গান শুনে চোখ দিয়ে জল পড়ে।" নিধু-বাবুর গান কিশোর রায় বড় ভালবাস্তেন। আবার তাঁকে আর একটি গান গাইতে ধরে বস্লেন। শ্রীশ বাবু গাইতে লাগ্লেন :—

"প্রেমে কি সুখ হ'ত।
আমি যারে ভালবাসি, সে যদি ভালবাসিত।
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক বিনে,
ফুল হ'ত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত।"

এ গানটিও কিশোর মুগ্ধভাবে শুন্লেন এবং বন্ধুর প্রতি জিজ্ঞাসুভাবে চেয়ে বল্লেন—"আমার মনে হয়, প্রেম করে কেউ প্রতিদান পায় নি; এইজন্য অসম্ভব জিনিষটা যে কত মহার্ঘ, তাই একটার পর একটা উপমা

দিয়ে নিধুবাবু বুঝতে চেষ্টা পেয়েছেন। পলাশের ফুল কি কথনও সুগন্ধ হয়? কাঁটা ছাড়া কেয়াফুল কেউ কি কখন দেখেছ? চন্দন গাছে কখনই ফুল হবাব নয়; ইক্ষুর ফল আকাশকুসুম। এর মানে—ভালবাসার প্রতিদান আশা করাও সেইরূপ অসম্ভব ব্যাপার। তার মানে, ভালবাসা একটা ঝড়ের মত। এ যার হৃদয়ে আসে, অপরের আগ্রহ তখন সেই প্রবল বেগের সাম্নে কতকটা জুড়িয়ে যায়।"

এই ব'লে কিশোর রায় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে থাম্‌লেন।

শ্রীশবাবুর মনে একটা আশঙ্কা হ'ল—সরল-চিত্ত কিশোর সংসারে কি যেন ঘা খেয়ে পারিবারিক পবিত্রতাটাকে কিছু নয় ব'লে উড়িয়ে দিচ্ছে। দুই জনের মধ্যে যে ভালবাসা থাক্‌তে পারে সেটাও একটা অসম্ভব কাণ্ড ব'লে মনে কচ্ছে।

শ্রীশ বাবুও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—

"কিশোর তোমায় তোমার বউ কেমন ভালবাসে?" অকস্মাৎ এই প্রশ্ন শুনে কিশোর রায় চম্‌কে উঠ্‌লেন। তাঁর ইচ্ছা হ'ল তিনি শ্রীশের পায়ে পড়ে লুটপটি হ'য়ে কেঁদে তার মনের ভার লঘু করেন।

এই সময় হুস্ হুস্ ক'রে রেলগাড়ী এসে আগ্রা ষ্টেশনে থাম্‌ল, সেখানে পাঁচ মিনিট গাড়ী দাঁড়ায়। শ্রীশবাবু নামবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন —এবং "কিশোর ভাই আসি, মনে রেখ" বলে গ্লাডষ্টোনটি হাতে ক'রে ষ্টেশনে নেমে পড়লেন। পথে যেতে যেতে তিনি ভাব্‌লেন, কিশোর নিশ্চয়ই সংসারে সুখে সুখী হ'তে পারে নি, বিবাহ পদ্ধতিটাই সে দোষের বলে মনে কচ্ছে—অথচ এর চিত্ত কেমন কোমল—চরিত্র কি বিশুদ্ধ! এর মুখ খানি মনে পড়্‌লে কেমন যেন একটা কষ্টের ভাব মনে আসে! কি ঘা পেয়েছে কে জানে? নতুবা নবজীবনে যেখানে হোমানল শিখা

আর মন্দিরের দীপ দেখেছিল, সেটা এখন পিশাচের আলেয়া ব'লে তর্ক কর্‌ছে কেন? এর এত ঐশ্বর্য্য কি ভস্মের স্তূপ?"

বৃন্দাবনে গিয়ে যশোমাধবের মঠের নিকট যতই অগ্রসর হ'তে লাগ্‌লেন, ততই গভীর ব্যাথায় কিশোর রায়ের মন ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। মহান্তজি প্রবাস হ'তে সবে ফিরেছেন। তিনি আবার তাঁর দানশীলতার কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন কর্‌তে বেরুবেন, বর্ষাকাল—যাতায়াতের সুবিধার অপেক্ষা কচ্ছেন।

সে দিন ঘনঘটা ক'রে আকাশে মেঘ দেখা দিয়েছে, ময়ূরগুলি পেখম ধরে নাচ্‌ছে। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ শোভা ডুবন্ত সূর্য্যের সিন্দূরবর্ণে ভূষিত হ'য়ে উঠেছে। মঠের কাছে একটা কদমগাছের ডালে ডালে সাদা কেশরময় হলুদ গোলক ঝুল্‌ছে। বৃন্দাবনের কদমতরুর নীচে কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়ে বাঁশী বাজাতেন, এই গাছটা হয়ত সেই পবিত্র তরুর বংশধর।

এই ভাব্‌তে ভাব্‌তে কিশোর রায় মঠে গিয়ে পৌঁছিলেন। মঠে তখন সন্ধ্যাবাতি দেওয়া হচ্ছে। আজ কয়েকজন বৈষ্ণব অতিথি এসেছেন, তা'দেরে নিয়ে কানাই বাবাজি আনন্দ কচ্ছেন। রঘোসিং দরোয়ান বাবাজির ঘরে একটা পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে পিতলের দীপ জ্বেলে দিয়ে গেল, তার রক্তাভ শুভ্রতায় বৈষ্ণবগণের কপালের তিলকগুলি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ল। কানাই বাবাজি গাচ্ছেন,—

"অঙ্গ পরিমল সুগন্ধি চন্দন, কুঙ্কুম কস্তূরীপারা" কৃষ্ণকে রাধিকা স্বপ্নে পেয়েছেন। সেই স্বপ্ন-সুলভ কিন্তু সত্যিকার দুর্ল্লভ মিলনের কথা কিশোরের মনে পড়তে লাগ্‌ল। মনে হ'ল যাকে জীবনে পান নাই, গান যেন তাকে বুকে'র কাছে দিয়ে গেল। গান শুনে দাতার কাছে শ্রোতা তাঁর সর্ব্বস্ব বিকিয়ে দিলেন। এইজন্যই এই গানটি কিশোর রায় বাবাজিকে এর পরে অনেকবার গাইতে অনুরোধ ক'রেছিলেন।

গান পরিসমাপ্তির স্তব্ধতা খানিকক্ষণ শ্রোতৃবর্গকে সেই শ্রাবণ মাসের মেঘ নিনাদিত অম্বর তলে পালঙ্কে শায়িতা রাধিকার বিরহ কথায় বিমূঢ় ও মুগ্ধ ক'রে রাখল। এর মধ্যে বাবাজি হঠাৎ উঠে কিশোর রায়কে আলিঙ্গনে বদ্ধ ক'রে রাখ্‌লেন। কিশোর রায় বল্লেন "বাবাজি কি চিন্‌তে পেরেছেন? যার জীবন একদা রক্ষা করেছিলেন, আজ এই নয় বছর পরে তাকে দেখে চিন্‌তে পেরেছেন?"

"তা আর পারি না, ভালতো? মুখ খানি শুকনো কেন ভাই? শরীরটা আবার বড্ড রোগা দেখছি, কেমন আছ ভাই!"

সেই স্নেহের সুরে আবার কিশোরের কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠ্‌লো। তিনি বল্লেন "ভাল থাকলে কি আর ঘর ছেড়ে এতদূর আসি? আমাদের ভক্তি বিপদের পেছন পেছন ফেরে। যখন সুখে থাকি, তখন যে ভুলে থাকি।"

বাবাজি আদর করে তাঁকে কাছে রেখে অপরাপর অতিথির সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা ব'লে তাঁদের ও কিশোর রায়ের আহারের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তাঁরা আহারান্তে বিশ্রাম করতে গেলেন, তখন রাত্রি ৯টা। বাবাজি বল্লেন, "কিশোর আবার কি যক্ষ্মার সূচনা হ'য়েছে? যে সন্ন্যাসী আমার ঔষধটি দিয়েছিলেন, তিনি তো বলেছিলেন ঔষধ শিশিরে বেটে তিন বার খেতে। চতুর্থবারের কথা তিনি ত বলেন নি। যাঁরা খেয়েছেন তাঁদের তো আর এ রোগ হয় নি।"

"সে রোগ আমার আর হয় নি।"

"তবে কি হ'য়েছে বল? আমি তোমার হিতের জন্য যা' সাধ্যি তা' ক'রব।"

"আপনার কি সময় আছে? আমি কতকগুলি কথা বল্‌ব!"

"যথেষ্ট সময় আছে—সারাটা রাত পড়ে আছে। তুমি কিছু খেয়েছ।

আমার আজ একাদশী, একবেলা কিছু ফল টল খাই তা' হ'য়ে গেছে। এখন তুমি আমি দুজনে এই ঘরেই রাত কাটিয়ে দেব!”

তখন কিশোর রায় কিছুকাল চুপ ক'রে রইলেন। যে কথা কাউকে বলেন নি, যা' মনের ভিতর পুষে রেখে এ পর্য্যন্ত দুঃখে নিজে দগ্ধ হ'য়েছেন অপর কাউকে জান্‌তে দেন্‌নি,—সেই কথা বল্‌বার পূর্ব্বে তিনি বর্ষনোন্মুখ মেঘের মত স্থির হ'য়ে রইলেন। তারপর প্রথম হ'তে সকল কথা বাবাজিকে বল্লেন, সেই কথা বল্‌তে গিয়ে কতবার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল, কতবার চোখের একবিন্দু অশ্রু মুছ্‌তে আরও শতবিন্দু অশ্রু গণ্ড প্লাবিত ক'রে ফেল্লে, কতবার বাবাজির হাতখানি নিজের বুকের উপর টেনে এনে নিজ হাত তার উপর চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগ্‌লেন, কতবার ব্যর্থ আশার কথা বল্‌তে গিয়ে মন ব্যথিত হ'য়ে উঠ্‌ল, তা' বলে শেষ করা যায় না।

প্রাণে বড় ব্যাথা পেয়েছেন, ভালবাসার এই শাস্তি। যিনি মানুষকে ভালবাসা শিখুতে এসেছিলেন, তাঁকে মানুষেরা বুকে পিটে হাত পায়ের কব্জিতে শেল বিঁধে মেরে ফেলেছিল। ভালবাসার এই শাস্তি। এত দুঃখ পেয়েও ত' একবার ভালবেসে কেউ মনটা ফিরিয়ে আন্‌তে পারে না।

বাবাজিকে সকল কথা ব'লে কিশোর রায়ের মন অনেকটা হাল্কা হ'য়ে গেল। তাঁর কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক হ'ল। চক্ষু নির্ম্মল হ'ল। উপসংহার কালে তিনি বাবাজির পায়ের উপর হাত রেখে বল্লেন “আমার জীবন একবার রক্ষা ক'রে ছিলেন, অনেক সময় মনে ভেবেছি এ জিনিষটা কেন রাখ্‌লেন—এত দুঃখ সইবার জন্য বাঁচবার কি দরকার ছিল? এখন জ্ঞানদায়িনীকে নিয়ে কি ক'রব, বলুন? ছাড়্‌তে চেষ্টা ক'রে ছেড়ে থাক্‌তে পারি নি। কাছে রেখে সোয়াস্তি পাই না, দূরে গেলে পাগল হই। ঐ জানেলা দিয়ে চন্দ্রদেব উঁকি মেরে দেখ্‌ছেন, তাঁকে সাক্ষী ক'রে বল্‌ছি, আপনি যা বল্‌বেন, তাই কর্‌তে চেষ্টা পাব। বিষ পান করা অতি সহজ,

আপনি বল্লে তা এখনই পারি। কিন্তু হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করা সহজ নয়, তা' যদি করতে উপদেশ দেন, তবে সঙ্গে আমায় শক্তি দিন্ যেন আপনার কথা মত চল্‌তে পারি।"

কিশোর রায়ের কাহিনী শুনে বাবাজীর হৃদয় দয়া ও করুণায় পূর্ণ হ'য়ে গেছ্‌ল. তিনি অতি স্নেহে নিজ হাত তার মাথায় বুলোতে লাগলেন এবং বল্লেন—"কিশোর, তোমার দুঃখ শুনে আমার বড় দুঃখ হ'য়েছে, আমি কখনও সংসারে প্রবেশ করি নি। সাংসারিক লোকের এই সকল কষ্ট কি ভয়ানক! এ শুনে মনে হয় সংসার ছেড়ে জঙ্গলে ছুটে যাই। কিন্তু জে'ন, সংসারের কষ্ট যতটা উৎকট, তাঁর দয়াও সেই দুঃখের মধ্যে ততটা প্রকট হয়। আমি তোমাকে এখন আর তোমার স্ত্রীকে ছাড়্‌তে বলি না, তা তুমি কোন কালেই পার্‌তে না, এখনও পারবে না। সে চেষ্টা করলে হয় পাগল হ'য়ে যাবে, না হয় মর্‌বে। স্ত্রীকে কাছে রাখ্‌লেও যে তা না হতে পারে—এমন নয়। কিন্তু হয়'ত এই কাঁটার বন—তোমার শিক্ষার জন্যই তৈরী হ'য়েছে—ইহাই তোমার পাঠশালা; ওখানে বেত্র হস্তে যিনি শিক্ষা দিচ্ছেন, তিনি তোমার গুরুমহাশয়। কি উৎকট পথ দিয়েই তোমাকে উন্নতির সোপানে যেতে হ'বে।"

"তুমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়্‌তে চেষ্টায় ত্রুটি কর নি, কিন্তু যখন পার নি, তখন বুঝ্‌তে হ'বে, এই খানেই তোমার কঠোর তপস্যা ক'রে আত্মার মুক্তির পথ বের ক'র্‌তে হ'বে।"

"চণ্ডীদাসের একটা পদে আছে—"পীরিতি করিয়া ভাঙ্গয়ে যে, সাধন অঙ্গ পায় না সে।" এ কথাটা এতদিন ভাল ক'রে বুঝি নাই, তোমার কাহিনী শুনে এখন যেন এর অর্থ বুঝ্‌তে পেরেছি। সাধারণ জগতে যেখানে প্রেম শুধু সুখ-ভোগের জন্য, সেখানে ছাড়াছাড়ি দরকার। কিন্তু যিনি প্রেমের তপস্যা করতে চান, তিনি

একবার দিয়ে পুনরায় তা নিতে পার্‌বেন না। প্রেম দেওয়া-নেওয়ার বস্তু নয়, এ শুধু দেওয়ার জিনিষ। যাকে দিয়েছ তার হাত থেকে আর কেড়ে নিতে. পাররে না, যদি ছেড়ে দাও, প্রেমের সাধনা তোমার হ'বে না। প্রেমকে সাধনার বস্তু করতে হ'লে শত কষ্টেও তোমার ছাড়্‌বার উপায় নাই।

"তোমার প্রকৃতিতে সেই সাধনার বীজ ভগবান দিয়েছেন, এজন্য এত কষ্ট পেয়েও তুমি স্ত্রীকে ছাড়্‌তে পাচ্ছনা। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে–তুমি ইচ্ছা করলে জ্ঞানদায়িনীর মত সুন্দরী স্ত্রী আরও পেতে পার—আমোদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে ওকে খড় কুটোর মত ছেড়ে যেতে পার।

"কিন্তু তোমার তা কর্‌বার শক্তি নেই। কারণ প্রেমটা তোমার হৃদয়ে এসেছে তোমাকে সাধনা শেখাবার জন্য। কাঠ কি পাথরের মূর্ত্তি পূজা করা সহজ—সে দেবতা তোমায় কোনরূপ কষ্ট দেন না—কিন্তু মানুষ-দেবতা তোমার হৃদয়কে লণ্ডভণ্ড ক'রে ছাড়েন, তাকে অটল ভাবে ভালবাসা শক্ত—সুতরাং দেবতা পূজা থেকে মানুষকে ভালবাসা—কঠোরতর সাধনা।

"তুমি বাড়ী ফিরে যাও। তুমি তোমার স্ত্রীর কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করো না—যে পথে তাঁর অমঙ্গল হ'বে, যদি সে পথে তিনি যান, তবে ভগবানকে ব'ল যেন তাঁর মনকে শোধ্‌রান, তুমি তাঁকে ভাল করতে চেষ্টা ক'র না। যেখানে তোমার মনে ঈর্ষা বা রাগের প্রশ্রয় দিবে—যেখানে কষ্ট বোধ করবে সেখানে সতর্ক হ'য়ে থাক্‌বে। কারণ সেখানে পরের দোষ উপলক্ষ্য করে তুমি নিজেকে অপদেবতার হাতে ছেড়ে দেবে মাত্র। তুমি যে তাঁকে তোমার সন্দেহ দ্বারা

আবদ্ধ ক'রে রেখেছ সেজন্য অনুতপ্ত হও। তাঁর পাপের বিচার করতে যেও না, সে বিচার ভগবান তাঁর নিজের হাতে রেখেছেন।

"যাও বাড়ী ফিরে। হয় ত আরও অনেক কঠোর পরীক্ষা তোমার জন্য আছে—কিন্তু হৃদয়কে আনন্দের পথে রেখ—দুঃখের পথে ছেড়ে দিও না। সত্যই যদি ভালবাসার খুব উচ্চ স্থানে উঠতে—যদি প্রেমের নিজ অধিকারে যেয়ে পৌঁছিতে, তবে কিছুতেই তোমার মনে কষ্ট হ'ত না। সকল অবস্থায়ই তুমি তা হ'লে তোমার স্ত্রীর ইষ্ট কামনা করতে। ততটা উঠতে তোমার বাকী আছে। প্রেমের এই দীক্ষা লাভ ক'রে তুমি যে স্থানে যাবে, সেখান থেকে স্বর্গের—চিরানন্দ-ধামের—সৌধচূড়া বেশী দূর নহে।

বাবাজি শেষে বল্লেন "কিশোর আমি তোমার মঙ্গল কামনা করে প্রত্যহ ভগবানকে প্রার্থনা করব। সুখে দুঃখে আমি তোমর হিতাকাঙ্ক্ষী।" এই বলে কিশোর রায়কে আলিঙ্গন কল্লেন। তারপর উভয়ে শুয়ে পড়লেন। রাত্রে কিশোর স্বপ্ন দেখলেন—জ্ঞানদায়িনী যতই অধঃপতিত হচ্ছেন, ততই যেন তাঁর প্রতি তাঁর অপার কৃপা হচ্ছে। এই কৃপায় দুঃখ বোধ নাই, শুধু শুভ কামনা ও ত্যাগের ইচ্ছায় পঙ্ক বিমুক্ত পঙ্কজের ন্যায় তাঁর ভালবাসা প্রফুল্ল ও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে।

প্রাতে তিনি কানাই বাবাজিকে বল্লেন—"বাবা, আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য, আমি আর নিজের কথা নিজে ভাবব না, তা আমার যদি কেউ থাকেন—তিনি ভাববেন। অপরের অপরাধের শাস্তি দেওয়ার অধিকার আমার নেই—অপর কেন, আমার নিজকে সংশোধন করবার শক্তিই আমার নাই—আমি কি ক'রে পরকে ভাল করব?

"এই অবস্থার সঙ্কটে পড়ে—নিজের হৃদয় নির্ম্মল ও পবিত্র করতে

চেষ্টা পাব—তা হ'লে আমার আস-পাশ আপনই নির্ম্মল ও পবিত্র হ'য়ে উঠ্‌বে।"

বাবাজিকে প্রণাম ক'রে, তাঁর পায়ের ধূলো কপালে লিপ্ত ক'রে কিশোর রায় সিন্দূরতলা অভিমুখে রওনা হ'লেন। তখন তার মন কতকটা প্রসন্ন। কিন্তু বাড়ী এসে সকল সময় মনকে ঠিক রাখ্‌তে পারেন নি। এই ঘটনার কিছু দিন পরে দেবেশের 'নববৃন্দাবনে' কানাইবাবাজির সঙ্গে কিশোর রায়ের অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হ'য়ে ছিল, তা' পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে লেখা হ'য়েছে।

---

(৫৩)

কিশোর রায় বাড়ী ফিরে এসেছেন। স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর অনেক সময়ে কথা বার্ত্তা হ'ত না। একটা বৃহৎ হল ঘরের পূব ধারের দেয়াল ঘেঁসে তাঁর শয্যা ও পশ্চিম ধারের দেয়াল ঘেঁসে জ্ঞানদায়িনীর শয্যা। এই ভাবে, যেন নদীর এ পারে ডাহুক ও পারে ডাহুকি, রাত্রি যাপন হ'ত। এবার ফিরে আসার পর তার এই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হ'ল যে কিশোর রায় মাঝে মাঝে স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌তে চেষ্টা পান—স্ত্রী দুই এক কথায় উত্তর দিয়ে চলে যান, স্বামীর সঙ্গে ব'সে দু এক ঘণ্টা আলাপ করার প্রবৃত্তি তাঁর কোন কালেই ছিল না—এখনও নাই। তবুও কিশোর রায়ের মনে বিঁধে। দুঃখ পুরাতন হ'লেও তার হুল্‌টা প্রায় সমভাবে তীব্র থাকে। যখন আগ্রহে কথা বল্‌তে যেয়ে দেখেন জ্ঞানদা কোন অছিলায় তাঁর কাছ থেকে চ'লে যাচ্ছেন, তখন মনের সেই চির বিরহ-ক্ষুণ্ণ প্রেমের বুভুক্ষা—আবার তাঁকে অশান্তির মধ্যে ফেলে। কানাইবাবাজির উপদেশ স্মরণ ক'রে তিনি তাঁর আর্ত্ত চিত্তকে প্রবোধ দিয়ে বল্লেন "জ্ঞানদা সুখে থাক্।"

একদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। এই সময়টা কিশোর রায় তাঁদের কমলা দীঘির পাড়ে রোজই একটু হেঁটে বেড়ান। কমলাদেবী তাঁর মা, তিনি স্বর্গারোহণ করার পর রাজা রাজীব রায় তাঁর নামে এই দীঘি খনন করিয়েছিলেন। এই দীঘির চার পাড় ঘুরে এলে ঠিক আধ ক্রোশ হাঁটা হয়। কি শীত কি গ্রীষ্ম, শরীর অসুস্থ না হ'লে

—কিশোর রায় প্রতি দিনই এই আধ ক্রোশ হেঁটে এসে সন্ধ্যার পরই আহার করেন এবং ৯টার পর শয়ন গৃহে যান।

সেদিন অপরাহ্নটায় শয়ন ঘরে সোপনেয়ারের যৌন সম্বন্ধ বিষয়ক লেখাগুলি পড়্ছিলেন। উক্ত দার্শনিক পুরুষের বহু বিবাহের সমর্থন করেছেন। কিশোর রায় সেই যুক্তির অনুকূল ও প্রতিকূল অনেক বিষয়ই চিন্তা কচ্ছেন। দার্শনিক তো কাঠ খোট্টার ন্যায় কতকগুলি যুক্তি দিয়েছেন, তার মধ্যে রস মাত্র নাই। এবং দম্পতির হৃদয় ব'লে যে একটা জিনিষ আছে সেটি তিনি কল্পনার মধ্যেই আনেন নাই। যে স্বামী তাঁর স্ত্রীকে ভালবাসেন, তিনি কি ক'রে অন্য একজনের পাণিগ্রহণ কর্‌তে পারেন? তাঁর সমস্ত প্রকৃতি যে বিদ্রোহী হ'য়ে যাবে—এটা যে তাঁর পক্ষে একবারেই অসম্ভব। সোপনেয়ার এই দিকটা মোটেই লক্ষ্য করেন নাই। জড়বিজ্ঞানের আইন কানুনই মানব জীবনের একমাত্র নিয়ন্তা মনে করেছেন। একজনের প্রতি অনুরাগ, এক-ব্রত, এটি কি মানুষ কৃত্রিম ভাবে অর্জ্জন করেছে?—একি স্বভাব-গত নয়?

একখানি ভেলভেট মোড়া ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি ভাব্‌ছিলেন; এমন সময় হাওয়ার উপর নেচে নেচে বেশ একটু বৃষ্টি এল। রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন বৃহৎ একটি আমগাছের পাতায় মৃদু টুপ্‌ টাপ্‌ শব্দ হ'তে লাগ্‌ল—সোপেনেয়ারের দর্শন কিশোর রায়কে এই সুযোগে ভুলিয়ে ভুলিয়ে তন্দ্রার রাজ্যে নিয়ে এল, তিনি তাঁর বৈকালিক ভ্রমণ ব্যাপারটার জন্য আর উদ্যোগ কর্‌তে পার্‌লেন না।

সহসা বারান্দার উপর দুটি স্ত্রীলোকের নাতি-উচ্চ কথাবার্ত্তার স্বরে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। জ্ঞানদায়িনীর দুই দাসী, রাধি ও মঙ্গলা কথাবার্ত্তা কইছে, তারা অতি সংগোপনে কথা বল্‌ছে—অজ্ঞাতসারে

তাঁর কাণ কৌতূহলী হ'য়ে পরিচারিকাদ্বয়ের সেই কথাবার্ত্তা শুনতে লাগল।

তারা মনে করেছিল, রাজাবাবু বেড়াতে বার হ'য়ে গেছেন। নিত্য ত্রিশ দিনই ত এ সময় তিনি কমলা দীঘির পাড়ে যান, সুতরাং নিশ্চিন্ত মনে কথা বল্‌ছিল।

রাধি বল্লে, "ঝাঁটা মার এমন চাকরীর মুখে। এতদিন ত যা হোক এক রকম ছিল, অনিচ্ছায় অনেকটা কাজ করেছি, কিন্তু এখন যে আর পারা যায় না। মেয়েটা বিধবা হয়ে ৪টা শিশু নিয়ে ঘাড়ের উপর পড়েছে, করি কি? এদিকে জ্বরে জ্বরে শুকিয়ে কাট হ'য়েছে আমি ত আর হালে পানি পাই না। কব্‌রেজের ওষুধের দাম জোগাতেই প্রাণান্ত, লোকে বলে পেটের সন্তানের দায় বড় দায়। এই মেয়েটার জন্য আমার স্বর্গের পথটা ঝর্‌ঝরে হ'য়ে গেল। আর আজ যা করতে বল্‌ছেন, তাতে নরকের টিক্‌টিকিগুলি পর্য্যন্ত আমায় দেখে দাঁত খিঁচোবে। আমি কি ক'বে রাজাবাবুকে বিষের ঔষধ দেব?"

মঙ্গলা বল্লে "আমি সব রাণীমার মুখেই শুনেছি। তাঁর ইচ্ছা ছিল না। পরের বুদ্ধিতে বাধ্য হ'য়ে পড়েছেন। ঔষধটা হাতে ক'রে কত কাঁদ্‌লেন। তা এ বিষে তো রাজাবাবু আর মর্‌বেন না।"

উত্তেজিত ভাবে বাধা দিয়ে রাধি বল্লে "মরাত যে এর চাইতে ভাল, পাগল হ'য়ে থাক্‌বেন। রাণীমার কপালের সিন্দুরও হাতের নোয়া বজায় থাক্‌বে। একাদশী কর্‌তে হবে না—মনের সুখে খাওয়া পরা সব চল্‌বে—এদিকে আমোদ আহ্লাদের পথে যে কাঁটা ছিল তা' সরে যাবে। ভাই সত্যি বল্‌ছি, বড়লোকদের কাণ্ড দেখে

যেন্না ধ'রে গেছে। আমরা যে ছোট লোক, আমরা ত কখনও এমন করতে সাহস পাই না। এ দুটি বছর হ'ল মেয়েটার কপাল পুড়েছে, এখনও জামাইয়ের কথা বল্লে চক্ষু জলে ভেসে যায়। সারা-রাত জেগে কাঁদে, এই জন্যই ত জ্বর যায় না—স্বামী হেন বস্তু, তা ভাই আর কি বল্‌ব। টাকার দায়ে তো অকাজ কুকাজ সক-লই কর্‌তে হচ্ছে—হে ভগবান তুমি দে'খ, মেয়েটা বিনা চিকিৎসায় মর্‌বে, নাতি চারটার মুখে ক্ষিদেয় ভাত দিতে পার্‌ব না—এই জন্য আজ জলের মধ্যে বিষ দিতে যাচ্ছি। যে এর মলে, তাকে আর জন্মে শাস্তি দিও, সে যেন অন্ধ হয়, তার যেন কুষ্ঠ হয়,—কিন্তু আমার অপরাধ নিও না—আমি ঘোর অনিচ্ছায় এই কুকাজ কচ্ছি।"

মঙ্গলা বল্লে "আমারওত ভাই সেই কথা—দেশে আমার বাবা বাতব্যাধি হ'য়ে পড়ে আছেন, একটা বিধবা বোন, তাঁর সেবা ক'রেই সময় পায় না, না হ'লে ত গতর খাটিয়ে কিছু রোজগার করতে পার্‌ত। আমি মাস গেলে ২০৲ টাকা পাঠাব, তবে তাঁর পথ্য চল্‌বে, ঔষধ চল্‌বে—ভাঙ্গা ঘরের গোলপাতার ছাউনির মেরামত হবে। রাণীমা টাকা দিচ্ছেন—আমরা চাকর—ভাই আমাদের অপরাধ কি? মনিব যা বল্‌বে—তা' কর্‌তে হবে। নিজের ইচ্ছামতই যদি চল্‌তে পার্‌তুম, তবে ভগবান আমাদেরও ত ঐশ্বর্য্য দিতেন।"

রাধি···"যা বল্লে ভাই, আমরা কি কর্‌ব? এখন যাই সন্ধ্যার পরে বেড়িয়ে এলেই ত বামুনঠাকুর ভাত নিয়ে আস্‌বে, আমি সেইখানে বসে বাতাস কর্‌ব, জল নুন দেব, আসন পাত্‌ব—রাণীমা ত একদিনও রাজার খাওয়া দেখেন না। আমার ভাই রাজাবাবুর জন্য বড় কষ্ট হয়। এমন সুন্দর মুখ! ভেবে ভেবে মলিন হ'য়ে গেছে। লোকে বলে বউকে সন্দে ক'রে। অন্য কেউ হলে এমন বউকে ঝাঁটা মেরে

তাড়িয়ে দিয়ে আঙ্গিনায় গোবর ছড়া দিত। সেদিনও লাখ টাকা দিয়ে হার কিনে দিয়েছেন—আজ তার শোধ পাবেন। মানুষের বুদ্ধিই যদি গেল, তবে তো তার সব গেল।"

এই বলে দুজনে বারান্দা হ'তে বেরুবে, এমন সময় রাধি দেখ্‌লে যেন রাজাবাবু একটা ঝড়ের মত সেই ঘর হতে বেরিয়ে গেলেন। তার মাথায় যেন বাজ পড়্‌ল, তবে মনে হ'ল হয়ত কিছু শোনেন নাই, শুন্‌লে ত এখনি জানা যাবে। রান্না ঘরের দাওয়ায় বসে সে বাটনা বাটতে লাগল, এদিকে ভয়ে তার বুকটা খুব জোরে উঠ্‌তে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

কিশোর রায় সব শুনেছেন। মুহূর্ত্তকালের জন্য তাঁর মনে হ'ল ঘরে গিয়ে খেতে বসি, জলটা খাব, যা হবার তা হবে, জ্ঞানদায়িনী ত সুখী হবে। আবার ভাবলেন, পাগল হ'য়ে কতকাল বাঁচব ঠিক কি—একটা পশু হ'য়ে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াব, না হয় এইখানে আমার পায়ে এরা বেড়ী দিয়ে রাখ্‌বে। শুনেছি পাগলেরা অনেকদিন বাঁচে। না তা হবে না।

শেষে বৈঠকখানা ঘরের বৃহৎ বারাণ্ডাটার উপর দ্রুতভাবে পায়চারি কর্‌তে লাগ্‌লেন এবং ভাবলেন "বাবাজি তুমি আমাকে এ বাড়ীতে জ্ঞানদার সঙ্গে একত্র থাকৃতে বলেছ, তুমি হয়ত বিশ্বাস কর্‌তে পার নাই, স্ত্রীলোক অধঃপতিত হ'লে কোন্ গহ্বরে গিয়ে পড়তে পারে। এইরূপ স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করে—তা সাধনার অঙ্গীয় করতে হবে, কি করে তা পারা যায়? পর মুহূর্ত্তে জ্ঞানদার প্রতি তার সমস্ত প্রেম জুড়িয়ে গেল। তিনি মনে মনে চিন্তা কর্‌তে লাগ্‌লেন, "একটা পাপিষ্ঠার জন্য নিজের জীবন ব্যর্থ কর্‌বে কেন? তার কাছে আমার এই জীবনের কোন মূল্য না থাক্‌তে পারে—কিন্তু আমার সহস্র সহস্র প্রজাত আমায়

ভালবাসে, আমি তাদের জন্য বেঁচে থাক্‌ব, তাদের জন্য কাজ কর্‌ব, আর অন্দরে ঢুক্‌বনা। আমি সদরের জন্য—সকলের জন্য। অন্তঃপুরের কারাগার হ'তে মুক্ত হ'লে দেখ্‌তে পাব, আমার বৃহৎ কার্য্যক্ষেত্র চোখের সাম্‌নে পড়ে আছে। এ সকল কথা কাউকে বলা হবে না—বাড়ীতে ছেলে-পিলেরা আছে—ঘরের কেলেঙ্কারী বটে গেলে আত্মীয় স্বজন লজ্জা পাবেন। জ্ঞানদার যে একটু চক্ষু লজ্জা আছে তা' ঘুচে গিয়ে সে একবারে পিশাচ হ'য়ে দাঁড়াবে।"

এই স্থির করে তিনি নীচে দপ্তর খানায় চলে গেলেন ও নায়েব শ্যামসুন্দর ঘোষকে ডেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "কোনো মহালের বিশেষ কিছু খবর আছে?" শ্যাম সুন্দর ঘোষ বল্লেন "হুজুর, বিশেষ কোন খবর নেই, তবে মগরা হাট হ'তে হানিফ খাঁ লিখেছে, যে রাজাবাবু তাদের যে উপকার করেছেন, তা বাপের যোগ্য, তবে তারা নিরক্ষর,—সে নিজে লিখ্‌তে পড়্‌তে জানে না। গাঁয়ে যদি একটা বড় রকমের পাঠশালার ব্যবস্থা হয়, তা হ'লে তাদের ছেলেরা লেখা পড়া শিখ্‌তে পারে এবং রাতের কতকটা পর্য্যন্ত পাঠশালা খোলা থাক্‌লে বুড়দের ভেতর ও কেউ কেউ শিখ্‌তে পারে।

রাজাবাবু বল্লেন "দেওয়ান, তুমি আমার জমিদারীর মধ্যে বড় বড় গ্রাম দেখে ৪০।৫০টা ছাত্র-বৃত্তি স্কুল স্থাপন করার ব্যবস্থা কর। মগরা হাটেত হবেই, তা ছাড়া যে সকল গ্রাম শিক্ষার কেন্দ্রস্থল হবার যোগ্য, তার একটা লিষ্ট ক'রে ফেল এবং এজন্য এ বছরের বজেটে কত টাকা রাখ্‌তে হবে, তার একটা অনুমানিক হিসাব দাও। আর সিন্দুর-তলার হাইস্কুলটাকে আমি কলেজ কর্‌ব। হেডমাষ্টার প্রাণধন সেন-গুপ্তকে বলে পাঠাও যেন তিনি কাল আমার সঙ্গে দেখা করেন।"

এই ব'লে তিনি দ্রুত পাদক্ষেপে অন্যমনস্কভাবে বৈঠক খানার দিকে চলে গেলেন। দেওয়ানজি রাজাবাবুর কথা বাওার মধ্যে একটা অস্বাভাবিক

উত্তেজনা দেখ্‌তে পেলেন। যদিচ কথাগুলি ঠিকঠাক বলেছেন—তবু কথা বলবার ভঙ্গীতে মনের যে ভাবের আভাস ছিল, তা যেন স্বাভাবিক অবস্থার ফল নহে। নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্য যেন রাজাবাবু মনোযোগটা একদিকে সজোরে টেনে নিচ্ছেন, এইরূপ বোধ হ'ল।

সে দিন বৈঠকখানায় এসে কিশোর রায় শুয়ে পড়ে রইলেন। চাকরদের মধ্যে একজন এসে খাবার কথা বল্ল, তিনি খেতে গেলেন না। ১টার পর শোবার জন্য পুনরায় তাগিদ এল, তিনি আর অন্দরে ঢুকলেন না। পরদিন দিদিমাকে ডেকে বল্লেন "দিদিমা আমি বৃন্দাবন থেকে দীক্ষা নিয়ে এসেছি, একবছর আমাকে স্বপাক শুধু আলুভাতে দিনে একবার খেতে হ'বে। ঠাকুর ঘরের সংলগ্ন যে ছোট ঘরটি আছে—সেখানে উনুন করে রেখ, আমি বেলা একটা দুইটার সময় নিজে রাঁধ্‌ব। তুমি আমার রান্নার জোগাড় দিবে।" দিদিমা ত হেসেই খুন—"তুই সন্ন্যাসী হ'য়ে বের হ'য়ে যাবি নাকি? তবে জ্ঞানদাকে পাহারা দেবে কে? তুই মনে করেছিস্ তুই আলোচাল আর বেগুন কি আলুভাতে খেলে জ্ঞানদা দুঃখে মরে যাবে, ও সেও উপোস করতে থাকবে, বউটি তেমন নয় রে যাদু। সে যেমন খায় তেমনই খাবে, যেমন হাসে তেমনই হাস্‌বে, যেমন চুল বাঁধ্‌তে তিনটা দাসী নিয়ে ৫শিশি সুগন্ধ তেল, তের গণ্ডা ফিতে ও পাউডার নিয়ে ৩টা হ'তে ৫টা পর্য্যন্ত ধস্তাধস্তি করে, তেমনই করবে, মাঝ থেকে তুই উপোস করে মরবি। তুই যত কৃশ হ'তে থাকবি, তার দেহের লাবণ্য তত বাড়্‌বে। যদি বড়ঘের মেয়েটি বিয়ে করতিস্—তবে দুই সতীনে তোকে আদর দেখাতে আড়াআড়ি করত! এখন ছাইয়ে জল ঢেলে কি করবি!"

কথাগুলি শেলের মত কিশোর রায়ের মনে বিঁধ্‌তে লাগল, তিনি কাঁদ কাঁদ স্বরে দিদিমাকে বল্লেন:—

"দোহাই তোমার, দিদিমা, আর ঠাট্টা ক'রোনা—তুমি মনে কচ্ছ তোমার কথা আমার মিষ্টি লাগ্‌ছে—তা নয়, তাতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।"

এই বলে কিশোর রায় দুই হাতে নিজের চোখ চেপে ধরে কান্না ঢাক্‌তে লাগ্‌লেন।

দিদিমা অবাক হ'য়ে গেলেন, কিশোরের মনের অবস্থা যে এতটা খারাপ তা তিনি জান্‌তেন না। আদর ক'রে কাছে বসে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লেন, "তুই পুরুষ মানুষ, তোর মনটা এতটা কোমল হ'লে চল্‌বে কেন? বাড়ীর ভেতরে না খাস্‌, আমি তোকে রেঁধে দেব, রসুয়ে বামুনের হাতে রোজ রোজ খেতে অরুচি হ'য়ে যায়। তোর মা রাজীবের রান্নাটা নিজে রাঁধ্‌তেন, রাণী হ'য়েছেন বলে যে রান্নার সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়্‌বেন, তা নয়। কত পরিপাটি ক'রে তোর বাবাকে রেঁধে খাওয়াতেন। তোর বাবা প্রায়ই তাকে "রাঁধুনী" বলে ঠাট্টা করতেন। তা আমি তোকে রেঁধে খাওয়াব। মাংসের রান্নাও আমি রাঁধ্‌তে পারি, তুই খেয়ে দেখিস্‌ না।"

"না দিদিমা, সে তোমার করতে হবে না। তুমি আলু বেগুন ভাতে রেঁধে দিও। আমার খাবার কোন সখ্‌ নেই, দিদিমা, আমার বড্ড ভয় হ'য়েছে।"

এই বলে আবার চোখ দু হাতে ঢাকা দিয়ে কান্না গোপন করতে চেষ্টা পেলেন।

এই ঘটনার পর তিনটি মাস চলে গেছে। দিনে একবার ভাতে ভাত খেয়ে কিশোর রায় কৃশ হ'য়ে পড়েছেন। দিদিমার শত অনুরোধ ও কান্না কাটিতেও তিনি তাকে ভাল খাওয়ায় লওয়াতে পারেন নি। তিনটি মাস এক বাড়ীতে থেকে কিশোর রায় আনন্দার মুখ দেখেন নি।

তিনটি মাস পুনরায় অনিদ্রা, তন্দ্রা ও উৎকট স্বপ্নের মধ্য দিয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। প্রথম মাস জ্ঞানদার উপর খুব একটা বিরক্তির ভাব ছিল, আর ওর মুখ দেখ্‌বেন না, এই পণ করেছিলেন। দিনের বেলায় প্রাণধন গুপ্তের সঙ্গে সিন্দূরতলার কলেজ করার আয়োজন কর্‌তেন। লাইব্রেরীটা খুব বড় ভাল রকমের হয়, এজন্য ম্যাকমিলন, নিউম্যানের ক্যাটলগ্‌ দেখে দেখে বইএর একটা লিষ্ট ক'রে ফেল্লেন; লুজাকের অরিয়েণ্টাল লিষ্ট, অক্‌সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রকাশিত গ্রন্থতালিকা এই নিয়ে নাড়া চাড়া করতেন। ল্যাবরেটারির যোগ্য দ্রব্যাদির জন্য বিলাতে অর্ডার গেল এবং ইংরেজী পড়াবার জন্য জে, রিচার্ডসন্‌ নামক একজন উৎসাহী ইংরেজকে নিযুক্ত করে ফেল্লেন। ইনি অকস্‌ফোর্ডের বি, এ, অনারে উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন। ইহার প্রপিতামহ কর্ণেল রিচার্ডসন্‌ ইংরেজী কাব্যের বৃহৎ সংগ্রহ সঙ্কলন করে ছিলেন। সাহিত্যিক প্রতিভা এই পরিবারের সকলেরই একটা বংশগত লক্ষণ ছিল। বিজ্ঞান পড়াবার জন্য প্রফুল্লরায় তাঁর এক প্রিয় ছাত্রকে দেবেন প্রতিশ্রুত হ'লেন, এবং কলেজ একবারে বি, এ পর্য্যন্ত এফিলিয়েট্‌ করবার কথাবার্ত্তা রাজাবাবু ভাইস্‌ চেয়ারম্যান আশুবাবুর সঙ্গে চালাতে লাগ্‌লেন।

দিনের বেলা এই উৎসাহে কাটত। রাত হ'লে সকলই জ্ঞানদা-ময়িনীময়। প্রায়ই স্বপ্নে তাকে দেখ্‌ছেন, কখনও তার কাছে কেঁদে নিজের দুঃখ জানাচ্ছেন, কখনও বিষম ক্রোধে তাকে প্রহার কর্‌তে যাচ্ছেন—বাড়ী হ'তে দূর করে দিচ্ছেন—ইত্যাদি নানা বিরুদ্ধ চিন্তার আশ্রয় নিয়ে ভোরের শীতল বায়ুর স্পর্শে খানিকটা নিদ্রার সাহচর্য্য লাভ করেছেন। একমাস পর্য্যন্ত স্ত্রীর উপর মোটামুটি একটা বিরাগ থাকাতে, জমিদারীর মধ্যে পাঠশালা স্থাপন ও সিন্দূরতলার কলেজ করা নিয়ে চিন্তাস্রোত

অনেক সময় সেই দিকেই প্রবাহিত হ'ত। কিন্তু যতই সময় যেতে লাগল, ততই জ্ঞানদায়িনীর চিন্তা প্রবল হ'তে লাগ্‌ল। "এতদিন আমায় দেখে নি, ঔষধ খাইয়ে পাগল কর্‌তে চেয়েছিল—তবু তার একটু দয়া নাই, আমাকে একদিনও দেখ্‌বার ইচ্ছা হয় না।"

এই ভাবটা শেলের মত তার প্রাণে বিঁধ্‌তে লাগ্‌ল, দ্বিতীয় মাস গেল, তৃতীয় আর কাটেনা, জ্ঞানদায়িনীকে ছেড়ে কি করে বাঁচব?"

জ্ঞানদায়িনীর মনেও একটু ভাবান্তর হ'য়েছিল। ঔষধ দেওয়ার ব্যাপারে তার ইচ্ছা ছিলনা—তিনি অনেকটা বাধ্য হ'য়ে এইকাজে নেমে-ছিলেন। তার পর যখন দেখ্‌লেন, তাঁর স্বামী নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন,—এজন্য অন্দর ছেড়ে দিয়েছেন, খাওয়া নিয়ে কঠোর কচ্ছেন, তখন তাঁর সন্দেহ হ'ল, রাধির উপর এই ভার ছিল—সে বেটী রাজাবাবুর প্রতি দয়াশীলা হ'য়ে হয়ত বলে দিয়েছে। বিষয়টা নিয়ে গোলমাল করলে পাছে রাধি সকল কথা সবাইকে বলে ফেলে, এজন্য জ্ঞানদা কতদিন মনের রাগ মনে চেপে রেখে চুপ করেছিলেন। একদিন কিন্তু পারলেন না, রাধিকে নিরালায় পেয়ে বল্লেন' "তুই রাজাবাবুকে ওষুধের কথা বলে দিয়েছিস্।" যদিও আস্তে তিনি কথা কয়টি বল্লেন, তথাপি তার চোখে রাগের ভঙ্গি ও কম্পিত ওষ্ঠের তির্য্যাগ্‌ভাব দেখে রাধির বুঝ্‌তে বাকী রইল না যে রাণীমা ভারী চোটে গেছেন। তখন সে তাঁর পায়ের তলায় পড়ে জোড় হাত করে সকল কথা বলে ফেল্লে। সে মঙ্গলার সঙ্গে কথা কইছিল, তখন যে রাজাবাবু ঘরে ছিলেন, তারা তা জান্‌ত না।"

জ্ঞানদায়িনী তাকে বিদায় করে দিয়ে গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তে লাগলেন। এতটা দূর গড়িয়েছে, তবু তার স্বামী একথা ঘুণাক্ষরে কাউকে বলেন নাই। বড় হলঘরটার এক কোণে শুয়ে থাকতেন, এই তাঁর অপরাধ। তার জন্য তাঁকে ঔষধ করে পাগল করব, এতবড় অভিসন্ধিটা টের

পেয়েও তো কিছু বলেন নাই। ছেলেদের মাথায় একটা মাত্র কলঙ্কের ডালি পড়বে, আমার কথা নিয়ে আলোচনা হ'বে, হয়ত একটা ছাড়া-ছাড়ি হবে এই সকল আশঙ্কায় তিনি নিজে কষ্টের চূড়ান্ত সহ্য কচ্ছেন—অথচ কারুকে কিছু বল্‌ছেননা—তাঁর দিদিমাকেও না।

তার পর তিন মাস যাবত তিনি ঘরে শয়ন করেন না, এতে লোকেরা কানাকানি কচ্ছে। লোকের কানাকানিটাও জ্ঞানদার ভাল লাগ্‌ল না।

— —

আশ্বিন মাস—বিজয়া দশমী, প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়ে কিশোর রায় বাড়ী ফিরেছেন। বাড়ীতে উৎসবের আলো জ্বল্‌ছে, চার দিকে বাস্থ ভাণ্ড, হৈ হৈ। সন্ধ্যার পরে বৈঠক খানায় শুয়ে, একটি পাশ-বালিশ আশ্রয় ক'রে কিশোর রায় চোখ বুজে আছেন। দিদিমাকে প্রণাম করে এসেছেন। বাড়ীর সকলে তাঁকে প্রণাম করেছে, বাদ একজন। এত বছর বিয়ে হ'য়েছে, কই দশমীর দিন একবারও ত জ্ঞানদা তার পায়ের ধূলো ন্যান্ নি। যিনি একটিবার প্রণাম কর্‌লে মন থেকে তিনি আশীর্ব্বাণী করতেন, যাতে করে তার সকল পাপ ধুয়ে যেতে পার্‌ত, তিনি ত স্বামীকে প্রণাম করেন নাই। বিজয়ার দিন ত শত্রু মিত্রে কোলাকুলি হয়, তিনি কি পাপ করে ছিলেন যে এমন দিনেও এক বাড়ীতে থেকে জ্ঞানদার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হ'তে ও বঞ্চিত হয়ে আছেন!

ক্রমে চোখ বুজে এল, তিনি ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় মৃদু মৃদু আঘাত দরজার দিক হ'তে শুনে তিনি উঠে বস্‌লেন, বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে দরজা খুলে দেখেন জ্ঞানদায়িনী।

জ্ঞানদায়িনীর বেণী খুলে গেছে,—সেই মুক্তবেণী কপোল চুম্বন কচ্ছে, চক্ষে অশ্রুবিন্দু টল্ টল্ কচ্ছে, তিনি এসে স্বামীর হাত চেপে ধর্‌লেন এবং বল্লেন "চল ঘরে যাই, আমার অপরাধ মাপ কর।"

কি মিষ্ঠকথা! "তুমি মার্জ্জনা চাইছ, কিসের মার্জ্জনা! তোমার অপরাধ কখনই এত গর্হিত হ'তে পারে না, যা তুমি এমনই ভাবে এলে আমি মাপ না করতে পারি।" এই ভেবে কিশোর রায়ের চোখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু জ্ঞানদায়িনীর যে দুইবিন্দু জল চোখে এসেছিল তা চোখেই মিলিয়ে গেল।

পত্নীর স্নেহের আকর্ষণে কিশোর রায় পুনরায় তার শোবার ঘরে এলেন। জ্ঞানদায়িনী তার বাহুধরে সলজ্জ অনুতপ্ত ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। কিশোর আর্দ্রকণ্ঠে বল্লেন—"তুমি ঔষধ এনে দাও, তা বিষ হোক, আর যা হো'ক, আমি এখনই পান করব। আদরের সহিত তাঁর গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন, "সত্যি বলছি এ কথার কথা নয়। তোমার সুখের পথে বাধা হয়ে বেঁচে থাকবার আমার কোন ইচ্ছা নাই।" জ্ঞানদায়িনী সত্যিই সেদিন অনুতপ্তা হয়েছিলেন, তার চোখ দিয়ে পুনরায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়তে লাগল। বহুদিন পরে কিশোর রায় তাঁর পত্নীকে পেয়েছিলেন, তা একটি রাত্রের জন্য। এই রাত্রি তাঁর কাছে কত মহার্ঘ্য।

তার পর হ'তে কিশোর রায় অন্দরেই শয়ন করতেন। কিন্তু স্ত্রীর হৃদয়ের যে একটু অনুরাগের লক্ষণ পেয়েছিলেন, তা তার রইল না। পূর্ব্বে যে ভাব ছিল, তাই হল। অর্থাৎ মাঝে মাঝে তাঁর মুখখানি, আঁচল নাড়া আর পা দুখানি দেখতে পেতেন, ঘর ঢুকবার সময় আর ঘর থেকে বার হওয়ার সময়। তিনি কথা বল্লে অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর পেতেন। না বল্লে জ্ঞানদা নিজ থেকে কথা বলতেন না। তাঁর হৃদয়ে যে সকল বিষয় নিয়ে তোল পাড় হ'ত, জ্ঞানদা সাগরের পাড়ে দাঁড়িয়ে নিতান্ত অসংশ্লিষ্ট দর্শকের মত তা দেখেও দেখতেন না।

এইভাবে আরও দুই একমাস গেল। কিশোর রায় বাবাজির কথা মত যথাসাধ্য চেষ্টা করে দুঃখের ভাব দূরে রাখতে প্রয়াস পান। স্ত্রীর প্রতি তাঁর শত শত অভিযোগ, যা নিয়ে তাঁর মন পূর্ব্বে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকত, সেগুলি বিরাগের খাড়া পাহারা রেখে মনের দোর গোড়ায় ঢুকতে দেননা। "সে কি কচ্ছে না কচ্ছে তা আমি ভাবব না। আমার চিত্ত দোষ-অনুসন্ধিৎসু হ'য়ে টিকটিকি পুলিশের মত ওঁর পেছন পেছন কেন ঘুরবে? ওঁর যা ভাল লাগে উনি তাই করুন। আমি

ওঁর ইচ্ছার পথে আর দাঁড়াব না।" এই দৃঢ় সংকল্প মনে মনে স্থির রেখে রাজাবাবু সারাদিনটা যে সকল পল্লীতে ছাত্রবৃত্তি পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে এবং যাদের উত্তরোত্তর উন্নতি সম্বন্ধে তিনি নায়েবদের নিকট হ'তে সপ্তাহিক রিপোর্ট পাচ্ছিলেন, সেই সকল পল্লী-বিদ্যালয় সম্বন্ধে নানারূপ ব্যবস্থা করতেন। সিন্দুরতলায় অমরাবতী দেবী নাম্নী একটি ব্রাহ্মণ বিধবা, অত্যন্ত বিদুষী ও শিক্ষিতা ছিলেন। তাঁর স্বামী তাঁকে নিয়ে বিলেত্ গিয়েছিলেন এবং বার বছর তথায় বাস করেন। অমরাবতী সেলাই, ও নানারূপ শিল্পকার্য্যে বিচক্ষণতা লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে দস্তুর মত টোলের পণ্ডিত রেখে তিনি উপনিষদ ও পুরান শিক্ষা করেন, ইহা ছাড়া ফ্রেন্স, জারমান্ এবং ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসে তার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি দেশে আসার পর হিন্দু স্ত্রীর ন্যায় থাক্‌তেন, অবরোধ প্রথাও কতকটা মেনে চল্‌তেন। তাঁর স্বামীর ইচ্ছা ছিল, এদেশের মহিলাদের শিক্ষাকার্য্যে অমরাবতী তাঁর সমস্ত অধ্যবসায় প্রয়োগ করেন। হঠাৎ স্বামী মারা যাওয়াতে তিনি এক বছর কাল একবারে অবলম্বন শূন্য হ'য়ে পড়েন এবং তার পরের বছর আর একটা আঘাত বিধাতা তার হৃদয়ের উপর নিক্ষেপ করেন। তাঁর শিক্ষিতা রূপসী ১২বছরের একমাত্র কন্যা ইনফ্লুয়েঞ্জা হ'য়ে তিন চার দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। পাথর যে আঘাতে ধ্বংসে যায়, সেইরূপ দুইটি বজ্রের আঘাত ক্রমান্বয়ে তার উপর পড়ে। তিনি এককালে খুব সুন্দরী ছিলেন, এখন সৌন্দর্য্যের চাইতে মহীয়সী গাম্ভীর্য্য ও একটা সৌম্য ভাব তাঁর শরীরে বিদ্যমান। তিনি ৫০ বছর পার হ'য়েছেন।

অমরাবতীর অনেক অর্থ ছিল, স্বামীর ইচ্ছা শিরোধার্য্য ক'রে তিনি সিন্দুর তলায় একটি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবেন, এই চিন্তা

কচ্ছিলেন। কিশোর রায় এঁর দূর সম্পর্কে পিস্‌তুত ভাই। তিনি অনেক সময় মহিলাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, দেশী পদ্ধতি রক্ষা করে, অথচ হরবোলা সেজে শুধু অর্থবোধহীন শ্লোক মুখস্থ না করে, কিরূপে উৎকৃষ্টভাবে হ'তে পারে, তাই নিয়ে অমরাবতীর সঙ্গে পরামর্শ কর্‌তেন। এত বছর বিলেতে ছিলেন, অথচ একটি ইংরেজী শব্দ তিনি কথোপকথনের সময় ব্যবহৃত করতেন না; বাড়ীতে সাড়ী প'রে থাক্‌তেন। জুতো পর্‌তেন না, রোজ গীতা ও উপনিষৎ পাঠ কর্‌তেন এবং একাদশী ও অপরাপর নির্দ্দিষ্ট তিথি পালন কর্‌তেন। অথচ হিন্দু মহিলারা যাতে করে সংস্কৃতের সঙ্গে ইংরেজী এমন কি ফরাসী প্রভৃতি শিক্ষা কর্‌তে পারেন, শিল্পশিক্ষা দ্বারা নিজেরা উপার্জ্জন কর্‌তে পারেন—নবযুগের আদর্শ প্রাচীন আদর্শের শুদ্ধতা রক্ষা ক'রে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পারেন সে বিষয়ে অমরাবতী বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। এঁর সম্বন্ধে আমরা পরে আরও লিখ্‌ব।

একদিন রাত্রি ১০টার পরে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যাওয়াতে কটা বেজেছে দেখ্‌বার জন্য পায়ের নীচে খাটের মশারি বাঁধ্‌বার শলাকালগ্ন একটা ছোট ব্রাকেট পাদিয়ে টিপে কিশোর রায় বৈদ্যুতিক আলো জ্বাল্লেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দূরে তাঁর স্ত্রীর পালঙ্ক শূন্য র'য়েছে, জ্ঞানদায়িনী তথায় শায়িত নাই। তিনি উঠে এসে দেখেন, সেইধারে হলের কপাটের খিল খোলা, অথচ দোর ভেজান রয়েছে।

নিজের বিছানায় এসে বসে বসে এক ঘণ্টা অপেক্ষা কর্‌লেন। জ্ঞানদায়িনী এলেন না। তখন বাইরে গিয়ে খুঁজতে গেলে জানাজানি হ'বে, এজন্য তিনি বাইরে গেলেন না। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে সমস্ত চিত্ত একাগ্র ক'রে ভগবানকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। বাবাজি যে বলেছিলেন "তুমি জ্ঞানদাকে ছাড়্‌তে পার্‌বেনা" তা ঠিক, সে যতই ঠেলে

ফেল্‌ছে, স্ত্রী হ'য়ে অপরাধের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছে, ততই যে তার প্রতি টান বেড়ে যাচ্ছে। ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "আমার পক্ষে যা ভাল প্রভু তাই কর। আমার মনটাকে তুমি জোর ক'রে নাও, এর উপর যে আমার কোনই জোর চলেনা।" ২টা বেজে গেল, একবার উঠে তিনি বাইরে গিয়ে বারাণ্ডার আলো জ্বেলে দিলেন। অন্তঃপুরের দাসীদের মহাল হ'তে একটি পরিচারিকা ছুটে এসে বল্লে "রাজাবাবুর কিছু চাই।" কিশোর রায় বল্লেন "কিছুনা" তখন আলো নিবিয়ে ঘরে এসে অন্ধকার বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করতে লাগ্‌লেন। আরও এক ঘণ্টা গেল, তারপর কিশোর রায় কপাট খোলার একটা অতি মৃদুশব্দ শুনতে পেলেন এবং জ্ঞানদায়িনী যে বিছানায় এসে শুয়ে পড়্‌লেন, তা বেশ বুঝ্‌তে পারলেন।

তিনি দিনের বেলা তো প্রায় অন্দরে আসা ছেড়ে দিয়েছেন; জ্ঞানদায়িনীর সঙ্গে বহ্যিক এখন কোন সম্পর্ক নাই, তবুও যে রাত্রিটুকু নিরুদ্বেগে ঘুমোবেন, তাতে ও অন্তরায় উপস্থিত হ'ল। জ্ঞানদাকে হৃদয় হোতে সজোরে ঠেলে ফেলে যতই তিনি ভগবানকে ডাক্‌তে যান, ততই সমস্ত ঠেলা খেয়ে, বাধার মুখ ভেঙ্গে দিয়ে মনের ভেতর ভগবানের জন্য পাতা সিংহাসনে তিনি এসে বস্‌তে লাগ্‌লেন। কিশোর রায় দেখ্‌লেন, ভগবান তাঁর কাছ থেকে কতদূরে এবং জ্ঞানদায়িনী কত নিকট।

এক মাসের মধ্যে তিন চারবার এইরূপ হ'ল। জ্ঞানদায়িনী ঘর ছেড়ে চলে গিয়ে ৫।৬ ঘণ্টা পরে ঘরে আসেন। তাঁর স্বামীর ধৈর্য্যের বাঁধ একটি একটি ক'রে খুলে গেল। তিনি জ্ঞানদাকে একবারে ছেড়ে দিয়েছিলেন, এখন তাকে বাঁধ্‌বার উপায় খুঁজতে লাগ্‌লেন। বাবাজির

কথা মনে করে ভাবতে লাগলেন "ছাড়ব ও না অথচ সব সহ্য করব, এটি হতেই পারে না, আমি আর সত্যই পাথরের বুদ্ধদেব নই।"

সেইদিন ৫টা চবের তালা এনে রাত ৯টার পর যখন জ্ঞানদা শুয়েছেন, তখন হলঘরের ৫টা দরজায় সেই ৫টা তালা বন্ধ ক'রে জ্ঞানদাকে বল্লেন, "তোমার কোথাও যাবার দরকার হ'লে আমাকে জাগিয়ে দিও, আমি তালা খুলে দেব।" জ্ঞানদার গালদুটি শুধু নয়, চোখ ও কপাল পর্য্যন্ত রাগে রাঙ্গিয়া উঠল, তিনি কিছু বল্লেন না—অপরদিকে পাশ ফিরে ঘুমের অভিনয় করতে লাগলেন। কিশোর রায় তাঁর নিজের বিছানায় আরামের নিশ্বাস ফেলে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এখন থেকে রোজই রাত্রে এইরূপ তালাবন্ধের পালা চল্ল। কিশোর রায় মাঝে মাঝে আলোর ফাঁকে ফাঁকে শয্যাশায়িতা পত্নীকে দেখতে পান, তখন দেখেন, তার মুখপদ্মে রাগের লাল রংটা যেন ঘণীভূত ও স্থায়ী হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। স্ত্রীর এই প্রতিকূল মনোবৃত্তির আবেগটা তাঁর কাছে নিতান্ত মন্দ মনে হ'ল না। একসময়ে জ্ঞানদার সুমধুর হাসিটি তাঁর কাছে যেমন লাগত, এখনকার বিরক্তি ভাবটি তেমনই ভাল লাগতে লাগল, কারণ তিনি স্ত্রীর ক্রোধ সত্বেও এখন নির্ব্বিঘ্নে সকাল পর্য্যন্ত ঘুমুতে পাচ্ছেন।

একদিন হঠাৎ ১২টার পর তার ঘুম ভেঙ্গেছে, রোজই রাত্রে ঐ সময়টার তিনি একবার জেগে উঠেন। ৫।৭ মিনিট পরে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। সে দিন ঘুমভাঙ্গার পর তার মনে হ'ল, নীচেকার ঘরে যেখানে কেউ থাকেনা, সেই ঘরটায় পদশব্দ হচ্ছে। তখন আলোটা জ্বেলে দেখেন, জ্ঞানদায়িনী শয্যায় নেই, তখন ভয়ানক রাগ হ'ল, আমার বলিশের নীচে থেকে চাবি নিয়ে গেছে, ব'স, এবার চাবির এমন ব্যবস্থা করব, যেতা' আর তোমার পাবায় সুবিধা হবেনা। আজ শেষরাত্রে ফিরে এলে তার

সঙ্গে কথা কইব; অনেকদিন রাগ দ্বেষ দমন ক'রে সাধু সেজে আছি, সাধুতো নয় নিতান্ত কাপুরুষের চাইতেও অধম হ'য়ে আছি। আজ থেকে আমি পুরুষের মতন হব।" এই ভেবে তিনি হলঘরটায় পায়চারি করতে লাগ্‌লেন। রাত ১॥ বেজে গেছে কিন্তু ১২টা হ'তে ১॥টা তাঁর উত্তেজিত চিন্তায় ৫মিনিটের মত মনে হ'ল.

হঠাৎ তাঁর স্ত্রীর শয্যায় একখানি কাগজ দেখ্‌তে পেয়ে তিনি সেটি হাতে নিয়ে দেখেন, সেটি একখানি পত্র, শিরোনামায় তাঁর নাম। তাড়াতাড়ি খুলে দেখ্‌লেন জ্ঞানদায়িনী তাঁকে চিঠি লিখেছেন। চিঠিটা এই :—

"আমি আজ ঘর ছেড়ে বার হলেম, আর ঘরে ফিরব না, তুমি আমাকে খুঁজনা, তাতে কেলেঙ্কারী হবে, অথচ আমায় পাবেনা। জোর করে মুল্লুক দখল করা যায়, মন দখল করা যায় না। এটা যে তুমি এতকাল নানা উপায়ে অবলম্বন ক'রে জান্‌তে পেরেও বুঝ্‌তে পার্‌লেনা, এইটি হচ্ছে আশ্চর্য্য। তোমার জোড়া এ জগতে আর একটি আছে কিনা জানিনা।

"আর একটি কথা লিখ্‌ছি। আমার শ্বশুর মহারাজ আমার লক্ষ টাকার জরাও অলঙ্কার দিয়েছিলেন, তা ছাড়া বিয়ের সময় আমি ৫০,০০০ টাকার মোহর যৌতুক পেয়েছিলেম, তুমি আমাকে লাখ টাকা মূল্যের একটি হার দিয়েছ। এসকল স্ত্রীধন, বোধ হয় এর উপর আমার অধিকার আছে। সেগুলি এই হলঘরের দেয়ালে-আঁটা লোহার আলমারীটায় ছিল, আমি নিয়ে চল্লুম। নিতান্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে আমি এ গুলি নিয়ে যাচ্ছি, জানবে।

কিন্তু তুমি যদি মনে কর—এগুলি আমার নেওয়া ভাল হয় নি, তবে কয়েকখানি বড় খবরের কাগজে এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিও যে তোমার

বাড়ী হ'তে গয়না ও নগদ নিয়ে আড়াই লক্ষ টাকা চুরি গেছে, যে ধরে দিতে পারবে, সে পুরস্কার পাবে। এই বিজ্ঞাপন দিয়ে ইচ্ছা হয় পুলিসে খবর দিও। আমি যে উপায়ে পারি তোমাকে সেগুলি পাঠিয়ে দেব। পোষ্টাফিসে ইন্‌সিওর পার্শেল করে, মিথ্যা নাম দিয়ে পাঠাব ও যে পোষ্টাফিস্ হ'তে পাঠাব তার ৩।৪ দিনের পথের মধ্যে আমি থাক্‌ব না, সুতরাং সেই সূত্রে আমায় ধর্‌তে পার্‌বে না।

"আমি বিবাহিতা স্ত্রী হ'য়ে তোমার কাছে যে সকল অপরাধ করেছি, তার জন্য মাপ চাইবার আমার মুখ নেই, সুতরাং বৃথা কথা বাড়িয়ে কোন ফল নাই।

ইতি—শ্রীমতী জ্ঞানদায়িনী দেবী।"

চিঠিখানি পড়ে বজ্রাহতের ন্যায় কিশোর রায় বসে পড়্‌লেন। জীবনে কোন সুখ ছিল না, "জ্ঞানদা তোমার আঁচলের হাওয়াটা মাঝে মাঝে গায়ে লাগ্‌ত, তাতেই জুড়োতেম—এত কষ্ট সয়ে তার পুরস্কার স্বরূপ তোমার মুখখানি একবার দেখ্‌তেম, তাতেই জুড়োতাম্। তুমি ত আমার সঙ্গে হেসে কথা কও না, তবুও পরের সঙ্গে কথা কইতে যেয়ে যে হাস্‌তে, আমার তৃষিত চক্ষু ঈর্ষা ভরে সেই হাসিটুকু যেন অমৃতের মত পান কর্‌ত। জ্ঞানদা তা' হ'তে আমাকে বঞ্চিত কর্‌লে? বাবাজির কথা কেন শুন্‌লেম না। কেন কুলুপ আটকাতে গেলুম। আমার পক্ষে জ্ঞানদার মুখখানি দেখাই যে চূড়ান্ত ভাগ্য ছিল, তার উপর বেশী আশা কর্‌তে কেন গেলাম? সে ঐ খাটে থাক্‌ত, আমি আমার খাটে থাকতুম, দুইজনের মধ্যে ৫০ ফিট্ হলের ব্যবধান, তবু আমার মনে হ'ত একই হাওয়া দুইজনকে স্পর্শ ক'রে আছে তাতেই যে জুড়িয়ে যেতাম—হায় জ্ঞানদা, তোমায় জীবনে না দেখে থাক্‌ব কেমন ক'রে?"

এক ঘণ্টা চলে গেল—এখন আড়াইটা বেজেছে। হঠাৎ কিশোর রায় চম্‌কে উঠ্‌লেন। কাল সকালে কি হ'বে? জ্ঞানদার কলঙ্ক যে কাল জগৎ জুড়ে প্রকাশ হবে। বড় ছেলে সুন্দরনাথের মুখখানি যে কাল এই সব শুনে বিবর্ণ হ'য়ে যাবে—আমি যে কোন্ পাতালে যাব, তার ঠিক নেই। ঐ ঘরের ঔষধের আলমারীটার হাইড্রোসেনিক এসিড্ আছে, বাড়ীর ডিস্পেন্সারির জন্য আনা হ'য়েছে। এখনই তার মুখ-বন্ধটা খুলে দিয়ে নাকের কাছে নিলেই ত অমনি এই সমস্যা হ'তে মুক্তি পেতে পারি, আমার পক্ষে সেই মুক্তিই দুর্ল্লভ, কারণ এর পরে বেঁচে থেকে কি কর্‌ব? কিন্তু নিজে মুক্তি পেয়ে —এই রাজবাড়ীকে তো দুর্ণাম হ'তে মুক্তি দিতে পার্‌ব না, ছেলেদের দেখে সকলে মনে মনে ঘৃণা কর্‌বে! তাদের ফিস্ ফাস্ ক'রে ঠাট্টা করা ও মুখ বেঁকান দেখে ছেলেরা যে লজ্জায় মরে যাবে, সকলে বল্‌বে রাজা রাজীবের পুত্রবধূ···। এ হ'তে দেব না, তুমি আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়া, তুমি যাই কর না কেন, আমার বুক সে বজ্রাঘাত স'য়ে থাক্‌বে, কিন্তু আমি তোমাকে কলঙ্কের হাত হ'তে রক্ষা কর্‌ব।"

এই ঠিক ক'রে কিশোর রায় দেরাজ হ'তে একখানি কাগজ বের ক'রে লিখ্‌লেন।

"সুন্দরনাথ, আমি ও তোমার মা তীর্থ দর্শনে চল্লুম। সারাটি জীবন ঝগড়া ক'রে কাটিয়ে তীর্থ-স্থানে ঝগড়া মিটুতে পারি কি না দেখ্‌ব। আর বাড়ীতে শীঘ্র ফির্‌ব না, তোমার বয়স এখন ষোল, আর দুই বছর পরে ষ্টেট্ তোমার হাতে পড়্‌বে। দেওয়ান শ্যাম-সুন্দর ঘোষের নিকট জমিদারী কার্য্য শি'খ, এবং অন্ততঃ ৪ বছর পরে জমিদারীর প্রত্যেক স্থানে গিয়ে প্রজাদের অভাব অভিযোগ নিজে শুন। তোমাদের জানিয়ে গেলে হয় ত তোমরা বাধা দেবে—এজন্য

লুকিয়ে গেলুম। তোমার মাতাই এই ব্যাপারে আমাকে লইয়েছেন। ছোট ভাই বোনদের আগ্‌লে থেক, যেমন আমরা ছিলেম। আমাদের হাতে টাকা আছে, দরকার হলে দেওয়ানকে চিঠি লিখ্‌ব। তোমার সর্ব্ব কনিষ্ঠ প্রীতিনাথ এখন ছয় বছরের, তাকে চোখে চোখে রেখ। আমাদের জন্য কাঁদ্‌লে, ব'লো আমরা তার জন্যে সোণার টিয়ে পাখী আন্‌তে গেছি। বাবা

এই চিঠি লিখে ছেলেদের জন্য দুই মিনিট কাঁদ্‌লেন—সে অশ্রু মুছ্‌লেও ফুরায় না। জ্ঞানদা এদের ছেড়ে কি ক'রে থাক্‌বে? না হয় আমাকেই ছাড়্‌লে। আব্বার চোখের জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

তখন নিজেই দেরাজ হ'তে বস্ত্রাদি নিয়ে একটি ব্যাগের ভিতর পুরে—বারেণ্ডায় এসে আলো জ্বালিয়ে চাকরদের ডাক্‌লেন, বড় মটর গাড়ীর সোফারকে ডাকিয়ে এনে বৈঠকখানায় ব'সে চাকরদের বিদায় করে দিয়ে তাকে বল্লেন, "৩টা ১০ মিনিটের একখানি গাড়ী মোগলসরাই যাবে—আমি ও রাণী সেই গাড়ীতে যাব। তুমি একথা এখন কাউকে বল'না। মোটর আস্তে সাজিয়ে এনে অন্দরের খিড়কির দরজায় রাখ।"

সুন্দরনাথ প্রত্যহ প্রত্যুষে হল ঘরের সংলগ্ন তাদের শয়ন প্রকোষ্ঠ থেকে উঠে এসে তার মায়ের একটা খোলা বাক্সে রক্ষিত হীরার বড় ওয়াচটাতে চাবি দিয়ে যায়। সেই ওয়াচটার কাছে কিশোর রায়চিঠিখানি রেখে নিজেই ক্ষুদ্র ব্যাগটিকে হাতে ক'রে খিড়কির দরজায় প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌লেন। সোফার গাড়ী আন্‌লে তাকে বল্লেন, তুমি দেখে এস সদর দরজা খোলা আছে কি না, না থাক্‌লে তেওয়াড়িকে বলে এস খুলে দিতে। সোফার চলে গেলে তিনি গাড়ীতে যেয়ে বস্‌লেন,

সে ফিরে এসে বল্লে "গেট খোলা আছে—রাণীমা কি গাড়ীতে উঠেছেন ?" "উঠেছেন" এই উত্তর শুনে সোফার গাড়ী ছেড়ে দিল।

সিন্দূরতলার দিকে কিশোর রায় একবার অশ্রুপূরিত চক্ষে দৃষ্টি কর্‌লেন। সমস্তটি গ্রাম নিদ্রার ক্রোড়ে শান্তি লাভ কর্‌ছে। এই গ্রামের অশান্ত বিনিদ্র দুর্ভাগ্য আজ চলে গেল। "এখানকার সকলে যেন সুখে থাকে" এই প্রার্থনা জানিয়ে কিশোর রায় পুনর্ব্বার জ্ঞানদার কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লেন।

৩টা ১০ মিনিটের সময় মটর ষ্টেশনে পৌছল। কিশোর রায় শোফারকে বল্লেন, "তুই দেখে আয় ষ্টেশন মাষ্টার কোথায় আছেন ?"

সোফার চলে গেল। গ্লাড্‌ষ্টোন ব্যাগটি হাতে করে রাজাবাবু মটর থেকে একটু দূরে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন। কিছুকাল পরে তিনি দেখ্‌লেন সোফার তাঁকে খুঁজ্‌ছে—তখন দূর হ'তে বল্লেন "কিরে খবর কি ?" সে বল্লে "হুজুর তিনি আফিস ঘরে আছেন" এই বলে সে তাঁর দিকে এগিয়ে আস্‌ছিল, তিনি তাকে আস্‌তে মানা ক'রে বল্লেন, "যা তুই ফিরে, আমরা গাড়ীতে উঠিগে।"

সোফার চলে গেল! কিশোর রায় ধীর পাদক্ষেপে আফিসে গিয়ে একখানি বৃন্দাবনের টিকিট চাইলেন। "কোন ক্লাসের ?" প্রশ্নের উত্তরে "থার্ড ক্লাসের", এই বলে একখানি একশত টাকার নোট ফেলে দিয়ে তার বাকী টাকা নেওয়ার প্রতীক্ষা না ক'রে থার্ডক্লাসের গাড়ীর ভিড় ঠেলে এক কোণায় বসে রইলেন। উপরের শ্রেণীতে কোন চেনা লোকের সঙ্গে পাছে দেখা হয়, এই ভয়ে তিনি থার্ড ক্লাসই পছন্দ করেছিলেন।

হরিদ্বারের সেবাশ্রমে কানাইবাবাজিকে সব্বাই চিন্‌তো। রাখাল মহারাজের শিষ্যেরা তাঁকে গুরুর ন্যায়ই মান্য কর্‌ত। একদিন কানাই বাবাজি একজন সৌম্যমূর্ত্তি গৌরবর্ণ প্রৌঢ় ব্যক্তিকে নিয়ে সেবাশ্রমে উপস্থিত হ'লেন। "ইনি সেবাধর্ম্মে দীক্ষা চান—ইঁহার পরিচয় সম্বন্ধে আপনারা কোন প্রশ্ন কর্‌বেন না। এঁকে কিশোরানন্দ ব'লে ডাক্‌বেন।"

কিশোর রায় এই ভাবে হরিদ্বারের রামকৃষ্ণাশ্রমে সেবাব্রত গ্রহণ ক'রে, রুগ্ন ও আর্ত্তের পরিচর্য্যা কর্‌তে লাগ্‌লেন। আশ্রমবাসীরা দেখ্‌তে পেলেন, কিশোরানন্দ অতি অল্পভাষী, যে কোন কার্য্যের ভার নিয়ে তিনি তাহা যথাসাধ্য চেষ্টার সহিত করেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে নিজের কৃতিত্ব নির্দ্দেশক কোন কথা কারুকে বলেন না। কেউ প্রশংসা কর্‌লে মাথা নত ক'রে চলে যান। যখন রুগ্ন ব্যক্তি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'রে চীৎকার কর্‌তে থাকে, তখন দিন নাই, রাত নাই; পাথরের মূর্ত্তির ন্যায় তাঁর শয্যায় বসে শুশ্রূষা করেন; কখনও পাখা দিয়ে হাওয়া করেন, কখনও মাথায় জলপটি দিয়ে বেদনা উপশম কর্‌তে চেষ্টা করেন, কখনও বা কারু ক্ষত স্থানে প্রলেপ দেন, কখনও তিক্ত কটু ঔষধ সেবনে অনিচ্ছুক বালককে স্নিগ্ধ বাক্যে বশীভূত ক'রে ঔষধ খাওয়ান, কখনও ষ্টোভে বসে বার্লি জ্বাল দেন, কিম্বা হরলিক্ অথবা এলেন বাড়ী প্রস্তুত করেন।

যথন আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীরা একত্র বসে নানারূপ গল্প ক'রে হাসির উচ্চ শব্দে আশ্রমটি কাঁপিয়ে তোলেন,—তখন কিশোরানন্দ হয়ত রোগীদের কা্র কি দরকার জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছেন। তিনি সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মেশেন না। যেখানে দুঃখ বিপদ, সেখানে তিনি আছেন, কিন্তু যেখানে গল্প-গুজব, হাসি-তামাসা সেখানে তিনি নাই। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কিশোরানন্দকে কেউ কখনও হাস্‌তে দেখেনি। তাই বলে যে তার মূর্ত্তির অটুট গাম্ভীর্য্য দেখে লোক ভীত হ'তো তা নয়, তাঁর চক্ষে একটা করুণ প্রশান্ত ভাব ছিল, যাতে সকলে—বিশেষ রুগ্ন ব্যক্তিরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত, এবং তাঁর গাম্ভীর্য্য সর্ব্বদাই শ্রদ্ধার উদ্রেক কর্‌ত।

আর একটি বিশেষত্ব এই দেখা গেল যে সন্ন্যাসী দিনরাত্রে খুব অল্প সময় নিদ্রার সুখ ভোগ করেন। যখন সমস্ত আশ্রম নীরব, শ্বাস-প্রশ্বাসে দৈহিক আয়াস সূচনা ক'রে সকলেই নিদ্রার অধিকারে তাঁদের নিজেকে সমর্পণ করেছেন, তখন যদি হঠাৎ কেউ জাগ্‌তেন তবে দেখ্‌তে পেতেন, একজানুর উপর এক খানি হাত প্রসারণ ক'রে অপর হস্ত গণ্ডে রক্ষা করে বসে বসে কিশোরানন্দ কি ভাব্‌ছেন। সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কেউ উৎসুক হ'য়ে কিশোরানন্দ কি করেন তার শেষ পর্য্যন্ত দেখার জন্য কৌতূহলী হ'য়ে নিদ্রার ভাণ করে তাঁর কার্য্যাবলী লক্ষ্য করে দেখেছেন,—এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা কাল চিত্রার্পিত নিস্পন্দ মূর্ত্তির ন্যায় গালের উপর হাত রেখে কিশোরানন্দ কি ভাব্‌ছেন, একঘণ্টা দুই ঘণ্টা পরে কখনও একটি গভীর নিশ্বাসে যেন তাঁর পাঁজর ভেঙ্গে পড়েছে। আবার সেই প্রশান্ত দুঃখের ভাবে স্থির হ'য়ে তিনি বসে রয়েছেন, কিম্বা কোন রোগীর যন্ত্রণা সূচক শব্দ শুনে কি ঘড়ীতে তার পথ্য অথবা ও ঔষধ সেবনের

সময় জেনে তাড়াতাড়ি উঠে তার কাছে চলে গেছেন। আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীরা তাঁকে শ্রদ্ধা করত, অথচ তার জীবন যে কোন দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা জড়িত, তা বুঝ্‌তে পেরে জান্‌বার জন্য কৌতূহলী হ'য়ে থাক্‌ত।

আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেখা গেল যে তাঁর আগমনের পর থেকে মাঝে মাঝে অজ্ঞাত নাম ধাম কোন ব্যক্তি প্রায়ই সেই আশ্রমে ডাক যোগে টাকা পাঠাতেন, এই ভাবে প্রচুর অর্থ আস্‌তে লাগ্‌ল। কোন রুগ্ন বৃদ্ধ, যুবক বা স্ত্রীলোক যদি তাঁদের বাড়ীর আর্থিক দুর্গতির কথা ব'লে আক্ষেপ কর্‌তেন, তবে শেষে জান্‌তে পার্‌তেন, কেউ তাঁদের সাহায্যের জন্য নিজের নাম গোপন ক'রে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

এই ভাবে প্রায় দু বছর কেটে গেল। এই দু বছর কর্ত্তব্যের যন্ত্র স্বরূপ রাত দিন কিশোরানন্দ রোগীর পরিচর্য্যা করেছেন। এই দুই বছর তিনি সন্ন্যাসীদের কথাবার্ত্তা কি আশ্রম সম্বন্ধীয় কোন তত্ত্ব জান্‌বার জন্য কোন কৌতূহল দেখান নাই। এই দুইবছর তিনি কাহারও সহিত মেশেন নি,—কাহারও কোন কথায় থাকেন নাই, তথাপি সকলে জান্‌তেন, বিপৎকালে ইনি যতটা করবেন, আর কেউ ততটা করবেন না। জলের ফোঁটা যেরূপ তার সবখানি কচু পাতার উপর রেখে নিজেকে তবুও আলগা ক'রে রাখে, কিশোরানন্দ তার সবখানি চেষ্টা সেইরূপ সেবা কার্য্যে বিলিয়ে দিয়েও যেন নিজেকে নির্লিপ্ত রাখ্‌তেন।

একদিন সকাল বেলা, মাঘমাসের শীত। উত্তরে হিমালয় হ'তে কন্‌কনে শীতের হাওয়া দিচ্ছে। বেলা ৯ টার সময় ও শীত ভাঙ্গেনি, খুব মোটা কম্বলের আল্‌খাল্লা গায়ে দিয়ে সন্ন্যাসীরা আশ্রমের বাইরে একটা মাঠের কাছে দাঁড়িয়ে হল্লা কচ্ছেন। সেখানে শীত হ'তে ত্রাণ কর্‌বার জন্য সূর্য্যদেব উদয় হ'য়ে মাঠটাকে রৌদ্রময় করে তুলেছেন। সন্ন্যাসীদের খুব উচ্চ হাসি শোনা যাচ্ছে। নিকটবর্ত্তী একটি বাঙ্গালী পরিবারের ছেলেদের মধ্যেও দুচার জন সেই হাসিতে যোগ দিয়েছে। আর একটা অনুনাসিক সুরে তর্জ্জন গর্জ্জন এবং মাঝে মাঝে সেই সুর-টার কান্নার রব শোনা যাচ্ছে।

একটা বাউলকে ঘিরে—এই ব্যাপারটা হচ্ছে। তার বয়স ৪০।৪২ হবে। চিবুকের নীচে খোঁচা খোঁচা দাড়ী, গণ্ড ও কপালের চর্ম্ম কুঞ্চিত হ'য়ে মুখখানিকে কতকটা এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো মত ক'রেছে; মাথার সামনে অল্প চুল, পাছের দিকে টিকিটা এমন ঘন ঘন নড়্‌ছে, যেন মনে হচ্ছে, ভূমিকম্পে গাছ কেঁপে উঠ্‌ছে। বাউলের গায়ে লাল, কালো প্রভৃতি বিবিধ রংয়ের বস্ত্রের টুকরাতে তালিমারা একটা আল্‌খাল্লা, গলায় বড় বড় গোল গোল কালো বিচির মালা এবং হাতে একটা অজগরের মত আঁকা বাকা মোটা গাছের শেকড়ের লাঠি! প্রথমতঃ আশানন্দ বাউল এসে তার গান গাওয়া শুরু করে দিলে, তার একহাতে একটা চামের ছাউনি ডুগ্‌ডুগির মত ছিল। সে সেইটি চটাপট্ আঙ্গুলের শব্দে বাজিয়ে গাচ্ছিল—"আমি কতদিনে ফাইবাম্ গো রামের যুগল পদ অ।" টিকিটা যেন কেন্দ্রাতিগ শক্তিতে ঘোর চেষ্টায়

মাথাটা ছেড়ে যাবার মতলব কচ্ছে। গানের তালে তালে সর্ব্বাঙ্গ ঘোর নাড়া পড়্ছে। মাথাটা ঝড়ের সময় মাচার উপর কুমড়ো যেমনধারা গড়িয়ে গড়িয়ে এদিক ওদিক যায়—সেরূপ গড়াচ্ছে। আর চারদিকে সন্ন্যাসীরা তাঁকে ঘিরে রেখে হাস্ছেন। সন্ন্যাসী হলেও তাদের মধ্যে অনেকে নবযুবক ছিলেন, সংযম ভেঙ্গ করে বয়সের ধর্ম্মটা জোর কচ্ছে। সন্ন্যাসীদের ঐরূপ আমোদ করতে দেখে—পাড়ার কয়েকটা ছোঁড়া জুটে খুব জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছে।

আশানন্দ তারপর "রামের যুগল পদ অ" ধুয়াটা ছেড়ে রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডটা গান করতে সুরু কল্লেন,—এই কাণ্ডটা গাইতে গিয়ে সে যে কাণ্ডটা সুরু করলে, তা আসর জমাবার পক্ষে ধুয়োর চেয়ে বড় কম নয়। ডান হাতটাতে ডুগ্‌ডুগিটা উঁচু ক'রে ধ'রে, বাঁ হাতে লাঠি গাছা সড়্কীর মত ক'রে সোজা ভাবে হাওয়ার ভেতর চালিয়ে দিয়ে ব্যাঙের মত লাফাতে লাফাতে গাইতে বা চীৎকার ক'রে বল্তে লাগ্লেন :—

"আরে হনুমানে দশাননে যুদ্ধ লাগিল্।
আরে গলায় হাত দিয়ে তারে জলে ঠাসিল্॥"

তার আদত বাড়ী ছিল আসাম অঞ্চলে, গানে সেই ভাবাটা রয়ে গেছে। উত্তেজনার চোটে শেষে ডুগ্‌ডুগিটা ও লাঠিগাছটা ফেলে দিয়ে উভয় হাতে যেন কাউকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরেছে, এই রকম ক'রে গাইতে লাগ্ল,—"যুদ্ধ লাগিল্।"

সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ দোলাচ্ছে। মেলার সময় ছেলে মেয়েরা যেরূপ দোলায় উঠে দোল খায়, বাউলজির শরীরটা আলখাল্লার মধ্য থেকে তেমনই দোল খাচ্ছে। তারপর গলাটা টিপে ধরবার মত হাতের

ভঙ্গী ক'রে "গলায় হাত দিয়ে" কথাটার উপর এমনই জোর দিয়ে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লো, যে সত্যই মনে হ'ল যে সে কারু গলাটি টিপে ধ'রে তাকে জলে ঠেসে ধরেছে।

ছেলেদের মধ্যে, এমন কি নবীন সন্ন্যাসীদের মধ্যেও এমনই হাসির রোল উঠেছে, তারা হাতে তালি দিচ্ছে, কেউ কেউ পিঠ চাপড়িয়ে বাউলকে এমনই উৎসাহ দিচ্ছেন, যে আশানন্দের গানের উত্তেজনা ক্রমশঃ বেড়ে উঠ্‌ছে। সে বুঝ্‌তে পারে নি এগুলি হাসি ঠাট্টা। তবে আশানন্দের এই আগুণে পোড়-খাওয়া প্রকৃতিটার একটা দিক একটু কম শক্ত ছিল। তাকে কেউ চটাতে পার্‌ত না, ঠাট্টাকে সে প্রশংসা মনে করে নিত, কিন্তু যদি কেহ থুথু দেওয়ার ভয় দেখিয়েছে, তখন তার অটুট ধৈর্য্যের বাঁধ একবারে ভেঙ্গে গেছে। বালকেরা তাকে এই অবস্থায় থুথু দেওয়ার অভিনয় ক'রে দেখাতে লাগ্‌ল।

আর যাবে কোথা? অমনি আশানন্দ গান থামিয়ে চীৎকার করে কাঁদতে সুরু ক'রে দিল। সে কান্না প্রায় ক্রোশ খানেক পথ হ'তে শোনা যেত—তা এমনই বিকট। আশ্রমের অধ্যক্ষ প্রেমানন্দ মহারাজ এই চীৎকার শুনে মঠের দিকে চলে এলেন, তাঁকে দেখে সন্ন্যাসীরা চুপ ক'রে দাঁড়ালেন এবং বালকেরা পালিয়ে গেল।

আশানন্দ টিকি দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এসে নাকি সুরে বল্লে "মহারাজ, এরা থুথু দিচ্ছে।"

প্রেমানন্দ মহারাজ একটু রুক্ষ সুরে সন্ন্যাসীদেরে বল্লেন—"কেন তোমরা এঁকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা কচ্ছ। জিহ্বার সংযম—সন্ন্যাসীর একটা প্রধান সংযম।" এই বলে এক জন সন্ন্যাসীকে তিনি আশানন্দকে আশ্রম হ'তে আটা গুড় ভিক্ষা দিতে বল্লেন।

আশানন্দ হাত জোড় করে বল্ল "পেয়েছি।"

প্রেম…"কি পেয়েছ ?"

আশা…"টাকা।"

প্রেম…"কিসের টাকা ?"

আশা…"আজ্ঞে, রূপোর টাকা, এক টাকা।"

প্রেম…"কে দিলে ?"

আশা…"মিছিরগঞ্জের লোকেরা টাকা দিয়েছে।"

প্রেম…"কি জন্য ?"

আশা…"ওঃ, তাই তো সব ভুলে মেরে গিয়েছিলেম! রামনাম গান করতে গিয়ে আর আমার কিছুই মনে থাকে না। মিছির-গঞ্জের দক্ষিণে মাঠের কাছে একটা বড় বকুল ফুলের গাছ আছে না? —আজ্ঞে, যার নীচে জহরলাল পোদ্দারের মেয়েরা রোজ সকালে ফুল কুড়োয়, আর যেখানে ঐ রাম সদ্দারের দুষ্টু ছেলেরা আমার বাউলের টুপিটা কেড়ে নিয়ে গেছ্‌ল।

প্রেম…"সেই বকুল গাছের কি হ'য়েছে ?"

আশা…"কাল শেষ রাত্রে লণ্ঠন হাতে নুনিয়া চোবে সেইখানে দিয়ে ভিন্ন গাঁয়ে যাচ্ছিল। সে একটা চাপা কান্নার আওয়াজ শুনে গিয়ে দেখে একটা স্ত্রী লোক গাছতলায় পড়ে গোঁ গোঁ কচ্ছে। মিছিরগঞ্জের লোকেরা খবর পেয়ে দেখতে গেছল, আমিও সেখানে ছিলুম—দেখ্‌লুম সাক্ষাৎ ভগবতী— আধ বয়সী স্ত্রীলোকটি—কি সুন্দর! কে যেন খুব প্রহার ক'রে মড়ার মতন ক'রে ফেলে গেছে। আমার তাঁকে দেখে কান্না পেলে। গাঁয়ের লোকেরা বল্লে—"এঁকে সেবাশ্রমে পাঠান হো'ক।" রামটহল বল্লে, "তাঁদেরে আগে খবর দেওয়া যাক্, তাঁরাই এসে নেওয়ার বন্দোবস্ত করবেন। দেরী হ'লে মারা যাবেন। কে খবর দিতে যাবে ?" সব্বাই বল্লে "আশানন্দ তো প্রায়ই আশ্রমে যায়,

প্রেমানন্দ মহারাজ ওঁকে চেনেন, ওঁকেই পাঠান হো'ক।" আমি বল্লুম "আজ সকাল বেলাটা যদি ভিখ্ শিখ্ না করি, তবে পেট চল্‌বে কিসে?" রামটহল অমনি কোমর থেকে একটা টাকা বার ক'রে দিয়ে বল্লে—"যাও আশানন্দ, এখন প্রায় ৫টা বাজ্‌বে, দুই ঘণ্টার মধ্যে যাতে খবর পৌঁছে যায়, তাই কর।" অমনি ডুগডুগিটা আর লাঠিগাছটা আমার খড়ো ঘরের থেকে নিয়ে ছুটে এসেছি।"

প্রেম……"এসে বুঝি দুই ঘণ্টা এখানে লাফালাফি কচ্ছ! আসল কথাটা একবারে ভুলে গেছ্‌লে।"

আশা……"ঐত, মহারাজ, রামনাম গান কর্‌লে আর কিছু আমার মনে থাকে না।"

আর বিলম্ব মাত্র না ক'রে অমনি প্রেমানন্দ একখানা দোলার সহিত দুইজন সন্ন্যাসীকে মিছিরগঞ্জে পাঠিয়ে দিলেন।

দুই ঘণ্টা পরে বেলা ১২টার সময় সেই স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে দোলা ফিরে এ'ল।

রমণী অসামান্য রূপবতী, সর্ব্বাঙ্গে প্রহারের চিহ্ন। গোপাল ডাক্তার পরীক্ষা করে বল্লেন, বুকের কাছের একখানি হাঁড় ভেঙ্গে গেছে, গায়ে খুব জ্বর, বাঁচবার আশা নেই। রমণীর সৌন্দর্য্য একটুও টুটে নাই, প্রফুল্ল শতদলের মত মুখখানি, জ্বরের আতিশয্যে বড় বড় চোখ দুটি মুদিত হ'য়ে আছে। একখানি জরির পাড়দার ভাল ঢাকাই শাড়ী পরে আছেন, কিন্তু নূতন শাড়ী খানি বোধ হয় প্রহার কর্ত্তার আক্রমনে মাঝে মাঝে ছিঁড়ে গেছে। একখানা কাশ্মীরি শাল গায়ে—তাতে ধূলো মাটি লেগে আছে, ও জায়গায় জায়গায় কাদায় আদ্র হ'য়ে রয়েছে। তাঁর দুই হাতে দুগাছা স্বর্ণমণ্ডিত লোহা। তিনি আয়তের চিহ্ন এখনও ছাড়েন নাই, আর কোন অলঙ্কার গায়ে নাই।

তিনি যে বড় ঘরের মহিলা তা কারু বুঝ্‌তে বাকি রইল না।

যে ঘরে মহিলাটিকে রাখার ব্যবস্থা হ'ল,—বেলা তিনটার সময় সেই ঘরের বারেণ্ডায় দাঁড়াইয়া ৩।৪ জন সন্ন্যাসী কথা বার্ত্তা বল্‌ছিলেন, সেখানে কিশোরানন্দও ছিলেন, একজন তাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন—"সেই বেতো রোগীর অবস্থা এখন কি?"

কিশোরানন্দ......"ইনি একটু ভাল হচ্ছেন, বলেইত মনে হয়। একবার দেহটা অসাড় হ'য়ে গেছ্‌ল, একমাস হ'ল বেশ উঠে ব'সে খেতে পারেন, কাল লাঠি গাছা ধরে ধ'রে বারাণ্ডায় একটু বেড়িয়ে ছিলেন।"

"তা আর হবে না? আপনি দিন রাত জেগে ওর যে সেবা কচ্ছেন, এতেও যদি না হয়!"

কিশোরানন্দ বল্লেন, "ডাক্তারি ঔষধ মোটেই খেতে চাচ্ছেন না, বল্‌ছেন, রজনী কবিরাজকে ব্যবস্থা করতে, আমি বল্লেম, "ডাক্তারি ঔষধে যখন উপকার হয়েছে, তখন এই চিকিৎসা চলুক"—তা কিছুতেই শোন্‌বেন না, প্রেমানন্দ মহারাজকে বল্‌তে হবে দেখ্‌ছি।"

সেই সময় সেই মহিলার ঘর থেকে একটি সন্ন্যাসী ছুটে এসে বল্লেন, "দেখুন, গোপাল ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে এর জ্ঞান হয়েছিল, তিনি মাথা আস্তে উঠিয়ে দুধ বার্লি খেয়েছিলেন—এবং অতি মৃদুস্বরে "একটু জল দিন্‌" একথা বলেছিলেন। কিন্তু আপনারা যে বারাণ্ডার কথা বল্‌ছেন—তা হঠাৎ কান পেতে শুনতে লাগ্‌লেন—তারপর 'মাগো' ব'লে অস্ফুট চীৎকার ক'রে শালটা দিয়ে আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে নিস্পন্দ হ'য়ে পড়ে রয়েছেন। গোপাল ডাক্তারকে কি খবর দেব?"

কিশোরানন্দ বল্লেন—"আমরা এখানে গোলমাল কচ্ছি—তা' হয়ত সহ্য ক'র্‌তে পাচ্ছেন না, অতি দুর্ব্বল স্নায়ু! চলুন, আমরা এখান থেকে চলে যাই। আর গোপাল ডাক্তারকে খবর দিন্‌।"

এই রমণীর আগমন সম্বন্ধে কিশোরানন্দ কিছুই জানেন না; ইঁহার এ সমস্ত ব্যাপারে কোন কৌতূহলই ছিল না। যখন যে কাজের ভার পেতেন, তখন তা' নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

বেলা ৪টার সময় কিশোরানন্দের নিকট খবর এল, মহারাজ আপনাকে ডাক্‌ছেন। কিশোরানন্দ প্রেমানন্দ মহারাজের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হ'লে মহারাজ তাঁকে বল্লেন—

"একটি বিশিষ্ট ঘরের মহিলাকে আমাদের সেবাশ্রমে আনা হ'য়েছে, আপনি শুনেছেন?"

"শুনেছি মহারাজ।"

গোপল ডাক্তার বল্‌ছেন—এঁর জীবনের আশা নেই—তথাপি যাবৎ শ্বাস, তাবৎ আশ, পুলিশে খবর পাঠান হ'য়েছে।

"আমায় কি ক'র্‌তে হবে?"

"আপনার হাতে যে বেতোরোগী ছিল—তিনি অনেকটা সুস্থ হ'য়েছেন। সাধন বল্‌ছেন, আপনি তাকে কষ্ট দিচ্ছেন—যা খেতে চায়, তা দেন না,—পথ্য ঠিক মাত্রার মত দেন, মাথা কুটে মর্‌লেও একটু বেশী দেন না। যদিও আপনি ঠিক মায়ের মত তার সেবা করেন এবং সেও আপনাকে না দেখ্‌লে উতলা হ'য়ে পড়ে, তবু আপনার ব্যবহার অতি কঠোর। ঠিক ডাক্তারের কথা কি কোন রোগী আখরে আখরে পালন "কর্‌তে পারে?"

কিশোরানন্দ বল্লেন—"দুই একবার তাঁর আবদার রাখ্‌তে গেলুম, তাতে ব্যারাম বেড়ে কি কষ্টই না পেয়েছেন।"

"তা যা হোক, আপনাকে আর একটি রোগীর ভার নিতে হ'বে। সাধনানন্দ বেতো রোগীকে দেখ্‌বেন, তিনি যে আপনার চেয়ে ওঁর আবদার বেশী রাখ্‌বেন, তা নয়, তবু নূতন লোকের হাতে একটু বেশী

স্বাধীনতা পাবেন এই আশায় আপনার অভাবটা তিনি বেশী অনুভব করবেন না। আপনাকে অন্যত্র বিশেষ দরকার হ'য়েছে। গোপাল ডাক্তার বলছেন "মহিলাটির শুশ্রূষা, পথ্য ও ঔষধের রীতিমত ব্যবস্থার জন্য কিশোরানন্দকে চাই। তিনি ছাড়া আর কারু উপর সে ভার রাখাই যেতে পারে না। মহিলাদিগের জন্য পরিচারিকা বন্দোবস্তত আছেই। কিন্তু একজন দায়িত্ব পূর্ণ লোকের দিনরাত পরিচর্য্যার দরকার, কারণ রোগীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। লোক বলে আপনি আশ্রমে এসে লক্ষ্মণের মত ঘুমকে বিদায় ক'রে দিয়েছেন। আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে এটা যতই খারাপ হউক না কেন, রোগীদের চৌকি দেওয়ার পক্ষে শুশ্রূষাকারীর জাগরণটা মন্দ নয়। আপনার হাতেই এই মহিলার ভার আমি দিতে যাচ্ছি।"

"আপনি যা বলবেন তাই করব।"

গোপাল ডাক্তার সেইদিন পাঁচটার সময় স্ত্রীলোকটিকে আর একবার পরীক্ষা ক'রে বলে গেলেন—"জ্ঞান হ'য়েছে সত্য, কিন্তু যে কোন সময়ে প্রাণ যেতে পারে। তবে কিশোরানন্দ এসে এঁর ভার গ্রহণ কচ্ছেন, আমাদের যতটা সাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হ'বেনা।"

কিশোরানন্দ এসে দেখলেন—রুগ্ন মহিলাটি আপদমস্তক একখানি কাশ্মীরি শালে মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। ডাক্তারের উপদেশ মত তিনি ঔষধ খাওয়াতে গেলে তিনি শালের অবগুণ্ঠন দিয়ে মুখখানি আরও বেশী মুড়ে সুড়ে থাকলেন। কিশোরানন্দ দেখলেন—রমণীর জ্ঞান আছে, কিন্তু তাঁর সামনে কিছু খেতে লজ্জা বোধ কচ্ছেন। তখন তিনি ঔষধের মাত্রা কতটা তা'বলে দিয়ে শিশিটা এবং একটা ফিডিং কাপে কিছুজল তার কাছে রেখে দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে এসে দাঁড়ালেন, মহিলা শালের মুড়ি হ'তে দুইটি আঙুল দিয়ে মুখ বার

ক'রে আস্তে ঔষধ পান কল্লেন এবং একটু জল খেয়ে পুনরায় মুড়ি স্নুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন। কিশোরানন্দ একটি পরিচারিকাকে ডেকে এনে, নিজে ঘরের বাইরে থেকে রুগ্নার যা দরকার জিজ্ঞাসা ক'রে জান্‌তেন।

পরদিন সন্ন্যাসীরা তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা কল্লে তিনি বল্লেন "ইনি বড় লজ্জাশীলা। ঔষধ পথ্য প্রভৃতি খাওয়াবার সময় সর্ব্বদাই পরিচারিকার দরকার হয়।"

একজন সন্ন্যাসী বল্লেন, "কৈ? আমিত ওঁকে পথ্য খাইয়েছি।"

আর একজন বল্লেন—"হয়ত তখন প্রায় বেহুস্ অবস্থায় ছিলেন, এখন খানিকটা জ্ঞান বেশী হ'য়েছে। সাধনানন্দই ত ওর শুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত হ'য়েছিলেন, কিন্তু গোপাল ডাক্তার বল্লেন, সাধন অক্লান্ত-কর্ম্মা, দিনের বেলা অসুরের মত খাটে, কিন্তু রাত হ'লে ঔষধ পত্র একত্র ক'রে হাতপাখা নিয়ে রোগীকে বাতাস দেবার উপলক্ষে ঢুল্‌তে থাকে, এক একদিন ঠক্ ক'রে রোগীর মাথায় বারংবার পাখাটা ঠেকিয়ে দিয়েছে, তাতে ক'রে রোগী বিষম বিরক্ত হ'য়েছে। আর কোন কোন দিন এমন দেখা গিয়েছে যে ১০ টার সময় শিশির ঔষধের যে দাগ খাওয়ার কথা, ভোর ছটার সময় সেই দাগ ঠিক্‌ই আছে। সাধন খুব জোরে জোরে নাসিকা যন্ত্র হ'তে নিদ্রার সুর টান্‌ছেন।

কিশোরানন্দ সর্ব্বদাই রুগ্না হ'তে একটু দূরে একখানি চেয়ারের বিপরীত দিকে মুখ ক'রে বসে থাক্‌তেন, কিন্তু তাঁর মনে হ'ল যেন মহিলাটি তার দুটি আঙ্গুলি দিয়ে ঘোমটাটি একটু ফাঁক করে অনেক সময় তাঁকে দেখেন। পেছন দিক হ'তে কেউ চেয়ে দেখ্‌লে—তাঁর তা ঠিক বুঝবারে সুবিধা হয় না, তবু যদি কেউ সেরূপ ক'রে, তার একটা আভাস টের পাওয়া যায়। কিশোরানন্দ সেইরূপ একটা

অস্পষ্ট আভাস পেতেন। কিন্তু পর-স্ত্রী সম্বন্ধে এরূপ কোন কথা মনে হ'লে সেটা তিনি মনের কল্পনা বলেই উড়িয়ে দিতেন, এই ভাবে আরও দুদিন চলে গেল। এই দুই দিনের মধ্যে কিশোর রায়ের স্পষ্ট ধারণা হ'ল, তিনি যখন বারেণ্ডায় পায়চারি করেন, তখন মহিলাটির দু'টি চোখ তাঁর অনুসরণ করে। তিনি যখন ঔষধ ও পথ্য দেওয়ার জন্য রুগ্নার বিছানার খুব কাছে আসেন, তখন শালের মুড়ি সুড়ি সত্বেও তাঁর শরীরটা যেন কেঁপে উঠে। এক-দিন রাত্রে মহিলাটি একটু ঘুমিয়েছেন,—সেই ঘুমের ঘোরে তাঁর একখানি পা হ'তে শালটা একটু সরে গেছে। অজ্ঞাতসারে তাঁর চোখ দুটি সেই পা খানির উপর গিয়ে পড়্‌ল—এই পা তার চির-পরি-চিত, তার প্রেমের আশা-সরসীর চির-ইপ্সিত মুক্ত শতদল; এ পাদপদ্মে কি ভ্রম হ'তে পারে? এ যে সিন্দুরতলার রাজপ্রসাদের সোনার চাঁপা! সে দৃষ্টি আর ফির্‌ল না, কিশোরানন্দের মাথা ঘুরে গেল। উন্মত্তের দৃষ্টিতে তিনি সেই শালের জড়াও পাড় হ'তে মুক্ত পঙ্কদল রক্ত-পদ্মের মত পা খানির প্রতি তাকিয়ে রইলেন। অনেক দিন চোখের জল পড়্‌তে দেন নাই, আজ চোখের জল ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারলেন না; কারণ কিশোরানন্দ যে সিন্দুর-তলার কিশোর রায়, সে সম্বন্ধেও যেমন ভুল হ'তে পারে না এ মহিলাও যে জ্ঞানদায়িনী—সেই পা খানি দেখে তার আর ভুল রইল না।

তথাপি তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে সংবরণ কল্লেন। এরমণী যে কেন তাঁকে আড়াল থেকে দেখে চকিতে চক্ষু শালে ঢাকা দেন, কেন তাঁর পাদ-বিক্ষেপের সঙ্গে মহিলার চিত্ত-বিক্ষেপ হয়—এটি আভাসে বুঝ্‌তে পার্‌লেন।

রাত্রি ১০ টা বেজে গেল। রমণী ঘুম ভেঙ্গে পা'খানি তাড়াতাড়ি শাল দিয়ে আবৃত করলেন। ঘুমের আবেশে ডান হাতখানি একবার বের ক'রেছিলেন, তখন কিশোর রায় হাত দেখতে পেয়েছিলেন, এ দুইদিনের মধ্যে অবশ্য ইচ্ছা করলে তিনি পূর্ব্বেই এই অমূল্য আবিষ্কার করতে পারতেন, কিন্তু লজ্জাশীলা কুলবধূ মনে করে তিনি মহিলার নিকট হ'তে দূরে দূরে—চোখ দুটির দৃষ্টি বিপরীত দিকে রেখে—ঐ গৃহের কাজকর্ম্ম করেছেন, এজন্য তিনি দেখতে পারেন নাই। আজ পা'খানি ও ডান হাতের কয়েকটি আঙ্গুল দেখে তার নিশ্চয় প্রতীতি হ'ল, এ তাঁরই জ্ঞানদায়িনী দেবী। পিয়ানো বাজাবার সময় বারং বার শুভ্র কুন্দনিভ এই কয়েকটি আঙ্গুলের মধুর চপল গতি তো তিনি কতবার লোলুপ চক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রেছেন—এতে কি ভুল হ'তে পারে?

এবার হৃদয়ের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় স্বীকার ক'রে তিনি রুগ্নার শিয়রের নিকট উপবেশন ক'রে বল্লেন "তুমি জ্ঞানদা" এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ নাই, একবার ঘোমটাটি খোল—নতুবা আমি খুলি, তুমি অনুমতি কর।"

আস্তে আস্তে জ্ঞানদা নিজেই ঘোমটা খুল্লেন—তার চক্ষু দুইটি জলে ভরা; তিনি চোক্ষের জল মুছলেন না। হাত জোড় করে বল্লেন—"ক্ষমা কর" এই দুইটি শব্দ যে এক ভাণ্ডার খুলে দিল,—"আমি তোমার কোন্ অপরাধ ক্ষমা করি নাই জ্ঞানদা?—জ্ঞানদা, তুমি ক্ষমা কর, আমি তোমায় চাবি বন্ধ ক'রে তাড়িয়েছি, আমায় ক্ষমা কর।"

এই বলে কিশোর রায় কাঁদতে লাগলেন, জ্ঞানদা পুনরায় বল্লেন, "আমার বুকে, অসহ্য বেদনা হচ্ছে, এইবার আমার শেষ।"

কিশোর রায় ডাক্তার ডাকবার জন্য উঠতে গেলেন, জ্ঞানদা

উঠ্‌তে দিলেন না—"এ সময় আমায় ছেড়ে যেওনা, ফিরে এসে পাবেনা, ব'স, আমার মৃত্যুর সময় আমায় ছেড়ে যেওনা। আমি প্রতারিত হ'য়ে সব ছেড়ে ছিলাম। পরের প্রতারণায় আমার এই মৃত্যু উপস্থিত, ভালই হ'য়েছে। আমার মত পতিতা বেঁচে থেকে যদি ভাল হ'তে চাইত, তবে কোথায় গিয়ে ভাল হ'ত? আমার মনে যখন অসহ্য অনুতাপ হয়েছিল, তখন বুঝেছিলেম আমি যে পথে চলে এসেছি—সে পথে আর যেতে পারব না—যে পথ ছেড়ে দিয়েছি সে পথে ত কেউ আমার নেবে না। মরণই আমার একমাত্র পথ,- তুমি তোমার পা'দুখানি এগিয়ে দাও—আজ অনেক দিন যাবৎ ঐ পা দুখানির কথা ভেবে ভেবে কেঁদেছি।"

আবার খানিকটা থেমে জ্ঞানদায়িনী বল্‌তে লাগ্‌লেন "যে দিন বুঝ্‌তে পার্‌লুম—তুমি এখানে আছ, এবং তুমি আমারে শুশ্রূষা কর্‌বে, তখন যথাসাধ্য কাপড় মুড়ি সুড়ি দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখ্‌লুম। মনে হ'য়েছিল এই ঢাকা চাপার মধ্যেই একদিন অন্তিম শ্বাস পড়বে। জীবিত অবস্থায় যেন তুমি আমার এমুখ আর না দেখ।

"তা হ'ল না, ধরা পড়ে গেলাম—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা কচ্ছি, যদি আমার মন না শোধরায়, এবং পরের জন্মেও কুপথে চলি, তবে লম্পট-দস্যুর যেন স্ত্রী হই। কে কাকে কত কষ্ট দিতে পারে, তার প্রতিযোগিতা চল্‌বে। যে জন্মে আমি শুদ্ধ, পবিত্র হব, সেইজন্মে যেন তোমার মতন স্বামী পাই। এ জন্মে তোমায় বড় কষ্ট দিয়েছি,—আর যেন তোমার কষ্টের কারণ না হই। তোমাকে আশা ক'রে জন্ম জন্ম যেন কেটে যায়, কিন্তু কষ্টের শেষ দেবার জন্য যেন তোমায় না পাই।"

জ্ঞানদার চোখে অজস্র জল পড়্‌ছিল, কথা বল্‌তে বল্‌তে বাক্‌রোধ

হ'য়ে গেল—উন্মুক্ত আবেগে কিশোরানন্দ ডাক্তার ডাকতে গেলেন। পরিচারিকাকে ডেকে ব'লে গেলেন, কিন্তু দুই মিনিট পরে এসে দেখেন, জ্ঞানদা আধ-নিমীলিত চক্ষে নিস্পন্দ হ'য়ে শুয়ে আছে, ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে বল্লেন, প্রাণ নাই। তাঁর অতি সুন্দর পদ্মপলাশ চক্ষের একপ্রান্তে এখনও অশ্রু টল্ টস্ করছে। এত আদরের, এত সাধের, এত দুঃখের জ্ঞানদা পরের হাতের প্রহারে প্রাণ দিয়েছেন!

কিশোর রায় আর সেখানে এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারলেন না। সব যে ধরা পড়ে যাবে, চোখের জল যে গড়িয়ে পড়ছে, তা থামাবেন কি ক'রে? চীৎকার ক'রে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে,—একবার একটা অস্ফুট শোকের স্বর বার হ'য়েছিল। এ হ'লে যে সব্বাই ধ'রে ফেলবে। জ্ঞানদায়িনীর কলঙ্কের কথা লোকে জানতে পারবে। কিশোর রায় উর্দ্ধশ্বাসে সেই আশ্রম হ'তে ছুটে চল্লেন।

যে আগুনে দাউ দাউ ক'রে ঘর পুড়ে গেছে,—আশ্রমে সব ছেড়ে এসে আবার সে আগুন লাগলো। সমস্যার পর সমস্যা,—আশ্রমের কাছে মুক্ত মাঠে এসে কিশোরানন্দ দেখলেন, এতদিন কিশোরানন্দ নামের ভাণ ক'রে তিনি একটুও শোধরাণ নাই, যে কিশোর রায় সেই কিশোর রায়ই আছেন। "তোমরা সন্ন্যাসীরা আমাকে সংযমের আদর্শ মনে করেছ, সে সংযম তো আমি প্রাণ-শক্তিতে জোরে টেনে রেখেছিলেম—তারজন্য যে আমি দিন রাত কি সয়েছি তা' আমি জানি, এখন যে বালির বাঁধের ন্যায় সে সংযম ভেসে যায়—এখন তোমাদের কাছে দাঁড়ালেই যে ভণ্ড সন্ন্যাসীকে তোমরা ধরে ফেলবে!"

মহাশোকের মধ্যেও তাঁর একটা বুদ্ধি জাগ্রত ছিল—জ্ঞানদা

ও তার ছেলেদিগকে কলঙ্ক হ'তে রক্ষা করা। আজই যদি আশ্রম ছেড়ে যাই—হয় ত কোন কথা হ'তে পারে। যদিও কেউ ঠিক জান্‌বে না—তবু একটি স্ত্রীলোক প্রাণত্যাগ কল্লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শুশ্রূষাকারী আশ্রম ত্যাগ কল্লেন—এই দুইটি ঘটনাকে কতরূপ কল্পনার সূতো দিয়ে লোকে জড়িয়ে ফেল্‌তে পারে। এই ভেবে আশ্রমে ফিরে আসাই ঠিক ক'রে রাত ৪টার সময় তথায় এসে বারেণ্ডায় একখানি খাটিয়ার উপর পড়ে রইলেন।

শব বাঁধা হচ্ছে, তিনি পা টিপে ঘরে উঁকি মেরে সেই আলুলায়িত কেশ, সিন্দুরোজ্জ্বল কপাল, অশ্রু-স্নিগ্ধ ডাগর চোখ দুটি—একবার জন্মের শোধ দেখে নিলেন—তার পর ফিরে খট্টার কাছে এসে তার পায়া ধ'রে এক হাতে বুক চেপে ধ'রে কান্না থামাতে চেষ্টা কর্‌লেন।

একজন সন্ন্যাসী বল্লেন "কিশোরানন্দকে যে দেখ্‌ছি না, শ্মশানে তিনি যাবেন না ?"

প্রেমানন্দ মহারাজ উপস্থিত ছিলেন, তিনি বল্লেন "আর সকল কাজেই আমি কিশোরানন্দকে নিযুক্ত করতে দ্বিধা বোধ করি না—কিন্তু দূরে হাট-মাঠের পথ ভেঙ্গে যেতে হ'লে, ওঁর পা দুখানি মনে করে ক্লেশ হয়। ওঁর পায়ের তলা কেমন পদ্ম-দলের মত কোমল ও রাঙ্গা—পথের কাঁকর কখনও ভেঙ্গেছেন, এ যেন মনে হয় না। ওঁকে না হয় বাদ দাও।"

বারেণ্ডায় বসে কিশোর রায় সব কথা শুনতে পেয়েছিলেন. তিনি এসে বল্লেন—

"আমি যাব।"

ইনি উপস্থিত থাক্‌তে স্ত্রীর মুখাগ্নি অপরে কর্‌বে, এটি তাঁর প্রাণে সইল না।

———

(৫৭)

কিশোর রায়ের চিঠি পেয়ে কানাই বাবাজি হরিদ্বারে এসেছেন। এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে কিশোর রায় কানাই বাবাজির হাঁটুর কাছে বসে চক্ষের জলে ভেসে যাচ্ছেন, তিনি বল্‌ছেন—"জীবনে তিনটা দিন এঁকে পেয়েছিলেম, সমস্ত জীবনের সাধনার ফল এই তিনটা দিন। তিনি উঁকি মেরে আমায় দেখেছিলেন, আমার পায়ের শব্দ শুনে কেঁদে-ছিলেন, আমার নিকট ক্ষমা চেয়েছিলেন। এই তিনটা দিন তিনি আমাকে চেয়েছিলেন, আমি এই তিনটি দিন তাঁকে পেয়েছিলেম—বিবাহের এই দীর্ঘ বিশ বছরের মধ্যে এই তিনটি দিন আমাদের রাজযোটক হ'য়েছিল—কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে ফুরিয়ে গেল। এ পৃথিবীতে সুখ আছে,—সকলই ভেল্কী নয়—এই কথাটা আমায় ভাল ক'রে বুঝাবার জন্য এই তিনটা দিন এসেছিল। আমার জীবনের খাতায় এই তিনটা দিন অতি অপূর্ব্ব।

তিনি মর্‌বার সময় যা কিছু বলে গেছেন, প্রত্যেক কথা শেলের মত আমার বুকে বিঁধে আছে। তিনি বলে গেছেন—"আমার মত পতিতা বেঁচে থেকে যদি ভাল হতে চাইতো, তবে কোথায় তার সুবিধে পেত?" সত্যই যদি কেউ পতিতা থাকেন, জীবনের ভুল যিনি বুঝ্‌তে পেরেছেন, তিনি কোথায় দাঁড়াবেন? তিনি ত জ্ঞানদার মত এমনই হতাশ হৃদয়ে মরণের প্রতীক্ষা কর্‌বেন। আমরা তো তাঁর জন্য কোন দোর খুলে রাখি নাই।"

"আমি মনে করেছি তাদের জন্য একটা আশ্রম করব। জ্ঞান-দায়িনীর অন্তিমকালের এই দুঃখের প্রতিকার যতটা পারি করব।"

কানাইবাবাজি বল্লেন—"তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে আমার একটী জিনিষ লক্ষ্য কর্‌বার সুযোগ হ'য়েছে—প্রেম জিনিষ সামাজিক সমস্ত বিধানের উচ্চে। উহা সূর্য্যের আলোর মত—পৃথিবীর অলি গলির যে অংশটা হেয়, তাও ইহা ত্যাগ ক'রে না। মহাসাগরের উপরে যেরূপ সেই আলো পড়ে, ক্ষুদ্র ডোবাটাও তেমনই সে আলো হ'তে বঞ্চিত হয় না। তোমার জীবন সমস্ত সামাজিক বিধানের উপরে উঠে প্রেম যে কাউকে ত্যাগ করে না, এইটি দেখাচ্ছে।

"যা হো'ক পতিতাদের জন্য যদি তুমি আশ্রম খোল—আমি তোমার সঙ্গে আছি, জান্‌বে। আর তুমি কি তবে এ আশ্রমে কিছুতেই থাক্‌বে না? এ আব্‌দার তুমি কেন কচ্ছ?"

কিশোর···"দোহাই সাধুবাবা, আমাকে এখানে থাক্‌তে আদেশ কর্‌বেন না। সেখানে অনেক জিনিষ তাঁর মৃত্যু-স্মৃতির সঙ্গে জড়িত আছে, আমি কখন কেঁদে ফেল্‌ব, কখন পাগলের মত প্রলাপোক্তি কর্‌ব—সন্ন্যাসীদের কাছে ধরা পড়ে যাব, তার ঠিক নাই। আমি নিজেকে সাম্‌লিয়ে কি কষ্টে যে এখানে আছি, তা আর কি বল্‌ব! এমন বিপদের স্থানে আমায় রাখ্‌বেন না।"

"চল তবে, আমাদের মঠে। না হয় গৃহে ফিরে যাবে? সুন্দর-নাথ তোমাদের জন্য কত যে কান্নাকাটি কর্‌ছে, তা আর কি বল্‌ব।"

কিশোর রায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন "সে এখন বড় হ'য়েছে—সে ষ্টেট্‌ রক্ষা করুক, আমি সিন্দুরতলায় আর যাব না।"

বাবাজি···"তবে চল আমাদের মঠে—সেখান থেকে তোমার সংকল্পিত আশ্রমের ব্যবস্থা হবে। আর এখন মঠে আমাকে প্রায় সর্ব্বদাই থাক্‌তে হয়। প্লেগ রোগীর সেবা কর্‌তে গিয়ে গোপাল

পাঁড়ে প্লেগে মারা গিয়েছেন। তুমি মঠে থাক্‌লে আমি অনেকটা সোয়াস্তি পাব।"

কিশোর রায় আশ্রম ছেড়ে যাবেন শুনে সকলেই দুঃখিত হ'লেন। প্রেমানন্দ মহারাজ বল্লেন—"আমরা এঁকে আমাদের জপে-তপে পাই নাই, কিন্তু কর্ম্মের মধ্যে—সেবার মধ্যে—যেরূপ পেয়েছি, এরূপ কাউকে পাই নাই—সেবাশ্রমে ইনি আদর্শ সেবক ছিলেন।"

হরিদ্বার হ'তে দুজনে বৃন্দাবনে এলেন। পথে বাবাজি কিশোর রায়কে বল্লেন—"জ্ঞানদায়িনী তোমার প্রেমের প্রতিদান দেন নি, কিন্তু একটা মহৎ জিনিষ তোমায় দিয়ে গেছেন, সেটি বুঝতে পেরেছ? তুমি অত্যাচারীকে অকুণ্ঠিত চিত্তে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে—তিনি তোমার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় অত্যাচারিণী ছিলেন—সাংসারিক হিসাবে সকল সুখের মূল ছেদন করে গেছেন—তবুও সব ভুলে তুমি তাঁকে ভাল বাস্‌তে পেরেছ, তোমার জীবনে ভালবাসার এই অদ্ভুত বিকাশের তিনি সহায়তা করে গেলেন। সংসারে তিনি তোমার কোন শত্রু রেখে গেলেন না, মহা শত্রুকেও এখন তুমি মিত্র বলে আলিঙ্গন দিতে পার্‌বে।"

কিশোর রায় চুপ করে শুনে বল্লেন "তিনি আমাকে পতিতা রমণীদের জন্য কর্ত্তব্যের কথা শিখিয়ে গিয়েছেন, বলে গেছেন 'ভাল হ'তে চাইলে আমায় আর কে নেবে? আমার মরণ ছাড়া আর উপায় নেই।'

এই বল্‌তে বল্‌তে আবার কণ্ঠ অশ্রু-রুদ্ধ হ'য়ে এল, একটু থেমে তিনি বল্লেন—"কেন তিনি এরূপ মনে কল্লেন? তাঁর ভাল হওয়ার পথে যদি সিন্দুরতলার রাজবাড়ীর ঐশ্বর্য্য বাধা দিত, আমি তা খড় কুটোর মত ছেড়ে দিয়ে ভিখারী সাজতুম।"

ওপারের আলো

যশোমাধবের মঠের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের খোলা জমিটায় পতিতা রমণীদের জন্য আশ্রম উঠেছে। প্রকাণ্ড বাড়ী হ'য়েছে, চারদিকে সুন্দর বাগান—শাক শবজির বাগান—ফুলের বাগান—ফলের বাগান। পূর্ব্ব দিকে মনোরম দীর্ঘিকা। আশ্রমের গেটের উর্দ্ধে বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে "নব জীবন।"

কিশোর রায় অমরাবতীকে সিন্দুরতলা হ'তে খবর দিয়ে আনিয়েছেন। আশ্রম শীঘ্রই দেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত হ'ল। সন্ধ্যার পর প্রায়ই গেটের কাছে কোন ভদ্রব্যক্তির সঙ্গে অল্পবয়স্কা কোন রমণী সলজ্জভাবে এসে দাঁড়াতেন, অমরাবতী তাকে বড় বোনটির মত হাতে ধরে ভেতরে নিয়ে যেতেন। সেই সেই লোক হয়ত তার পিতা, না হয় তার ভ্রাতা, কিংবা কোন দয়ার্দ্রচিত্ত বাইরের লোক। প্রায়ই ১৫হ'তে ২৫বছরের রমনীরা আসতেন। তারা প্রথমত সভয়ে আশ্রমের চৌকাট ডিঙ্গোতেন, লজ্জায় ও ভয়ে তাদের মুখখানি বিষন্ন, চক্ষু জল ভারনত। অমরাবতীর স্পর্শে অনেক সময়ে তারা কেঁদে ফেলতেন। তাঁরা তো জানতেন, এ অবস্থায় গৃহে ফিরলে কি দুর্দ্দশা ও লাঞ্ছনা পেতে হ'য়। তাঁরা জানতেন যে হতভাগিনীর পা একটিবার পিছলে পড়েছে, তাঁর জন্য আত্মহত্যা ছাড়া সমাজ আর কোন পথ রাখেন নি। শাস্ত্রকারেরা—সমাজের নেতারা নিজেদের চরিত্রের একশ এক ছিদ্র নিয়ে এই হতভাগিনীদের বিচার করে বলছেন—এদের ঢুকতে দেওয়া হবেনা, এদের ছায়া মাড়াতে হবে না। অথচ যে জায়গার লোকে এদের ছায়া মাড়ায়, সে জায়গার পথ বন্ধ হয় নাই। সে স্থান অতীব ঘৃণার্হ।

কিশোর রায় বলতেন "যে ভাল হ'তে চাবে তাকে হাতে ধরে তুলে নেবে—এই হচ্ছে সমাজের কাজ। পাপমতিকে সুমতি

দিয়ে জয় করতে হবে—সামাজিক নেতাগণ—সমস্ত নরনারীকে পুত্র-কন্যার মত দেখবেন। যে কেউ কিছু করল, আর অমনই তাকে ছেড়ে দিয়ে শুদ্ধতা রক্ষা করার চেষ্টা যদি করেন—তবে তা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিচারে সকলের উপর চালিয়ে দেখুন—সমাজ-জন মানব-শূন্য হ'য়ে পড়বে

অমরাবতী মেয়েদের নিয়ে সর্ব্বদা থাকতেন। তাদের পূর্ব্বকাহিনী জিজ্ঞাসা করতেন না, একজন যদি অপরকে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতো—তবে তা মানা করতেন। তারা যেন কোন দোষ করে নি, তাদের তিনি মা, এই ভাবে স্ফূর্ত্তি করে তারা তাঁর কাছে শিক্ষা পেতো।

সে শিক্ষা কি? অল্পদিনের মধ্যে বৃন্দাবন ও নিকটবর্ত্তী বহু-স্থানের বাজারে 'নব জীবনের' শাক শবজী, ফল ও ফুলের বহু চুপড়ি বিক্রয়ের জন্য যেত। সেগুলি সমস্ত আশ্রমের মেয়েদের দ্বারা উৎপন্ন। সংকল্পের উৎসাহে এবং অমরাবতীর আদর্শ চরিত্রের প্রতিষ্ঠায়—ক্রেতাগণ সেই চুপড়ি গুলি অধিকতর আগ্রহে কিনতেন। তা ছাড়া 'নবজীবনে'র মোজা, গেঞ্জি, কাঠের ও মাটীর খেলনা, বস্ত্র, জামা, সে দেশে সর্ব্বজন পরিচিত হ'য়ে উঠল। বিলাত হ'তে যন্ত্রপাতি কিনে চিনে মাটীর পুতুল তৈরী হ'তে লাগল—মেয়েরাই তার কারিগর।

বহু দূর দূরান্তর হ'তে আশ্রমে মেয়েরা আসতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে কতউচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়ে, কত সুন্দরী, কত প্রতিভা-বতী! তাঁরা পতিতা ছিলেন, কিশোর রায় বলতেন "পতিতার সেবায় আমার জীবন উৎসর্গ করেছি! এ জীবনে অন্য কোন ব্রত পালন করি নাই।"

'নবজীবনে'র মেয়েদের মধ্যে কারু কারু উদ্ভাবনী শক্তি—দেশের

লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ নূতন রকম দা, বঁটী, ছুরি তৈরী করলেন। একটা কাঠের যন্ত্রের মধ্যে দা খানি আছে, যন্ত্রটি ঘুরিয়ে দিলে জিনিষ আপনা আপনি কাটে। প্রদীপে সল্‌তে উস্কে দিতে হয় না, আপনা আপনি জলে। হাতে পাখা টান্‌তে হয় না, ছোট ছোট পাখা আপনি চলে—বৈদ্যুতিক তেজে নয়, যন্ত্রের কৌশলে। নৌকা আপনি চলে, ষ্টিমে নয়, যন্ত্র-চালিত হালের গুণে।

যাঁরা মনে ভেবে ছিলেন তাঁদের জীবন ব্যর্থ, তাঁদের মধ্যে জীবনের সার্থকতার আশা ফিরে এল। যারা কোন কাজের মধ্যেই স্থান পান নি, সমাজ যাদের দূর দূর ব'লে তাড়িয়ে দিয়েছিল, সমস্ত মাঙ্গলিক ব্যাপার ও আনন্দ হ'তে—যাঁদেরে আত্মীয়েরা পর্য্যন্ত হাতের ভঙ্গী করে, ঘাড় নেড়ে, শাস্ত্রের বুলি ঝেড়ে নিদারুণ ঘৃণায় বর্জ্জন করেছিলেন—তাঁরা এই 'নবজীবনে' এসে বুঝ্‌লেন, তাঁদেরে দিয়ে পৃথিবীর দরকার আছে।

"এমনই ক'রে ভগবানের দেওয়া ফুলগুলি আমরা হেলায় অশ্রদ্ধায় নর্দ্দমায় ফেলে দি" কিশোর রায় একদিন অমরাবতীকে এই বলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লেন।

সন্ধ্যার পর অমরাবতী মেয়েদের নিয়ে পুরাণ পাঠ করতে বসে যেতেন। কত সাধু চরিত্র নর নারীর কাহিনী তাঁদের শুনোতেন, কত গল্পের বই পড়ে শুনোতেন—সীতা সাবিত্রীর সঙ্গে কুমারী নাইটিঙ্গেলের কথাও বলে যেতেন। একদিন ইউজুনস্থর 'মাদার গাঙ্গে'র কথা বল্লেন। জগতে শুধু পাতিব্রত্য নয়, কতদিক দিয়ে সাধুত্বের কত আদর্শ রয়েছে, দেশ বিদেশের ইতিহাস ও গল্পের বই থেকে তা পড়ে শুনোতেন।

মেয়েরা তাঁর কাছে সেতার ও বীণা বাজনা শিখেছিল - তারা তাঁকে মায়ের মত ভক্তি করত, শুধু তাই নয়,—তাকে; ছাড়া থাকতে পারত না। তাদের জীবনে যে শুদ্ধতা এসেছিল—সে উপদেশের বলে নয়। তারা যেন কোন স্বর্গের দেবীর পাশে বসে স্বর্গের হাওয়ার স্পর্শ পেয়েছিলেন! তাঁরা যে যে কাজ করতেন, তার উদ্বোধন আসতো একটি সুর থেকে। তাঁরা কেউ পুতুল গড়তেন, কেউ বই লিখতেন, কেউবা শিল্পের কাজ করতেন—কিন্তু তাঁদের মনের ভাব একটি সুরে বাঁধা ছিল - তা অমরাবতীর দেওয়া সুর, সেটি কর্ম্মের সাধনা-জনিত আনন্দের ঝংকার'।

শোবার সময় অমরাবতীকে ঘিরে তাঁরা ভগবানকে স্মরণ করতেন। অমরাবতীর অধরযুগল তখন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে কাঁপত! তিনি উপনিষদ্ হ'তে শ্লোক আবৃত্তি করতেন—তাঁর স্বাভাবিক সৌম্যমূর্ত্তি আরও অপূর্ব্ব সৌম্য হ'ত। মেয়েরা তাঁকে ঘিরে স্তব পাঠ করতেন। ঘিয়ের বাতি ছাড়াও দীপ জ্বলতে পারে, মন্দির ছাড়াও তাঁর আরাধনা হ'তে পারে—সেই অপরিচিত অথচ সকলজনের ইপ্সিত রাজ্যে বেতন-ভোগী পুরোহিত ছাড়া অপরেও পরিচালকত্ব নিতে পারেন,—ভক্তিমতী মেয়েদের তখনকার সেই দৃশ্য দেখে কে আর তাতে সন্দেহ করতে পারতো?

আর চার বছর পরে কানাই বাবাজির দেহত্যাগ হ'ল—তিরোধানের পূর্ব্বে তিনি কিশোর রায়কে যশোমাধবের মঠের মহান্তের পদে অভিষিক্ত করতে আদেশ করে গেলেন।

আরও তিন বৎসর কিশোর রায় জীবিত ছিলেন। তাঁ[illegible]

কাতরতা, পতিতাদের জন্য করুণা, সর্ব্ব বিষয়ে বিস্ময়-

[illegible]হীন সেবাবৃত্তি তাঁকে লোকশ্রদ্ধার শেখর দেশে

ক'রেছিল। আর তিনটি বছর পরে যখন তিনিও ভবধাম ত্যাগ ক'রে গেলেন, তখন তাঁর সমাধি ক্ষেত্রের এক পাশে দাঁড়িয়ে একটি অতি সুন্দর যুবক নগ্নপদে অবিরল চোখের জল ফেলে কাঁদ্‌ছিলেন—তিনি সুন্দরনাথ।

সম্পূর্ণ

Dinesh chandra Sen

গ্রন্থকার-প্রণীত অপরাপর পুস্তক

	নাম	মূল্য
১।	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৪র্থ সংস্করণ) ...	৫৲
২।	বেহুলা ([illegible]ম সং)	৸০
৩।	জড়ভরত (৫ম সং)	৸০
৪।	ফুল্লরা (৩য় সং)	৸০
৫।	ধরাদ্রোণ ও কুশধ্বজ (৩য় সং)	৸০
৬।	সতী (৮ম সং)	৸০
৭।	রামায়ণী কথা (৩য় সং)	১৸০
৮।	গৃহশ্রী (৬ষ্ঠ সং)	১॥০
	বাঁধা সং	২৲
৯।	গায়ে হলুদ	২৲
১০।	নীলমাণিক (উপন্যাস)	॥০
১১।	তিন বন্ধু (উপন্যাস ৩য় সং) ...	১৲
১২।	সাঁঝের ভোগ (গল্প)	১৲
১৩।	বৈশাখী (গল্প)	১।০
১৪।	মুক্তা চুরি (২য় সং)	১।০
১৫।	রাখালের রাজগি	১৲
১৬।	রাগরঙ্গ	১৲
১৭।	সুকথা	৸০
১৮।	রামায়ণ (কৃত্তিবাসী [illegible] সং)	২॥০
১৯।	মহাভারত (কাশিদাসী, ঐ)	৬৲

২০। History of Bengali Language and Literature ... ১২৲

২১। বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) ... ১২৲

২২। Folk Literature of Bengal ... ৪৲

২৩। Chaitanya and his Companions ... ১॥০

২৪। Vaisnava Literature of Midieval Bengal ১৲

২৫। Sati (English Translation by the Author) ২

২৬। Chaitanya and his age (যন্ত্রস্থ)

২৭। Bengali Prose Style (from 1800—1857) (যন্ত্রস্থ

২৮। শ্যামলী খোজা (যন্ত্রস্থ)

২৯। কানু পরিবাদ ... (যন্ত্রস্থ)